হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

ভূমিকা

'হেমেন্দ্রকুমার রায়' এমন একটি আশ্চর্য নাম যে তা শোনামাত্র আগেকার দিনের শিশু ও কিশোরদের (আমিও তাদের মধ্যে একজন) মনে খুশির জোয়ার বয়ে যেত। কারণ তাঁর বই মানেই তো ভাল গল্প, নতুন গল্প, আশ্চর্য সব অ্যাডভেঞ্চার বা গোয়েন্দা-কাহিনী বা রসালো অন্য কিছু। তাঁর ভাষা তাদের মনকে এমনভাবে টেনে রাখত যে তা বুঝিয়ে বলা শক্ত। এখন দিন বদলেছে। এখনকার শিশু ও কিশোররা হেমেন্দ্রকুমারের নামে কতখানি উতলা হয় তা জানি না, কিন্তু তাঁর বই যে তারা পড়ে তার প্রমাণ পাওয়া যায় আজকের দিনেও তাদের কাট্‌তি দেখলে।

ছোটদের সাহিত্যে হেমেন্দ্রকুমার এসেছেন অনেক দেরিতে। তার আগে বড়দের সাহিত্যে তিনি বিরাট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গল্পকার হিসাবে, কবি ও গীতিকার হিসাবে, শিল্পকলা ও নৃত্যকলার সমঝদার হিসাবে তার যে নাম হয়েছিল, তা এক কথায় অসাধারণ। তারপরে তিনি ছোটদের জন্যে প্রথমে লিখলেন 'ছুটির ঘণ্টা' (কতকগুলো মিষ্টি গল্প আর ছড়ার সংকলন), তারপর যকের ধন। 'যকের ধন'-এর পর থেকেই তিনি ছোটদের সাহিত্য নিয়ে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে পড়লেন এবং সেই সাহিত্যের সিংহাসনটি অনায়াসেই দখল করে নিলেন।

বাংলা শিশু সাহিত্যের এই সম্রাট আমাদের নতুন কী দিয়েছেন, তার একটু খতিয়ান করে নিলে মন্দ হয় না। ছোটদের জন্য হেমেন্দ্রকুমার অনেক কিছু লিখেছেন, নানা ধরনের গল্প তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু আনকোরা নতুন যে জিনিসটি তিনি আমদানী করেছেন, তা হল অ্যাডভেঞ্চার। ঘরের কোণে বসে একঘেয়ে দিন কাটাত যে সব বাঙালী ছেলেমেয়েরা, তারা হেমেন্দ্রকুমারের অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী পড়তে পড়তে চলে যেত অজানা সব বিপদে ভরা রাজ্যে, কখনও আফ্রিকার গহন বনে, কখনও প্রশান্ত মহাসাগরের রহস্যে ঘেরা দ্বীপগুলোতে, কখনও আসামে, কখনও সুন্দরবনে, আবার কখনও হিমালয়ের চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে। সেখানে গল্পের নায়করা প্রতি মুহূর্তে যে সব ভয়ানক বিপদ আর কষ্টের মুখোমুখি হত, তার অংশীদার হত এইসব খুদে পাঠক-পাঠিকারাও—তারপর সব বিপদ কেটে গেলে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলত, মনে ভাবত 'আমরা কবে এইসব দেশে এইভাবে যাব'! হেমেন্দ্রকুমার এইভাবে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন সুদূরের নেশা, শিখিয়েছিলেন বিপদকে ভালবাসতে। 'হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী'র এই খণ্ডে একটি শ্রেষ্ঠ অ্যাডভেঞ্চার-উপন্যাস রয়েছে। তার নাম

'আবার যকের ধন'। অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী ছাড়া বাংলার ছোট ছোট পাঠক-পাঠিকাদের হেমেন্দ্রকুমার আরও একটি নতুন জিনিস দিয়েছিলেন, তা হল গোয়েন্দা কাহিনী। এর আগে আমাদের ভাষায় বড়দের জন্য অনেক ভাল ভাল গোয়েন্দা-কাহিনী লেখা হয়েছে, কিন্তু ছোটদের জন্য হেমেন্দ্রকুমারই তা প্রথম লিখলেন। তাঁর গোয়েন্দা-কাহিনী পড়লে ছোটরা রহস্যভেদের আনন্দ পায়, কিন্তু অপরাধীদের কালো জগতের কোন অবাঞ্ছিত ছাপ তাদের মনের উপর পড়ে না।

অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী ও ছোটদের গোয়েন্দা-কাহিনী—এই দুই ধারাতেই হেমেন্দ্রকুমারের যোগ্য উত্তরসূরী অনেকে এসেছেন। 'পথের পাঁচালী'র লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী রচনায় হেমেন্দ্রকুমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ছোটদের গোয়েন্দা-কাহিনী খুব ভাল লিখেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (হুকা-কাশির স্রষ্টা)। কিন্তু হেমেন্দ্রকুমার যত বেশি দিন ধরে যত বেশি লেখা লিখে গেছেন, তেমনটি আর কেউই পারেন নি।

আরও নানাধরনের লেখা হেমেন্দ্রকুমার রেখে গেছেন ছোটদের জন্যে। অতীতকে সজীব করে তোলা ইতিহাসের গল্প (এই খণ্ডেও এরকম গল্প অনেকগুলি রয়েছে), মনের মধ্যে শিহরণ জাগানো অদ্ভুত সব ভূতের গল্প (যাদের কতকগুলি বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লেখা, কতকগুলি মৌলিক), মিষ্টি গল্প, মজার ছড়া—আরও কত কী। তাঁর অনুবাদ-কাহিনীগুলিও আশ্চর্য সৃষ্টি। সেগুলি এত অদ্ভুত রকমের বাংলা যে তাদের মৌলিক রচনা ছাড়া আর কিছু মনেই হয় না। এই রকম একটি অনুবাদ-কাহিনী এ খণ্ডে পাওয়া যাবে—সেটি হ'ল 'কিং কঙ্'।

হেমেন্দ্রকুমার তাঁর গল্পের মধ্যে এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যারা শুধু জীবন্ত নয়, আমাদের আত্মীয়ের মত। যেমন ধরা যাক্ বিমল আর কুমার। অমানুষিক শক্তির অধিকারী অসমসাহসী বিমল আর তার যোগ্য সহকারী কুমার (সময় সময় সে বিমলের তুলনায়ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেয়) বাংলা সাহিত্যের অমর চরিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র 'গল্পের স্বর্গ' নামে একটি গল্প লিখেছেন, তাতে তিনি গল্পের স্বর্গে বিমল আর কুমারকেও স্থান দিয়েছেন (স্বর্গের অন্য বাসিন্দারা কিন্তু বিদেশী)। বিমল আর কুমারের পুরোনো ভৃত্য রামহরি আর কুকুর বাঘাকেও আমরা ভুলতে পারি না।

হেমেন্দ্রকুমারের আরও দু'টি চরিত্র অমরত্ব লাভ করেছে—শখের গোয়েন্দা জয়ন্ত আর তার সহকারী মাণিক। কোন কোন কাহিনীতে জয়ন্ত আর মাণিক বিমল আর কুমারের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করেছে। তবে এই সব কাহিনীর

অধিকাংশের মধ্যেই বিমলের কাছে জয়ন্ত একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে, তার কোন কৃতিত্ব প্রকাশ পায়নি। কেবল 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন', 'অমৃত-দ্বীপ', 'জেরিনার কণ্ঠহার' আর 'নৃমুণ্ড-শিকারী' (এই খণ্ডে পাওয়া যাবে) বইয়ে দেখি, বিমল আর জয়ন্তের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব খুব সুন্দর ফুটেছে—এই বইগুলিতে দু'টি চরিত্রই নিজের নিজের ক্ষেত্রে তাদের অসাধারণত্ব দেখিয়েছে।

জয়ন্ত আর মাণিকের প্রায় সব কাহিনীতেই যাঁর দেখা পাওয়া যায়—বিপুল কলেবর আর অসীম ক্ষুধার অধিকারী সেই পুলিস-ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবুও কম আকর্ষণীয় চরিত্র নন। তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত "হুম্" ধ্বনি—তাকে ভোলা পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে কোন দিনই সম্ভব নয়।

মোটের উপর, বাংলা শিশুসাহিত্যে হেমেন্দ্রকুমার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। বিদেশী শিশুসাহিত্যও আমি অনেক পড়েছি—তাই জোরের সঙ্গে বলতে পারি, এঁর মত লেখক যে কোন দেশের শিশুসাহিত্যেই বিরল। আমাদের শিশুসাহিত্য মোটেই গরীব নয়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু এবং হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মত লেখকরা এই সাহিত্যের সোনার প্রাসাদ গড়েছেন। এই সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলেরও দান আছে। কাজেই. কোন দেশের শিশুসাহিত্যের তুলনায়ই আমাদের শিশুসাহিত্য খাটো বলে গণ্য হবার যোগ্য নয়।

হেমেন্দ্রকুমার যখন লিখতেন, তখন আমার বয়স অল্প ছিল। তবুও কয়েক-বার, আমি তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলাম। যখন স্কুলে পড়ি, তখন অটোগ্রাফ নেবার জন্যে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি তেতলার বারান্দায় বসেছিলেন। সে-দিন তাঁকে দেখে একটু হতাশই হয়েছিলাম। এর আগে তাঁর লেখা পড়ে ও রেডিওতে তাঁর গলা শুনে আমার ধারণা হয়েছিল তিনি একজন জমাটি ধরনের মোটাসোটা চেহারার লোক। তার বদলে যখন দেখলাম তিনি রোগা, কম কথা বলেন—তখন খুশি হতে পারিনি। তবে খুশি হয়েছিলাম তাঁর কাছে অটোগ্রাফ পেয়ে। আমার খাতায় তিনি লিখেছিলেন,

নীল আকাশে নূতন তরুণ।
জাগো তুমি, জাগো হে অরুণ!

কোন কারণে সে খাতাটি আমার হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই, কয়েক বছর বাদে আর একখানা খাতা নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি বাড়িতে

নেই ; খবর পেলাম, বড় রাস্তার ওপারে একটা দর্জির দোকানে তিনি বসে আছেন। সেখানে গিয়ে তাঁর কাছে অটোগ্রাফ চাইতে তিনি রাগতস্বরে (পরে বুঝেছিলাম, সেটা ছদ্মরাগ) বললেন, ''কে তোমায় বলসে আমি এখানে আছি ?"

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর হেমেন্দ্রকুমার বললেন, "তুমি তা হলে অটোগ্রাফ না নিয়ে ছাড়বে না ?"

আমি বললাম, "না।"

হেমেন্দ্রকুমার বললেন, "তা হলে আমার সঙ্গে এস।"

আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি আমায় নিচে দাঁড় করিয়ে রেখে আমার খাতাখানা নিয়ে বাড়ির ওপরে উঠে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে একজনের হাত দিয়ে খাতাটা পাঠিয়ে দিলেন। দেখি, তাতে লেখা আছে

পাবে বলে অটোগ্রাফ কেন এত দাও চাপ
দলে দলে এসে প্রায় জ্বালাতন কেন কর ?
এ কাজ ক'রো না পুন, বুড়োর বচন শুনো
তাড়াতাড়ি গিয়ে বাড়ি খানা খেয়ে পেট ভর।

এর অনেকদিন পরে—'মাসিক বসুমতী'র অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। আমি তখন ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছি। 'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদকের সঙ্গে কী যেন একটা কথা বলতে গিয়েছিলাম। হেমেন্দ্রকুমার সেখানে বসেছিলেন, আমায় দেখে তিনি বললেন, "তুমি কি আমার বাড়িতে গেছলে ?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে—মানে—"

হেমেন্দ্রকুমার বললেন, "মানে টানে নয়, তুমি গেছলে। আমার মনে আছে।"

এত লোকের সঙ্গে যাঁর আলাপ, তিনি একটি অটোগ্রাফ-শিকারী কিশোরকে মনে রেখেছেন, দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম।

সে দিন তাঁর সঙ্গে অনেক আলাপ হয়েছিল। বেশির ভাগ কথাই হয়েছিল শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে। শিশুরা তাঁর মনের কতখানি অধিকার করে আছে, সেদিন তার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

আর কথা বাড়াব না। ছোট ছোট পাঠক-পাঠিকাদের ডাকছি—এবার তোমরা চলে এসো। 'আবার যকের ধন'-এর শেষটা মনে আছে ?

"আর এখানে নয়। রত্নগুহার রক্ষীরা ফিরে আসছে।"

তোমাদের সামনেও এক রত্নগুহা, তার ভেতরে ঢুকে তোমরা প্রাণভরে লুঠপাট চালাও। এ রত্নগুহার রক্ষীদের ভয় পাবার কিছু নেই, তাঁরা তো তোমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।

শান্তিনিকেতন,
৪।৪।১৯৮৫

সুখময় মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

আবার যখের ধন / ৯

নৃমুণ্ড-শিকারী / ১৩১

কিং কঙ্ / ২২১

আলো দিয়ে গেল যাঁরা / ২৯৭-৩৩৫

সাত হাজারের আত্মদান / ২৯৮

আলেকজাণ্ডারের পলায়ন / ৩০৬

ওষ্ঠাধরে রাজদণ্ড / ৩১২

মরা মাণিক আর জ্যান্তো মাণিক / ৩২০

মুসলমানের জহর-ব্রত / ৩২৯

আবার যখের ধন

এক

ভূত না চোর?

সন্ধ্যাবেলা। দুই বন্ধু পাশাপাশি ব'সে আছে। একজনের হাতে একখানা খবরের কাগজ, আর একজনের হাতে একখানা খোলা বই। সামনে একটা টেবিল,—তার তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে মস্ত একটা দেশী কুকুর।

একজনের নাম বিমল, আর একজনের নাম কুমার। কুকুরটার নাম হচ্ছে বাঘা। 'যখের ধনে'র পাঠকরা নিশ্চয়ই এদে চিনতে পেরেছেন?

কুমার হঠাৎ খবরের কাগজখানা মহা বিরক্তির সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব'লে উঠল, "খবরের কাগজের নিকুচি করেচে!"

বিমল বই থেকে মুখ তুলে বললে, "কি হ'ল হে? হঠাৎ খবরের কাগজের ওপর চট্‌লে কেন?"

কুমার বললে, "না চ'টে করি কি বল দেখি? কাগজে নতুন কোন খবর নেই—সেই থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোড়। নাঃ, পৃথিবীটা বেজায় একঘেয়ে হয়ে উঠেচে!"

বিমল হাতের বইখানা মুড়ে টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে বললে, "পৃথিবীকে তোমার আর পছন্দ হচ্ছে না? তাহ'লে তুমি আবার মঙ্গল-গ্রহে ফিরে যেতে চাও?"

—"না, দেখা দেশ আর দেখতে ইচ্ছে নেই। তার চেয়ে চন্দ্রলোকে যাওয়া ভালো।"

—"ওরে বাস্‌রে, সেখানে ভয়ানক শীত!"

—"তাহ'লে পাতালে যাই চল।"

—"চন্দ্রলোকে গেলেও তোমাকে বোধ হয় পাতালে থাকতে হবে। সেখানে মাটির উপরে চির-তুষারের রাজ্য। পণ্ডিতরা তাই সন্দেহ করেন যে চন্দ্রলোকের জীবরা পাতালের ভেতরে থাকে।"

"কিন্তু চন্দ্রলোক যাব কেমন ক'রে?"

—"সে কথা পরে ভাবা যাবে এখন,...আপাততঃ রামহরির পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি, বোধ হয় আমাদের জলখাবার আসচে, অতএব—"

রামহরি ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল, তার দুই হাতে দু-খানা খাবারের থালা।

বিমল বললে, "এস এস, রামহরি এস। রামহরি, তুমি যখন হাসি-মুখে খাবারের থালা হাতে ক'রে ঘরে এসে ঢোকো, তখন তোমাকে আমার ভারি ভালো লাগে। আজ কি বানিয়েচ রামহরি?"

রামহরি থালা দু'খানা দু'জনের সামনে রেখে বললে, "মাছের কচুরি আর মাংসের সিঙাড়া।"

বিমল বললে, "আরে বাহবা কি বাহবা। হাত চালাও কুমার, হাত চালাও।"

কুমার একখানা কচুরি তুলে নিয়ে বললে, "ভগবান রামহরিকে দীর্ঘজীবী করুন! আমাদের রামহরি না থাকলে এই একঘেয়ে পৃথিবীতে বাঁচাই মুশকিল হ'ত!"

মাছ-মাংসের গন্ধে বাঘারও ঘুম গেল ছুটে! সেও দাঁড়িয়ে উঠে প্রথমে একটা 'ডন্' দিয়ে চাঙ্গা হয়ে এগিয়ে এসে ল্যাজ নাড়তে শুরু করলে।

এমন সময়ে সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

বিমল বললে, দেখ তো রামহরি, কে ডাকে?

রামহরি বেরিয়ে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে বললে, "একটি ভদ্রলোক তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে এসেচি!"

খাবারের থালা খালি ক'রে বিমল ও কুমার নিচে নেমে গেল। বাইরের ঘরে একটি ভদ্রলোক ব'সে আছেন। তাঁর বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি

হবে না, দিব্যি ফর্সা রং, চেহারায় বেশ-একটি লালিত্য আছে।

বিমল বললে, "আপনি কাকে চান?"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনাদেরই। আপনারা আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাদের চিনি। আমার নাম মাণিকলাল বসু, আমার বাড়ী খুব কাছেই।"

বিমল বললে, "বসুন। আমাদের কাছে আপনার কি দরকার?"

—"মশাই, আমি বড় বিপদে পড়েচি। আমার বাড়ীতে বোধহয় ভূতের উপদ্রব হয়েচে।"

বিমল বললে, "কিন্তু সে জন্যে আমাদের কাছে এসেচেন কেন? আমরা তো রোজা নই!"

মাণিকবাবু বললেন, "এ যে সে ভূত নয় মশাই, রোজা এর কিছু করতে পারবে না। আমি আপনাদের কীর্তিকলাপ সব শুনেচি, তাই আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেচি।"

বিমল বললে, "আচ্ছা, ব্যাপারটা কি আগে খুলে বলুন দেখি!"

মাণিকবাবু বললেন, "ঐ যে বললুম, ভূতের অত্যাচার! আর অত্যাচার ব'লে অত্যাচার? ভয়ানক অত্যাচার! উঃ!"

বিমল ও কুমার হেসে ফেললে।

—"আপনারা হাসচেন? তা হাসুন! কিন্তু আমার বাড়ীটা যদি আপনাদের বাড়ী হ'ত, তাহ'লে আপনাদের মুখের হাসি মুখেই শুকিয়ে যেত। বুঝচেন মশাই, আমার বাড়ীটা এখন ভূতের বৈঠকখানা হয়ে দাঁড়িয়েচে!"

—"কি রকম, শুনি?"

—"শুনুন তাহ'লে। ঠিক মাসখানেক আগে আমরা বাড়ীতে তালা লাগিয়ে দেশে গিয়েছিলুম। ফিরে এসে দেখি, আমাদের সদর দরজার তালা ভাঙা। ভেতরে ঢুকে দেখি, উঠোনের ওপরে রূপোর বাসন আর আমার স্ত্রীর গয়নাগুলো ছড়িয়ে প'ড়ে আছে। ওপরে উঠে দেখি, প্রত্যেক ঘরের তালা ভাঙা। কোন ঘরে টেবিলের ভেতর থেকে কাগজ-

পত্তর বার ক'রে কে ঘরময় ছড়িয়ে রেখে গেছে, কোন ঘরে লোহার সিন্দুক ভাঙা প'ড়ে আছে, কোন ঘরে আলমারি ভেঙে কাপড়-চোপড়-গুলো কে লণ্ডভণ্ড ক'রে ফেলেচে! অথচ কিছুই হারায় নি। বলুন দেখি, এসব কি ব্যাপার? চোর এলে সব চুরি ক'রে নিয়ে যেত, কিন্তু আমার কিছুই চুরি যায়নি। একি ভূতুড়ে কাণ্ড নয়?"

বিমল বললে, "তারপর?"

—"দিন পনেরো আগে, অনেক রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠেই শুনলুম, আমার টেরিয়ার কুকুরটা বেজায় চীৎকার করচে। তারপরেই সে আর্তনাদ ক'রে একেবারে চুপ হয়ে গেল। আমি ভয়ে ঘর থেকে বেরুতে পারলুম না, সেইখান থেকেই চেঁচাতে লাগলুম। তারপর বাড়ীর সবাই যখন জেগে উঠল, তখন ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, আমার কুকুরটাকে গলা টিপে কে মেরে ফেলেচে। আর তার মুখে লেগে রয়েচে এক খাব্‌লা লোম!"

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, "লোম?"

—"হ্যাঁ! কিন্তু সে লোম আমার কুকুরের নয়। লোমগুলো আমি কাগজে মুড়ে রেখে দিয়েচি। এই দেখুন না।"—ব'লেই মাণিকবাবু কাগজের একটি ছোট পুরিয়া বার ক'রে বিমলের হাতে দিলেন।

বিমল পুরিয়াটা খুলে লোমগুলো পরীক্ষা ক'রে বললে, "আচ্ছা, এটা এখন আমার কাছে থাক্। তারপর কি হয়েছে বলুন।"

মাণিকবাবু বললেন, "কাল রাত্রে কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না। রাত তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে—চারিদিক স্তব্ধ। হঠাৎ শুনলুম, আমার বাড়ীর ছাতের উপর দুম্ দুম্ ক'রে শব্দ হচ্ছে,—সে মানুষের পায়ের শব্দ নয়, মানুষের পায়ের শব্দ অত ভারী হয় না, ঠিক যেন একটা হাতি ছাতময় চ'লে বেড়াচ্ছে। ভয়ে আমার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত যেন খাড়া হয়ে উঠল, কাঁপতে-কাঁপতে কোন রকমে বিছানার উপরে উঠে বসলুম। বাড়ীতে এই রকম গোলমাল দেখে আমি একটা বন্দুক কিনে-ছিলুম। তাড়াতাড়ি সেই বন্দুকটা নিয়ে একটা ফাঁকা আওয়াজ করতেই

ছাতের উপরের পায়ের শব্দ থেমে গেল। রাত্রে আর কোন হাঙ্গামা হয়নি।"

বিমল সুধোলে, "আপনি পুলিসে খবর দিয়েছেন?"

—"হ্যাঁ। পুলিস কোনই কিনারা করতে পারেনি।"

—"দেখুন মাণিকবাবু, আপনার সমস্ত কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনার বাড়ীতে যারা যারা আসচে তারা সাধারণ চোর নয়। তারা টাকা-পয়সার লোভে আসচে না। আপনার বাড়ীতে হয়তো এমন কোন জিনিস আছে, যার দাম টাকা-পয়সার চেয়ে বেশি।"

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে' থেকে মাণিকবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, "বিমলবাবু, এ-কথা তো আমি একবারও ভাবিনি!…হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেচেন, আমার বাড়ীতে একটা মূল্যবান জিনিস আছে বটে! ইচ্ছে করলে আমি রাজার ঐশ্বর্য পেতে পারি।"

—"তার মানে?"

—"তাহ'লে গোড়া থেকেই বলচি। আমার বাবার দুই ভাই। মেজো কাকার নাম সুরেনবাবু, ছোট কাকার নাম মাখনবাবু। গেল যুদ্ধের সময়ে আমার দুই কাকাই ফৌজের সঙ্গে আফ্রিকায় যান। তার-পর তাঁদের আর কোন খবর পাইনি। আজ তিন মাস আগে জাঞ্জিবার থেকে হঠাৎ মেজো কাকার এক মস্ত চিঠি পাই। চিঠির মর্ম মেজো কাকার ভাষাতেই আমার যতটা মনে আছে আপনাকে সংক্ষেপে বলচি:

"বাবা মাণিক,

আমি এখন মৃত্যুশয্যায়, আমার বাঁচবার কোন আশা নেই। এত-দিন আমি তোমাদের কোন খবর নিতেও পারিনি, নিজের কোন খবর দিতেও পারিনি, কারণ আফ্রিকার এমন সব দেশে আমাকে থাকতে হয়েছিল, যেখান থেকে খবরাখবর পাঠাবার কোনই উপায় নেই।

এখন কি জন্যে তোমাকে এই চিঠি লিখচি শোনো। ইস্ট-আফ্রিকার টাঙ্গানিকা-হ্রদের কাছে এক পাহাড়ের ভিতরে আমি অগাধ ঐশ্বর্য আবিষ্কার করেছি। সে ঐশ্বর্য পেলে অনেক রাজারাজড়ারও মাথা ঘুরে

যাবে।

এ-ঐশ্বর্য আমারই হ'ত। কিন্তু সাংঘাতিক পীড়ায় আমি এখন পরলোকের পথে পা দিয়েছি। আমার স্ত্রীও নেই, সন্তানও নেই—কাজেই ঐ ঐশ্বর্যের সন্ধান আমি তোমাকেই দিয়ে গেলুম। ওখানকার সমস্ত ধনরত্ন তুমি পেতে পারো।

এই পত্রের সঙ্গে ম্যাপ পাঠালুম, সেখানি খুব যত্নে সাবধানে রেখো। কোন্ পথে, কেমন ক'রে, কোথায় গেলে গুপ্তধন পাওয়া যাবে, এই ম্যাপে সব লেখা আছে। আর কেউ যেন এই ম্যাপের কথা জানতে না পারে।

আর একটা কথা মনে রেখো। একলা যেন এই গুপ্তধন নিতে এস না। কারণ দুর্গম পথ, পদে-পদে প্রাণের ভয়,—সিংহ, বাঘ, বুনো হাতি, হিপো, গণ্ডার, সাপ। অসভ্য জাতি আর নানান রকম ব্যাধি, কখন যে কার কবলে প্রাণ যাবে, কিছুই বলা যায় না। এ-সব বিপদ যদি এড়াতে পারবে ব'লে মনে কর, তবেই এস,—নইলে নয়।

চিঠির সঙ্গে গুপ্তধনের একটা ইতিহাস দিলুম, প'ড়ে দেখলে অনেক সুবিধা হবে।

ভগবান তোমার মঙ্গল করুন ; ইতি—তোমার মেজো কাকা।"

—"বিমলবাবু, আপনি কি মনে করেন, ঐ ম্যাপের জন্যেই আমার ওপরে অত্যাচার হচ্ছে? কিন্তু এ-সব কথা তো আমি আর কারুর কাছেই বলিনি!"

বিমল ঘরের ভিতরে খানিকক্ষণ নীরবে পায়চারি ক'রে বললে, "আপনার মেজো কাকার চিঠি আর ম্যাপ এখনো আপনার কাছেই তো আছে?"

—"নিশ্চয়! সেই চিঠি আর ম্যাপ আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ভিতরে পুরে আমার পড়বার ঘরে বইয়ের আলমারির মধ্যে রেখে দিয়েচি। সেখান থেকে কেউ তা খুঁজে বা'র করতে পারবে না।"

—"আপনার মেজো কাকার চিঠি পেয়েছেন, মাস-তিনেক আগে?"

—"হ্যাঁ।"

—"আর ঠিক তার দু-মাস পরেই আপনার বাড়ীতে উপদ্রব শুরু হয়েচে। এতেও কি আপনি বুঝতে পারছেন না যে, চোরেরা ঐ ম্যাপ-খানাই চুরি করতে চায়?"

—"এ চোরেরা কি অন্তর্যামী? ম্যাপের কথা এতদিন খালি আমি জানতুম, আর আজ আপনারা দু'জনে জানলেন।"

এমন সময়ে বাঘা এসে ঘরের ভিতরে ঢুকল। একবার মাণিকবাবুর পা দুটো গম্ভীর ভাবে শুঁকে দেখলে, তারপর পথের ধারের একটা জানলার কাছে গিয়ে গর্‌গর্‌ করতে লাগল।

মাণিকবাবু চেয়ারের উপরে দুই পা তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "ওকি মশাই, আপনার কুকুর অমন করে কেন? কামড়াবে নাকি?"

বিমল এক লাফে জানলার কাছে গিয়ে দেখলে, বাইরে রোয়াকের উপরে হুম্‌ড়ি খেয়ে ব'সে কে একটা লোক জানলায় কান পেতে আছে! সে হাত বাড়িয়ে তাকে ধ'রতে গেল, কিন্তু পারলে না। লোকটা তড়াক্‌ ক'রে রোয়াক থেকে নেমে রাস্তায় প'ড়েই তীরের মত ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাণিকবাবু বললেন, "ও আবার কি?"

কুমার বললে, "চোরেরা আপনার পিছনে চর পাঠিয়েছিল।"

—"আমার পিছনে! ও বাবা, কেন?"

—"কেন আর, আপনি আমাদের এখানে কেন আসচেন, তাই জানবার জন্যে। আপনি ম্যাপখানা কোথায় রেখেচেন, লোকটা নিশ্চয়ই তা শুনতে পেয়েচে।"

মাণিকবাবু আবার চেয়ারের উপর হতাশ ভাবে ব'সে প'ড়ে বললেন, "তাহ'লে এখন উপায়?"

বিমল বললে, "উঠুন মাণিকবাবু, শীগ্‌গির বাড়ীতে চলুন। আজ রাত্রে চোরেরা নিশ্চয়ই আপনার বাড়ি আক্রমণ করবে। আজ আমরাও আপনার বাড়িতে পাহারা দেব।"

দুই

ভূত ও মানুষ

রাত দশটা বেজে গেছে। তারা মাণিকবাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো।

মাণিকবাবুর বাড়ী একেবারে গঙ্গার খালের ধারে। প্রথমে খাল, তারপর রাস্তা, তারপর একটা ছোট মাঠ, তারপরে মাণিকবাবুর বাড়ী। জায়গাটা কলকাতা হ'লে কি হয়, যেমন নিরালা, তেমনি নির্জ্জন আর বাড়ী-ঘরগুলোও খুব তফাতে-তফাতে।

আকাশে এক ফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে বটে—কিন্তু সে চাঁদের নাম-রক্ষা মাত্র। চারিদিক প্রায়-অন্ধকারে আচ্ছন্ন—আশপাশের গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন কালোর কোলে জমাট বাঁধা অন্ধকারের গাছ।

বিজলী-মশালের ('ইলেকট্রিক টর্চ') আলোটা একদিকে ফেলে বিমল বললে, "মাণিকবাবু, আপনার বাড়ীর গায়েই ঐ যে মস্ত-বড় গাছটা ছাত ছাড়িয়ে ওপরে উঠেছে, ওটা বোধ হয়, বটগাছ ?"

মাণিকবাবু বললেন, "হ্যাঁ।"

সন্দেহপূর্ণ নেত্রে গাছের চারিদিকে আলো দেখতে-দেখতে বিমল কয়েক পা এগিয়ে গেল।

মাণিকবাবু কৌতূহলী হয়ে বললেন, "কি দেখচেন বলুন দেখি ?"

—"দেখচি ও-গাছের ভেতরে কেউ লুকিয়ে আছে কি না ?"

—"ও বাবা, সে কি কথা ! ও-সব দেখে-শুনে দরকার নেই মশাই, চলুন, আমরা বাড়ীর ভেতরে গিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে বসে থাকিগে ?"

—"কিন্তু ওরা যদি ঐ গাছ থেকে লাফিয়ে বাড়ীর ছাতে গিয়ে ওঠে, তা'হলে সদর দরজায় খিল লাগিয়ে করবেন কি ?"

—"গাছ থেকে লাফিয়ে ছাতে গিয়ে উঠবে ? অসম্ভব !"

—"কেন ?"

—"গাছ থেকে আমার বাড়ীর ছাত হচ্ছে এগারো বারো হাত তফাতে। মানুষ অত লম্বা লাফ মারতে পারে না।"

বিমল এগিয়ে গিয়ে গাছ আর বাড়ীর ব্যবধান দেখে কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বললে, "না, আপনার কথাই সত্যি বটে। কিন্তু আমি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, তবে বাইরের লোক আপনার বাড়ীর ভেতর গিয়ে কি ক'রে ঢোকে ?"

—"আমিও ভেবে কোন কূল-কিনারা পাই না মশাই।"

বিজলী-মশালের আলোটা বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে ঘুরিয়ে বিমল বললে, "হয়েচে। ছাত থেকে বৃষ্টির জল বেরুবার ঐ যে তিন-চারটে নল রয়েচে, চোরেরা নিশ্চয়ই ঐ নল বেয়ে ওপরে ওঠে।"

—"ও বাবা, বলেন কি ? ব্যাটাদের কি প'ড়ে মরবার ভয় নেই ?"

বিমল বললে, "চলুন, এখন আমরা বাড়ীর ভেতরে যাই।"

মাণিকবাবু এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তেই একজন চাকর ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে।

বাড়ীর ভেতর গিয়ে বিমল বললে, "মাণিকবাবু, আজ সদর দরজায় ভেতর থেকে একেবারে তালা বন্ধ ক'রে দিন। কেউ যেন আর দরজা না খোলে।"

মাণিকবাবু সেই হুকুম দিলেন।

বিমল বললে, আচ্ছা, "আপনার চাকর-বাকরেরা সব বিশ্বাসী তো ?"

—"আজ্ঞে, তাদের কারুকে সন্দেহ করবার উপায় নেই। সব পুরানো চাকর। কেবল..."

—"কেবল কি ? বলুন, থামলেন কেন ?"

—"কেবল একজন নতুন লোক আছে।"

—"নতুন ? কতদিন তাকে রেখেচেন ?"

—"সবে কাল সে এসেচে।"

—"আপনি তাকে চেনেন না ?"

—"না। কিন্তু তাকেও সন্দেহ করবার কারণ দেখি না। দিব্যি ভদ্দর চেহারা, আর ভারী শান্তশিষ্ট, মুখ তুলে কথাটি কইতে জানে না। বলতে কি, চেহারা দেখেই তাকে রেখেচি।"

—"আচ্ছা, তাকে একবার ডাকুন দেখি ?"

যে চাকরটা সদরে তালা বন্ধ করেছিল, তার দিকে ফিরে মাণিকবাবু বললেন, "ওরে রামুকে একবার ডেকে দে তো ?"

সে বললে, "আজ্ঞে, রামু বোধ হয় বেরিয়ে গেছে।"

—"বেরিয়ে গেছে ?"

—"আজ্ঞে, ঠিক বলতে পারচি না, তবে তাকে খানিকক্ষণ আর দেখতে পাচ্ছি না।"

মাণিকবাবু চোখ রাঙিয়ে বললেন, "আমি না বারণ করেছিলুম, সন্ধ্যের পর কারুকে বাড়ী থেকে বেরুতে ?"

বিমল বললে, "থাক্ মাণিকবাবু, এখানে দাঁড়িয়ে বকাবকি ক'রে কাজ নেই। আমরা এখন আপনার পড়বার ঘরে যেতে চাই।"

মাণিকবাবু বললেন, "চলুন।"

কুমার চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে, "সেই ঘরেই তো আপনার কাকার চিঠি আর ম্যাপখানা আছে ?"

—"হাঁ।"

......পড়বার ঘরের দরজার কাছে এসেই মাণিকবাবু সচমকে ব'লে উঠলেন, "এ কি !"

কুমার বললে, "কি হয়েচে মাণিকবাবু ?"

মাণিকবাবু হতভম্বের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, "এ-ঘরের তালা খুলল কে ?"

বিমল বললে, "আপনি তালা দিয়ে গিয়েছিলেন তো ?"

—"আলবৎ ! আমি নিজের হাতে ঘরে তালা দিয়ে দিয়েছি—"

বিমল এক ধাক্কা মারতেই দরজা খুলে গেল। সর্বাগ্রে ঘরের ভিতর

ঢুকে বললে, "মাণিকবাবু, আমি যে ভয় করেছিলুম তাই বুঝি ঠিক হ'ল। দেখুন,—দেখুন—ম্যাপ আর চিঠিখানা এখনো আছে কিনা ?"

মাণিকবাবু তীরের মতন ঘরের ভিতরে ঢুকে আগে গিয়ে একটা আলমারি খুলে ফেললেন। তারপর তাড়াতাড়ি একখানা মোটা বই বার ক'রে খানকয়েক পাতা উল্টে হতাশভাবে বললেন, সর্বনাশ হয়েচে। সে চিঠিও নেই, ম্যাপও নেই।"

কুমার বললে, "না মাণিকবাবু, আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়েচি!"

মাণিকবাবু কপালে করাঘাত ক'রে বললেন, "ঠিক সময়ে এসে পড়েচি না ছাই করেচি। আমার—"

কুমার বাধা দিয়ে বললে, "আগে ঐ টেবিলের তলায় তাকিয়ে দেখুন!"

মাণিকবাবু ও বিমল ঘরের কোণে একটা টেবিলের তলার দিকে চেয়ে দেখলে, কে একজন লোক সেখানে হুম্‌ড়ি খেয়ে ব'সে আছে।

কুমার বললে, "চুরি ক'রে চোর এখনো পালাতে পারেনি!"

বিমল এগিয়ে গিয়ে লোকটার পা-দুটো দু-হাতে ধ'রে তাকে হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে বার ক'রে আনলে!

তার মুখের পানে তাকিয়ে মাণিকবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "রামু!"

বিমল বললে, "এই কি আপনার নতুন চাকর ?"

মাণিকবাবু বললেন, "হ্যাঁ।...ওরে রাস্কেল, এই জন্যেই তুমি আমার বাড়ীতে চাক্‌রি নিয়েছ ? ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবে ?"

ঠিক সেই সময়ে ঘরের ছাতের উপর শব্দ হ'ল ধুপ্, ধুপ্, ধুপ্! মাণিকবাবু সেদিন কিছু ভুল বলেননি, ছাতময় যেন একটা হাতি চ'লে বেড়াচ্ছেই বটে। তার প্রত্যেক পায়ের চাপে ঘরখানা পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠছে—মানুষের পায়ের শব্দ এমন-ধারা হয় না!

মাণিকবাবু ভয়-শুক্‌নো মুখে বললেন, "ঐ শুনুন! নিচে চোর, ওপরে ভূত! আমি এবারে গেলুম!"

কেবল পায়ের শব্দ শুনে ভয় পাবার ছেলে বিমল ও কুমার নয়।

আসামের পাহাড়ে, মঙ্গল-গ্রহে ও মায়াকাননে গিয়ে তারা যে-সব অমানুষিক বিপদের কবলে পড়েছিল, তার কাছে এ তো তুচ্ছ ব্যাপার! সুতরাং তারা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল, শব্দটা ধীরে ধীরে ছাতের পূর্বদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিমল বললে, "মাণিকবাবু ছাতের পূব্‌দিকে কি আছে?"

—"নিচে নামবার সিঁড়ি।"

—"তাহ'লে ছাতে যার পায়ের আওয়াজ শুনচি, সে বোধ হয় আমাদের সঙ্গেই আলাপ করতে আস্‌চে।"

মাণিকবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, "ও বাবা, সে কি কথা!"

বিমল বললে, "এস কুমার, আমরা আগে এই লোকটাকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখি। তারপর যে মহাপুরুষ আসচেন তাঁকে ভালো ক'রেই অভ্যর্থনা করব।" বিমল ও কুমার রামুর হাত পা বাঁধতে লেগে গেল।

মাণিকবাবু দৌড়ে গিয়ে দেওয়ালের উপর থেকে তাঁর নতুন-কেনা বন্দুকটা পেড়ে নিলেন। তারপর খোলা জানলার দিকে ফিরে, প্রাণপণে তুই চক্ষু মুদে মুখ সিঁট্‌কে তুম ক'রে একবার বন্দুক ছুঁড়লেন এবং ধপাস্‌ ক'রে একখানা চেয়ারের উপর ব'সে পড়লেন। ছাতের ওপরে পায়ের শব্দ থেমে গেল!

কুমার বললে, "ওকি মাণিকবাবু, চোখ মুদে আছেন কেন?"

মাণিকবাবু বললেন, "ও বাবা, বন্দুক ছোঁড়া কি সোজা কথা?" বলেই আর একবার বন্দুক ছুঁড়লেন—তেমনি মুখ সিঁট্‌কে ও তুই চক্ষু মুদে।

ছাতের ওপরে পায়ের শব্দ আবার ধুপ্‌ ধুপ্‌ ক'রে ঘর কাঁপিয়ে এবারে এগিয়ে গেল পশ্চিম দিকে,—তারপরেই যে আওয়াজ হ'ল তাতে বোঝা গেল যে, কেউ ছাত থেকে পাশের বটগাছের ওপরে লাফিয়ে পড়ল!

মাণিকবাবুর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে বিমল বললে, "শীগ্‌গির টোটা দিন—শীগ্‌গির!"

মাণিকবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দুটো টোটা এনে বিমলের হাতে দিলেন। বিমল বন্দুকে টোটা ভরতে ভরতে বললে, "কুমার, তুমি টর্চের আলোটা মাঠে ফেলে দেখ, গাছ থেকে কে নামচে?"

কুমার বিজলী-মশাল জ্বেলে জানলার কাছে গেল এবং বিমলও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু মশালের আলো অত দূরে ভালো ক'রে পৌঁছলো না—কেবল অস্পষ্টভাবে এইটুকু দেখা গেল যে, চার-পাঁচটা মূর্তি মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে এবং তার মধ্যে একটা মূর্তি হচ্ছে মিশ্-মিশে কালো—আকারে প্রকাণ্ড ও তার দেহে একখণ্ড বস্ত্র পর্যন্ত নেই।

মাণিকবাবু জানলা দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখেই 'ভূত ভূত' ব'লে চেঁচিয়ে উঠে পিছিয়ে এলেন।

কুমার বিস্মিতস্বরে বললে, "কি ও? মানুষের মতন দেখতে অথচ—!"

বিমল মুখ ফিরিয়ে রহস্যময় হাসি হেসে বললে, "আর বন্দুক ছোঁড়া মিছে। নাগালের বাইরে গিয়ে পড়েচে!"

মাণিকবাবু বললেন, "কিন্তু কি দেখলুম বিমলবাবু। ভূত আর মানুষ একসঙ্গে ছুটচে?"

বিমল বললে, "ব্যাপারটা আশ্চর্য বটে, আমিও কিছু বুঝতে পারলুম না; কিন্তু সেকথা পরে ভাবা যাবে এখন। আপাততঃ শ্রীমান রামুর সঙ্গে একটু গল্প করা যাক্। কি বল রামু? তাহ'লে আজ সন্ধ্যের সময়ে তুমিই বোধ হয় আমার বাড়িতে আড়ি পাত্‌তে গিয়েছিলে?

রামু কোন জবাব দিলে না।

—"কিহে, কথা কইচ না যে বড়? মৌনী-বাবা হয়ে ধ্যান করচ নাকি?"

রামু মুখ খুললে না। কুমার বললে, "ওহে বিমল, রামু কথা না কইল তো বড় বয়ে গেল! ওর কাছে যে চিঠি আর ম্যাপ আছে তাই নিয়েই আমাদের দরকার।"

—"যা বলেচ!" বলে বিমল রামুর জামা-কাপড় সব হাতড়াতে লাগল! কিন্তু চিঠি ও ম্যাপ পাওয়া গেল না। বিমল তাকে খুব খানিকটা

ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "সেই চিঠি আর ম্যাপ কোথায় ?"

রামু চুপ।

মাণিকবাবু ক্ষাপ্পা হ'য়ে ঘুসি পাকিয়ে তেড়ে এসে বললেন, "তোর বোবার নিকুচি করেচে! "এখুনি মেরে হাড় ভেঙে দেব জানিস ?"

রামু বললে, "আমার কাছে কিছু নেই।"

—"নেই ? চালাকি পেয়েছিস ? নেই তো গেল কোথায় ?"

—"যারা এসেছিল তারা নিয়ে গেছে !"

মাণিকবাবু মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন।

তিন

দানবের আক্রমণ

চোরেরা গুপ্তধনের ইতিহাস আর ম্যাপখানা নিয়ে গেছে শুনে মাণিকবাবুর যে অবস্থা হ'ল তা আর বলবার নয়। সেই যে তিনি মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন, আর উঠলেন না, কথাও কইলেন না।

দেখে কুমারের বড় দুঃখ হ'ল।

বিমলের মুখ দেখে বুঝা গেল, রামুর কথায় তার বিশ্বাস হয়নি।

খানিকক্ষণ চিন্তা ক'রে সে বললে, "মাণিকবাবু, আমার বোধ হচ্ছে রামু মিছা কথা বলচে। যারা এসেছিল তারা ম্যাপ আর চিঠি নিয়ে যেতে পারেনি।"

মাণিকবাবু নিরাশ-মুখে বললেন, "কি ক'রে জানলেন, আপনি ?"

—"ম্যাপ আর চিঠি তারা যদি নিয়েই যাবে, তাহ'লে রামুও তাদের সঙ্গে পালায়নি কেন ? রামু তো ঐ দুটো জিনিসই চুরি করবার জন্যে আপনার বাড়ীতে চাকর সেজে আছে ? তবে কাজ হাসিল হবার পরেও সে এ-ঘরের ভেতর কি করছিল ?"

রামু বললে, "আপনারা হঠাৎ এসে পড়লেন যে! কেমন ক'রে আমি পালাব?"

বিমল বললে, "কিন্তু আমরা আসবার পরেও ম্যাপ আর চিঠি পেয়েও তোমার দলের লোকেরা ছাতের ওপরে অপেক্ষা করছিল কেন?......না মাণিকবাবু, আপনার চিঠি আর ম্যাপ বোধহয় এইখানেই কোথাও আছে! আসুন, আমরা আর একবার ভালো ক'রে খুঁজে দেখি।"

তন্ন তন্ন ক'রে প্রায় একঘণ্টা ধ'রে তারা ঘরের চারিদিক খুঁজলো, কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। তাদের দিকে তাকিয়ে রামু ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসতে লাগল।

মাণিকবাবু ক্ষাপ্পা হ'য়ে বললেন, "পোড়ার মুখে আবার হাসি হচ্ছে! দেব ঠাস্ ক'রে গালে এক চড়, হাসি একেবারে বেরিয়ে যাবে!"

বিমল বললে, 'রামু, ভালো চাও তো এখনো বল, ম্যাপ আর চিঠি কোথায় গেল?"

—"যারা নিতে এসেছিল তারা নিয়ে গেছে।"

—"কে তারা? কোথায় থাকে?"...রামু জবাব দিলে না।

মাণিকবাবু বললেন, "সহজে তুমি জবাব দেবে না—নয়? দেখবে তার মজাটা?"

রামু বললে, "আমাকে মেরে ফেললেও আমার পেট থেকে আর কোন কথা বেরুবে না।"

বিমল বললে, "মাণিকবাবু, ওকে নিয়ে আর সময় নষ্ট ক'রে কাজ নেই। আজকের মত ওকে থানায় পাঠিয়ে দিন। তার পরে ও মুখ খোলে কিনা দেখা যাবে!"

মাণিকবাবু তাই করলেন, দু'জন লোকের সঙ্গে রামুকে থানাতে পাঠিয়ে দিলেন।

বিমল বললে, "আজ বৈকালে বেশ এক পশলা বৃষ্টি পড়েছিল। আমি আসবার সময়েই দেখেছি মাঠের মাটি এখনো ভিজে আছে।"

কুমার বললে, "তুমি এ কথা বলচ কেন?"

—"বটগাছের আশে পাশে ভিজে মাটির ওপরে চোরেদের পায়ের দাগ নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যাবে। সেগুলো আমি একবার পরীক্ষা করতে চাই।"

মাণিকবাবু হতাশভাবে বললেন, "তাতে আর আমাদের কি সুবিধে হবে?"

বিমল বললে, "সুবিধে হয়তো কিছুই হবে না। তবে পরীক্ষা ক'রে দেখতে দোষ কি? অন্ততঃ এটা বুঝতে পারব তো, চোরদের দলে ক'জন লোক ছিল।"

বিমল এগুল, তার সঙ্গে সঙ্গে কুমারও অগ্রসর হলো। মাণিকবাবুও নিতান্ত নাচারের মতন তাদের পিছনে পিছনে নিচে নেমে এলেন। সদর-দরজা পার হ'য়ে মাঠের উপর প'ড়েই বিমল বিজলী-মশালের আলো চারিদিকে ফেলতে ফেলতে বললে, "মাণিকবাবু, এতক্ষণ আমরা কি ঐ ঘরে ছিলুম?"

—"হ্যাঁ।"

—"কুমার, ঐ ঘরের ঠিক নিচেই মাঠের ওপর সাদা কি-একটা প'ড়ে আছে দেখ তো?"

কুমার এগিয়ে গিয়ে বললে, "কাগজের একটা মোড়ক।"

মাণিকবাবু এক লাফ মেরে বললেন, "কাগজের মোড়ক? কাগজের মোড়ক? কৈ, দেখি—দেখি।" কুমার মোড়কটা নিয়ে এল।

মাণিকবাবু মোড়কটা সাগ্রহে টেনে নিয়ে মহা-উল্লাসে ব'লে উঠলেন, "এই যে আমার হারানিধি! এরই ভেতরে সেই চিঠি আর ম্যাপ আছে।"

বিমল বললে, "যা ভেবেচি তাই। আমি আগেই বুঝতে পেরে-ছিলুম, চিঠি আর ম্যাপ চোরেরা নিয়ে যেতে পারেনি। আমরা এসে পড়াতে পালাবার পথ না-পেয়ে রামু ঐ কাগজের মোড়কটা জানলা গলিয়ে মাঠে ফেলে দিয়েচে।"

মাণিকবাবু কাগজের মোড়কটা ভিতরকার জামার পকেটে রেখে দিয়ে বললেন, "উঃ! বিমলবাবু আপনার কি বুদ্ধি!"

বিমল বললে, "বুদ্ধি সকলেরই আছে মাণিকবাবু! তবে কেউ তা খেলাতে পারে, আর কেউ তা খেলাতে পারে না।...যাক্, আপনার জিনিস তো ফিরিয়ে পেলেন, এখন ঐ গাছের কাছে গিয়ে পায়ের দাগ-গুলো দেখে আসি চলুন।"

বটগাছের কাছে গিয়ে বিজলী-মশালের আলোতে দেখা গেল, ভিজে কাদার ওপরে নানা আকারের অনেকগুলো পায়ের দাগ! বিমল সেইখানে ব'সে কাগজ আর পেন্সিল বার ক'রে একে একে দাগগুলোর মাপ নিলে। তারপর বললে, "চোরেদের দলে লোক ছিল পাঁচজন। কিন্তু সেই পাঁচজনের ভেতর একজন হচ্চে অসাধারণ লোক।"

কুমার বললে, "অসাধারণ লোক?"

মাণিকবাবু বললেন, "অসাধারণ লোক! সে আবার কি?"

বিমল বললে, "এই দাগটার দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখুন। যার পায়ের এই দাগ, তার পা হচ্ছে সাধারণ মানুষের পায়ের চেয়ে প্রায় দু-গুণ বড়! তার পায়ের বুড়ো-আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলগুলোর চেয়ে অনেকটা তফাতে। সে মাটির ওপরে সমানভাবে পা ফেলে চলতে পারে না। তারপর অন্য অন্য পায়ের দাগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, এ-দাগটা তাদের চেয়ে কত বেশী গভীর। এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে, এ-একটা খুব লম্বা-চওড়া আর ভারী লোকের পায়ের দাগ। এক একটা দাগ যেন এক-একটা গর্ত! কে জানে তার দেহের ওজন কত মণ!... সেইজন্যেই ছাতের ওপরে তার পায়ের শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল, যেন একটা মত্ত হাতি ছাতময় চ'লে বেড়াচ্ছে।"

কুমার বিস্ফারিত চক্ষে বললে, "একি মানুষের পায়ের দাগ, না দানবের?"

মাণিকবাবু ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, "ও বাবা, চোরেরা কি একটা পোষা দৈত্য নিয়ে চুরি করতে এসেচে?"

কুমার বললে, "আমরা তো দূর থেকে ছায়ার মতন তাকে একবার দেখেচি! প্রকাণ্ড তার কালো চেহারা—সর্বাঙ্গ উলঙ্গ!"

মাণিকবাবু এদিকে ওদিকে তাকিয়ে শুষ্কস্বরে বললেন, "ও বাবা, আমার বুক্ যে ধুক্‌ধুক্ করচে। যদি সে আবার ফিরে আসে!"

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "হাঁ, দানবেরই মত বটে! সে যে কি, আমি তা কতকটা আন্দাজ করতেও পেরেচি, কিন্তু ব্যাপারটা আরো ভালো ক'রে তলিয়ে না বুঝে এখন কিছু বলতে চাই না… তবে এইটুকু জেনে রাখুন, মাণিকবাবু, আমার আন্দাজ যদি সত্যি হয়, তাহ'লে আমরা সামনা-সামনি পড়লে এই দানবের হাত থেকে কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারব না। আমরা তো দূরের কথা, চল্লিশ-পঞ্চাশজন মানুষকেও সে শুধু-হাতে পরাস্ত করতে পারে!"

মাণিকবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, "ও বাবা, সে কি কথা!"

কুমার বললে, "বিমল, তোমার কথা শুনে মনে হয়, ময়নামতীর মায়াকানন থেকে আবার কোন দানব বুঝি আমাদের পিছনে পিছনে কলকাতায় এসে হাজির হয়েচে!"

বিমল মুখ টিপে একটুখানি হাসলে, কোন কথা বললে না।

মাণিকবাবু আচম্বিতে বিমলকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলেন। বিমল সবিস্ময়ে বললে, "কি হ'ল মাণিকবাবু, কি হ'ল—হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরলেন কেন?"

মাণিকবাবু বললেন, "ঐ তারা আবার আসচে!"

বিমল সচমকে দেখলে, মাঠে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দুটো ছায়া মূর্তি তীরের মতন ছুটতে ছুটতে প্রায় তাদের কাছে এসে পড়েছে।

এক ঝট্‌কান মেরে বিমল তখনি মাণিকবাবুর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলে। তারপর দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে সিধে হয়ে দাঁড়ালো।

তাদের দেখেই মূর্তিদুটো প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে বাপরে, গেলুম! ভূতে ধরলে!"

"কে এরা?"

তাদের মুখের ওপরে আলো ফেলেই বিমল চিনতে পারলে, যাদের সঙ্গে রামুকে থানায় পাঠানো হয়েছিল এরা হচ্ছে তারাই।

মাণিকবাবুর ধড়ে এতক্ষণে যেন প্রাণ এল। তিনি ব'লে উঠলেন, "কে সতীশ? সুরেন? এমন করে ছুটে আসচ কেন? কি হয়েছে?"

—"বাবু? আপনারা এখানে আছেন? বাঁচলুম। আমরা ভেবেছিলুম সেই ভূতটা এখানে হাজির হয়েছে।"

—"কি বলচ সতীশ, তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। ভূত কি?"

—"ভয়ানক ব্যাপার বাবু, ভয়ানক ব্যাপার। আমরা যে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে আসতে পেরেছি, এইটুকুই আশ্চর্য।"

বিমল বললে, "রামু কোথায়?"

—"হয় পালিয়েচে, নয় ভূতের হাতে পড়েচে।"

—"বেশি বাজে বোকো না। আগে আসল কথা খুলে বল।"

—"বললে হয়তো আপনারা বিশ্বাস করবেন না, তবু না ব'লেও উপায় নেই। রামুকে নিয়ে আমরা থানায় যাচ্ছিলুম। এত রাত্রে পথে লোকজন ছিল না। আগে ছিল সুরেন, মাঝখানে রামু, আর পিছনে আমি। তারপর শীতলা-মন্দিরের সামনে সেই ঝুপ্‌সি অশ্বত্থ-গাছের তলায় গিয়ে যখন পৌঁছলুম, তখন—আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখলুম—হঠাৎ মস্ত-বড় একখানা কালো হাত গাছের উপর থেকে সাঁ ক'রে নেমে এসে সুরেনের গলা ধ'রে তাকে টেনে নিলে। তারপর ব্যাপারটা ভালো ক'রে বোঝবার আগেই ওপর থেকে একখানা হাত নেমে এসে আমাকেও ঠিক তেমনি ক'রেই টেনে নিলে। মিনিটখানেক আমাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেই হাতখানা আবার আমাকে ছেড়ে দিলে—কিন্তু মাটির ওপরে প'ড়ে রামুকে আর দেখতে পেলুম না। তারপর আমরা ছুটতে ছুটতে পালিয়ে আস্‌ছি!"

বিমল বললে, "রামু তাহ'লে পালিয়েচে? মাণিকবাবু, রামুর মুখে চোরেরা এতক্ষণে তাহ'লে শুনেচে যে কাগজের মোড়কটা কোথায় আছে! নিশ্চয়ই তারা আবার এখানে আসবে,—শীগ্‌গির বাড়ীর ভেতরে চলুন!"

মাণিকবাবু তীরের মতন বাড়ীর দিকে ছুটলেন। ভিতরে ঢুকেই

তিনি বললেন, "তারা আসচে! দরজা বন্ধ করে দাও—দরজা বন্ধ করে দাও!"

বিমল হেসে বললে, "সেই দানবের সামনে দরজা বন্ধ ক'রে কোনই লাভ হবে না! সে যদি আপনার দরজায় এক ধাক্কা মারে তাহ'লে আপনার দরজা এখনি তাসের বাড়ীর মত হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়বে!"

মাণিকবাবু ভীত মুখে বললেন, "ও বাবা, তার গায়ে এত জোর! তাহ'লে কি হবে?"

বিমল বললে, "হবে আর কি! আমাদের সঙ্গে বন্দুক আছে, এই যা ভরসা! তাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়েই আছি!"

মাণিকবাবু বললেন, "না মশাই, আমি মোটেই প্রস্তুত নই। মানুষ হ'য়ে দানবের সঙ্গে দেখা করব কি! আজ যদি বাঁচি, কালকেই আমি দেশে পালাব।"

চার

ঘটোৎকচের অন্তর্ধান

সবাই আবার উপরের ঘরে এসে উঠলেন। বিমল আগে ঘরের সমস্ত জানলা বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর একটা জানলার খড়খড়ি একটু-খানি ফাঁক ক'রে রেখে বললে, "কুমার, তুমি এইখানে চোখ দিয়ে ব'সে থাকো। তারা এলেই খবর দেবে। ততক্ষণে আমি মাণিকবাবুর কাকার চিঠিখানি পড়ে ফেলি।"

চিঠিখানা হচ্ছে এই ঃ

"স্নেহাস্পদেষু,

মাণিক, আমি এখন মৃত্যুমুখে, আমার আর বাঁচবার কোন আশাই নেই। আত্মীয়-স্বজনহীন এই সুদূর অসভ্যের দেশে থেকে, তোমাদের মুখ না দেখেই আমাকে পরলোকে যেতে হবে, একথা কোনদিন কল্পনা

করতে পারিনি। এ সময়ে তোমার ছোটকাকাও যদি কাছে থাকত, তাহ'লে অনেকটা সান্ত্বনা পেতুম। কিন্তু সে হতভাগা আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কোথায় চ'লে গেছে। হয়তো আমারি মত আফ্রিকার কোন জঙ্গলের ভিতরে তাকেও বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে। কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক্ !

যুদ্ধের সময় ইস্ট-আফ্রিকায় এসে কি ভাবে আমি দিন কাটিয়েছি, সে-সব কথা এখন বলবার দরকারও নেই, সময়ও নেই। আর বেশীক্ষণ আমি বাঁচব না—এখনি চোখে ঝাপসা দেখছি, লিখতে হাত কাঁপছে। নিতান্ত দরকারী কথা ছাড়া আর কিছুই বলবার সময় হবে না।

ইস্ট-আফ্রিকার যে জায়গাটায় আমি এখন আছি, তার নাম হচ্ছে উজিজি। এটা হচ্ছে আরবদের এক উপনিবেশ। এখানে বেশীরভাগই আরব ও সোহাহিলি জাতের লোক বাস করে। অন্যান্য জাতের লোকও কিছু কিছু আছে। উজিজি ঠিক শহর নয়, একটা মস্ত গ্রাম মাত্র। এই গ্রামটির কাছে আছে মস্ত একটি হ্রদ, তার নাম টাঙ্গানিকা। এদেশী ভাষায় 'টাঙ্গানিকা' অর্থে বোঝায়, মেলা-মেশার স্থান! টাঙ্গানিকাকে দেখলে সমুদ্র ব'লেই ভ্রম হয়, কারণ তার এপার থেকে ওপারে নজর চলে না—যেন অনন্ত জলরাশি থৈ থৈ করছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে টাঙ্গানিকা আগে সমুদ্রেরই অংশবিশেষ ছিল। পৃথিবীতে টাঙ্গানিকার চেয়ে লম্বা হ্রদ আর দুটি নেই। লম্বায় তা চারশো মাইলেরও বেশি এবং চওড়ায় কোথাও পঁয়তাল্লিশ আর কোথাও ত্রিশ মাইল।

এই বিশাল হ্রদের তীরে এক বুড়ো-আরবের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তুমি জানো, দেশে থাকতেই আমার শখ ছিল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা। এখানে এসেও আমি সে শখ ভুলতে পারিনি। অসুখ-বিসুখ হ'লে স্থানীয় লোকেরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সূত্রেই এই বুড়ো আরবের সঙ্গে আমার আলাপ। বছর তিন আগে বুড়ো আমার ওষুধের গুণে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিল! সেই থেকেই সে আমার অনুগত। কেবল অনুগত কেন, আমি তাকে আমার বন্ধু ব'লেই

মনে করতুম।

বুড়োর নাম হচ্ছে টিপ্যু টিব। পাঁচ ছয় মাস আগে সে-বেচারী মারা পড়েছে। তার একমাত্র ছেলে ছিল, গেল বছরে তারও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ গেছে। বুড়োর মৃত্যুকালে কেবল আমি তার কাছে ছিলুম। মৃত্যুর অল্প-ক্ষণ আগে বুড়ো আমাকে বললে, "বাবু, তুমিই এখন আমার মা-বাপ, তুমিই আমার ছেলে। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তাই আজ আমি তোমাকে এক গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে যেতে চাই।"

জ্বরের ঘোরে বুড়ো প্রলাপ বকছে ভেবে আমি বললুম, "থাক্, থাক্, ওসব কথা এখন থাক্।"

বুড়ো আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললে, "বাবু, আমার কথা মিথ্যা বলে মনে কোরো না। সত্যি-সত্যিই আমি এমন গুপ্তধনের সন্ধান জানি, যা পেলে তুমি সম্রাটের চেয়েও ধনী হবে!"

আমি বললুম, "এমন গুপ্তধনের সন্ধান সত্য-সত্যই যদি তোমার জানা থাকে, তবে তুমি এত গরীবের মতন আছ কেন?"

—গরীবের মত আছি কি সাধে? সে গুপ্তধন যেখানে আছে, সে বড় সহজ ঠাঁই নয়। সেখানে যেতে গেলেও লোকবল, অর্থবল, বাহুবল থাকা চাই! সে-সব কিছুই আমার নেই। কে আমার সঙ্গে যাবে? কাকে বিশ্বাস করব? হয়তো বন্ধু ব'লে যাদের সাহায্য চাইব, টাকার লোভে তারা আমারই গলায় ছুরি বসাবে। এমনি সাত-পাঁচ ভেবে এতদিন এই গুপ্তধনের ইতিহাস আর কারুর কাছে প্রকাশ করতে বা নিজেও সেখানে যেতে পারিনি! কিন্তু আজ খোদাতালা আমায় ডাক দিয়েছেন, আজ সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্যও আমার কোন কাজে লাগবে না। তাই তোমাকেই আমি এই গুপ্তধনের ঠিকানা দিয়ে যেতে চাই।"

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "এ গুপ্তধন কোথায় আছে?"

—"টাঙ্গানিকা হ্রদের ধারে উজিজির দক্ষিণ দিকে কাবেগো পাহাড়ের নাম শুনেচ তো? এই গুপ্তধন আছে তার কাছেই।"

আমি বললুম, "কিন্তু আমি তার খোঁজ পাব কেমন ক'রে।"

বুড়ো নিজের আলখাল্লার ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে একখানা কাগজ বের ক'রে বললে, "এই নাও একখানা ম্যাপ। এই ম্যাপ দেখলেই তুমি সমস্ত বুঝতে পারবে।"

ম্যাপখানা নিয়ে তার ভিতরে ইংরেজি লেখা দেখে আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললুম, "এ ম্যাপ তুমি কোথায় পেলে?"

বুড়ো আমার কথার জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ চোখ কপালে তুলে সে গোঁ গোঁ করতে লাগল। তারপর সে অজ্ঞান হ'য়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও আর তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারলুম না। এবং সেই অবস্থাতেই তার মৃত্যু হ'ল।

...মাণিক, তারপর থেকেই সেই গুপ্তধন ভূতে-পাওয়ার মতন আমাকে পেয়ে বসল। দিন রাত খালি সেই চিন্তা। শেষটা আর থাকতে না পেরে, জন-পনেরো অসভ্য কুলি নিয়ে আমি সেই গুপ্তধনের সন্ধানে যাত্রা করলুম। কিন্তু পথেই রোগ, বন্য-জন্তু আর অসভ্য বুনোদের কবলে পড়ে আমার সাঙ্গপাঙ্গদের অধিকাংশই মারা পড়ল। যথাস্থানে গিয়ে যখন উপস্থিত হলুম, তখন আমাদের দলে লোক ছিল মাত্র দুজন এবং আমিও পড়লুম জ্বরে। তার ওপরে প্রায় পাঁচ-ছয়শো অসভ্য লোক আমাদের আক্রমণ করতে এল। কাজেই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন ক'রে কোন গতিকে পালিয়ে এসে আমরা প্রাণরক্ষা করলুম।

অসভ্যদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচালুম বটে, কিন্তু সেই জ্বর হ'ল আমার কাল।

আমার ভাগ্যে গুপ্তধন লাভ হ'ল না। কিন্তু গুপ্তধন যে সেখানে আছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। স্থানীয় লোকদের কাছে শুনে জেনেছি, ঐ গুপ্তধনের কাহিনী সেখানে লোকের মুখে মুখে ফেরে। অনেককাল আগে কোন রাজা নাকি সেখানে ঐ গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গায় তা আছে এ-কথা কেউ জানে না। অনেকে সেই গুপ্তধনের খোঁজ করেছে, কিন্তু কেউ তা পায়নি।

এবং পাছে কেউ তার খোঁজ পায়, সেই ভয়ে সেখানকার অসভ্য জাতিরা সর্বদাই সজাগ হ'য়ে থাকে এবং কোন বিদেশীকেই সেখানে অগ্রসর হ'তে দেয় না।

মাণিক, এই গুপ্তধনের সন্ধান আমি তোমাকে দিয়ে গেলুম। সঙ্গের ম্যাপখানি দেখলেই তুমি সমস্ত সন্ধান জানতে পারবে। আমার তো আপন বলতে আর কেউ নেই। তুমি আমার বিষয়ের উত্তরাধিকারী। কাজেই আমার অবর্তমানে তুমিই এই গুপ্তধনের অধিকারী হ'তে পারবে।

কিন্তু সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এই গুপ্তধনের লোভে তুমি হয়তো কোন দিনই এখানে আসবে না। তবে যদি কখনো আসো, প্রস্তুত হয়ে আসতে ভুলো না। মনে রেখ, এখানে আসতে গেলে লোকবল, অর্থবল, বাহুবল থাকা চাই। এখানকার বনে-জঙ্গলে সিংহ আছে, চিতা বাঘ আছে, গরিলা, গণ্ডার, বিষাক্ত সাপ, অসভ্য শত্রু ও সাংঘাতিক রোগের ভয় আছে এবং তার ওপরে আছে বিষম পথকষ্ট।

ম্যাপখানি খুব যত্ন ক'রে লুকিয়ে রেখো। আমি ছাড়া আর একজন এই ম্যাপের কথা জানে। সে যে কে, তা আর তোমাকে বলতে চাই না। তবে এর মধ্যেই সে ঐ ম্যাপখানা চুরি করবার চেষ্টা করেছিল। অতএব খুব সাবধান! মনে রেখো, ঐ ম্যাপ হারালে তুমি গুপ্তধনও হারাবে।

আর আমার কিছু বলবার নেই। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি—

আশীর্বাদক—তোমার কাকা

পুঃ। হ্যাঁ, ভালো কথা! তোমরা যদি উজিজিতে আসো, তাহ'লে এখানে গাটুলা ব'লে এক বুড়ো সর্দার আছে, তার সঙ্গে দেখা ক'রে নিজের পরিচয় দিও। গাটুলা খুব বিশ্বাসী, আর আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে। আমি যখন গুপ্তধন আনতে গিয়েছিলুম, তখন সেও আমার সঙ্গে ছিল। পথের খবর সে সব জানে। তাকে সঙ্গে নিলে তোমার অনেক উপকার হবে।"

চিঠিখানা প'ড়ে বিমল খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, "মাণিকবাবু, কালকেই আপনার বাড়ীর সবাইকে দেশে পাঠিয়ে দিন। তারপর এ বাড়ীতে তালা বন্ধ ক'রে আপনি আমার বাড়ীতে থাকবেন চলুন।"

মাণিকবাবু বললেন, "আপনার বাড়ীতে গিয়ে থাকব ? কেন বলুন দেখি ?"

—"তাহ'লে আপনি অনেকটা নিরাপদ থাকতে পারবেন। আমরা ত আর রোজ এখানে এসে পাহারা দিতে পারব না।"

—"কিন্তু বিমলবাবু, মাথার ওপরে এ-রকম বিপদ নিয়ে আর ক'দিন এমন ক'রে চলবে ?"

—"আর বেশি দিন নয়, সাত দিন। তারপরেই আমরা আফ্রিকায় যাত্রা করব।"

মাণিকবাবু চম্‌কে উঠে বললেন, "ও বাবা, সে কি কথা ? আফ্রিকায় যাব কি !"

বিমল বললে, "আফ্রিকায় না গেলে গুপ্তধন পাবেন কি ক'রে ?"

মাণিকবাবু শুক্‌নো মুখে বললেন, "কাকার চিঠিখানা পড়লেন তো ? সেখানে সিঙ্গি আছে, বাঘ আছে, সাপ আছে, গরিলা আছে—"

বিমল বাধা দিয়ে বললে, "হ্যাঁ, পৃথিবীর যত বিপদ সব সেখানে আছে। তা আমি জানি। আর জানি বলেই তো সেখানে যেতে চাচ্ছি। আপনার জন্যে সেখানে গুপ্তধন আছে, আর আমাদের জন্যে আছে বিপদ—কেবল বিপদ। আপনার গুপ্তধনের ওপরে আমাদের কোন লোভ নেই, আমরা চাই খালি বিপদকে ! সে বিপদ হবে যত ভয়ানক, আমাদের আনন্দ হবে তত বেশী।"

মাণিকবাবু হতভম্বের মতন বললেন, "বলেন কি মশাই ?"

কুমার জানলার কাছ থেকে স'রে এসে বললে, "হ্যাঁ মাণিকবাবু, বিপদকে আমরা ভালবাসি। বিপদ না থাকলে মানুষের জীবনটা হয় আলুনি আলুভাতের মতন ! সে-রকম জীবনকে আমরা ঘৃণা করি ! বিপদকে

আমরা ভালবাসি।”

মাণিকবাবু বললেন, “আমি কিন্তু বিপদ-আপদ মোটেই পছন্দ করি না।”

কুমার হেসে বললে, “কিন্তু পছন্দ না করলেও, বিপদ এসে আপনারই দরজায় অপেক্ষা করছে। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখুন, নিচে কারা দাঁড়িয়ে আছে।”

বিমল বললে, “অ্যাঁ! তারা এসেচে নাকি?”

কুমার বললে, “হ্যাঁ। কিন্তু অন্ধকারে তাদের দেখাচ্ছে, আবছায়ার মত। বিশেষ কিছুই বোঝবার যো নেই।”

মাণিকবাবু ধপাস্ ক'রে একখানা চেয়ারের ওপরে ব'সে পড়লেন। বিমল জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বাইরে এত অন্ধকার যে, চোখ প্রায় চলে না। নিচে জমির ওপরে কারা চলা-ফেরা করছে—ঠিক যেন কতকগুলো ছায়া ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছে। একটা ছায়া খুব প্রকাণ্ড এবং অন্ধকারের চেয়েও কালো! কেবল সেই ছায়াটা চলা-ফেরা করছিল না—সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খালি দুলছে আর দুলছে। অন্ধকারের ভিতর থেকে তার দুটো চোখ দু-টুক্‌রো কয়লার মতন জ্বলে উঠছে। সে চোখ কি মানুষের চোখ?

হঠাৎ নিচে থেকে চাপা-গলায় কে বললে, “না, সে কাগজের মোড়কটা এখানে নেই।”

আর-একজন বললে, “ভালো ক'রে খুঁজে ছাখ্।”

—“আর খোঁজা মিছে! সেটা নিশ্চয়ই কেউ কুড়িয়ে নিয়ে গেছে।”

—“নিয়ে আর যাবে কোথায়? দেখচি আমাদের বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে হবে। ঘটোৎকচ!”

প্রকাণ্ড ছায়াটা দুলতে-দুলতে এগিয়ে এল।

—“ঘটোৎকচ! আমাদের সঙ্গে আয় আবার আমাদের গাছে চড়তে হবে।”

বিমল ওপর থেকে চেঁচিয়ে বললে, “এস বন্ধুগণ, আমরাও তোমাদের

আদর করবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে আছি।···কুমার, বন্দুকটা এগিয়ে দাও তো।"

এক মুহূর্তের ভিতরে মাঠের ওপর থেকে ছায়াগুলো স্যাঁৎ-স্যাঁৎ ক'রে স'রে গেল।

বিমল মুখ ফিরিয়ে বললে, "মাণিকবাবু, চাঙ্গা হ'য়ে উঠুন। ঘটোৎকচ আজ আর যুদ্ধ করবে না।"

পাঁচ

এই কি ঘটোৎকচ?

ডেক্-চেয়ারের ওপরে ব'সে এবং রেলিং-এর ওপরে হাত ও মুখ রেখে মাণিকবাবু অত্যন্ত ম্রিয়মাণের মতন সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

কুমার তাঁর কাঁধের ওপরে একখানা হাত রেখে বললে, মাণিকবাবু, কি ভাবচেন?"

—"ভাবচি আমার মাথা আর মুণ্ডু, আকাশ আর পাতাল!"

—"ভেবেও কোন কূল-কিনারা পাচ্ছেন না বুঝি?"

—"কূল-কিনারা? অকূলে ভেসে কূল-কিনারা খুঁজে লাভ? আমি এখন মরিয়া হয়ে উঠেচি—একদম মরিয়া! এখন আমি মানুষ খুন করতে পারি।"

—"ভাল কথাই তো! তাহ'লে এখন আপনার আর কোন দুঃখ নেই তো?"

মাণিকবাবু আবার কেমন মুষড়ে পড়লেন। কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "ও বাবা, দুঃখ আবার নেই? কোথায় যাচ্ছি ভগবান জানেন; কাঁধের ওপরে মাথা নিয়ে আর কি কখনো দেশে ফিরতে পারব?"

এমন সময়ে বিমল, পুরাতন ভৃত্য রামহরি এবং তাদের পিছনে-

পিছনে বাঘা-কুকুর সেখানে এসে হাজির হ'ল।

বিমল বললে, "মাণিকবাবুর সঙ্গে কি কথা হচ্ছে কুমার?"

কুমার বললে, "দেশ ছেড়ে মাণিকবাবুর বড় দুঃখ হয়েচে।"

বিমল বললে, 'তা তো হবেই কুমার! তাই হওয়াই তো উচিত। দেশ ছাড়তে যার মনে দুঃখ হয় না, আমি তাকে ঘৃণা করি। যে-দেশের মাটি আমাকে শয়নের শয্যা পেতে দিয়েচে, ক্ষুধায় ফল-ফসল জুগিয়েচে, তেষ্টায় অমৃতের মতন মিষ্টি জল দান করেচে—যে দেশের বাতাস আমার নিঃশ্বাস হয়েচে, যে-দেশের আকাশ সূর্য-চাঁদের আলো জ্বেলে আমার চোখে দৃষ্টি দিয়েচে, সে-দেশকে ছাড়তে প্রাণ যে না কেঁদে পারে না! মানুষ-মায়ের চেয়েও যে এই দেশ-মা বড়! মানুষ-মা তো চিরদিন তাঁর সন্তানকে লালন-পালন করতে পারেন না। কিন্তু দেশ-মা যে চিরদিন তাঁর নিজের মাটি-কোলের ভিতরে ছেলে-মেয়েকে আদরে আগলে রেখে দেন—তাঁর মৃত্যু নেই, শ্রান্তি নেই, অযত্ন নেই! ঐ চেয়ে দেখ, আমাদের সোনার দেশ সোনার সূর্যের সোনার আলোয় ঝল্‌মল্‌ করতে-করতে এখনও আমাদের মুখের পানে কত স্নেহ, কত প্রেম নিয়ে তাকিয়ে আছেন!"

জাহাজ তখন আরব-সাগরের সুনীল বক্ষ ভেদ ক'রে সশব্দে অগ্রসর হচ্ছিল। দূরে দেখা যাচ্ছে মা ভারতবর্ষের রৌদ্রধৌত বিপুল তটভূমি—মাথার উপরে নির্মেঘ নীলাকাশের উজ্জ্বল চন্দ্রাতপ বুকের উপরে শত উপবনের শ্রীমন্ত শ্যামলতা আর সহস্র মন্দির-প্রাসাদের উচ্চ চূড়া এবং চরণের উপরে আরতিমত্ত মহাসমুদ্রের ফেনশুভ্র লক্ষ চঞ্চল বাহুর প্রণাম-আগ্রহ!···ভারতবর্ষ! ভীমার্জুনের জন্মক্ষেত্র! আর্য-জাতির স্বদেশ!

সকলে নীরবে সেই দিকে চেয়ে অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর রামহরি বললে, "দেশকে যদি অতই ভালবাস, তা'হলে দেশ ছেড়ে আবার বিদেশে যাওয়া কেন বাপু? সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছিল বুঝি?"

বিমল হেসে বললে, "হ্যাঁ রামহরি, ঠিক তাই। তুমি তো জানই

আমাদের ঘাড়ে সর্বদাই একটা ভূত চেপে থাকে, যেই দু'দণ্ড চুপ ক'রে বসি, অমনি সেই ভূতটা এসে পিঠে কিল মারে, আর ভূতের কিল হজম করতে না পেরে আমরাও তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে পড়ি।"

রামহরি রাগে গজগজ করতে-করতে বললে, "ঐ ভূতই একদিন তোমাদের ঘাড় মট্‌কাবে!"

কুমার বললে, "আচ্ছা রামহরি, ময়নামতীর মায়াকাননে তুমিই তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে, আর কখনো আমাদের সঙ্গে আসবে না। তবে এবারেও আবার এলে কেন?"

রামহরি বললে, "আসি কি আর সাধে রে বাপু? চিলে যখন চড়ুয়ের ছানাকে ছোঁ মারে তখন চড়ুই-মা চিলের পিছনে ছুটে যায় কি শখ ক'রে। তোমাদের সঙ্গে আসতে হয়, না এসে উপায় নেই ব'লে। এখনো আমার এই বুড়ো হাড়ে ঘুন ধরেনি, এখনো চার-পাঁচটা জোয়ান মরদের সঙ্গে আমি খালি-হাতে লড়তে পারি—আর আমি থাকতে তোমরা কোন্ বিদেশে বিঘোরে প্রাণ হারাবে, তাও কি কখনো হয়! আয়রে বাঘা, এখান থেকে চ'লে আয়, পাগলদের সঙ্গে বকাবকি ক'রে লাভ নেই"—এই ব'লে বাঘাকে নিয়ে সে চ'লে যাচ্ছিল, কিন্তু যেতে-যেতে হঠাৎ একদিকে চেয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বিমলকে বললে, "দেখ খোকাবাবু, জাহাজে উঠে পর্যন্ত দেখছি, ঐ বেয়াড়া-চেহারা লোকটা সব জায়গাতেই খালি আমাদের পিছনে-পিছনে ঘুরচে।"

একটু তফাতেই একটা লোক বুকের উপরে দুই হাত রেখে রেলিঙে ঠ্যাসান দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল এবং তার চেহারা কেবল বেয়াড়া নয়, ভয়ানকও বটে। লোকটা মাথায় অন্ততঃ সাড়ে-ছয় ফুট উঁচু, চওড়াতেও প্রকাণ্ড—এমন লম্বা-চওড়া লোক যে থাকতে পারে, না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সব-চেয়ে ভীষণ হচ্ছে তার মুখ। তার রং আবলুষ কাঠের মতন কালো-কুচ্‌কুচে ও তার চোখ দুটো আশ্চর্য-রকম জ্বল-জ্বলে ও জন্তুর মতন হিংস্র। তার নাকটা বাঁদরের মতন থ্যাব্‌ড়া। আর মাংসহীন মড়ার মাথার দাঁতগুলো যেমন বেরিয়ে

থাকে তারও দু-পাটি দাঁত তেমনিভাবে ছরকুটে বাইরে বেরিয়ে আছে —কারণ, তার ওপরের ও নিচের দুই ঠোঁটই না-জানি কোন দুর্ঘটনায় কেমন ক'রে উড়ে গেছে। তার মাথায় লাল রঙের একটা তুর্কী 'ফেজ্' টুপী, পরনে খাকি কোর্তা ও 'প্যাণ্ট' এবং হাতে এমন একগাছা লাঠি, যার এক ঘায়ে যে-কোন মানুষের মাথা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে।

এ-রকম খাপ্সুরৎ চেহারা রাতের বেলায় সুমুখে দেখ্লে রাম-নাম জপ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না, দিনের বেলাতেই তাকে দেখে মাণিকবাবু চক্ষু ছানাবড়া ক'রে ভয়ে আঁৎকে উঠলেন।

বিমল অবাক হয়ে তার দিকে দু'পা এগিয়ে যেতেই সে আস্তে-আস্তে অন্যদিকে চলে গেল এবং যাবার সময়েও কুৎকুতে চোখের কোণ দিয়ে চোরাচাহনিতে বার-বার তাদের পানে তাকাতে লাগল।

তার চলার ধরন দেখে বিমলের দৃষ্টি তার পায়ের দিকে আকৃষ্ট হ'ল। লোকটার ডান-পায়ে মাত্র ক'ড়ে-আঙুল ছাড়া আর কোন আঙুল নেই!

কুমার বিস্মিতকণ্ঠে বললে, "কে ও? আর আমাদের পিছুই-বা নিয়েচে কেন?"

বিমল বললে, "ওর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, লোকটা জাতে কাফ্রি—আমরা যেখানে যাচ্ছি সেই আফ্রিকারই বাসিন্দা। ওর ফেজ টুপী দেখে বোঝা যাচ্ছে, লোকটা ধর্মে মুসলমান। ওর ভাবগতিক দেখে বোঝা যাচ্ছে, লোকটা যেই-ই হোক্, আমাদের বন্ধু নয়।"

কুমার বললে, "বন্ধু নয়! শত্রু? তবে কি বুঝতে হবে, শত্রুরাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এই জাহাজে চ'ড়ে আফ্রিকায় যাচ্ছে?"

বিমল বললে, আমার তো সেই সন্দেহ-ই হচ্চে।"

—"কিন্তু তারা কারা?"

—"কি ক'রে বলব? রামু ছাড়া তাদের দলের আর কারুকে আমরা দেখিনি। রামু যদি জাহাজে উঠে থাকে, তবে নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে। অন্য কোন শত্রুকে আমরা চিনি না, আর এই কাফ্রিটা সত্য-

সত্যই আমাদের শত্রু কিনা তা'ও ঠিক ক'রে বলা যায় না। কিন্তু সন্দেহ যখন হচ্ছে, তখন আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে।"

মাণিকবাবু বললেন, "ও কাফ্রিটা যে কে, আমি বলতে পারি।"

বিমল সবিস্ময়ে বললে, "আপনি বলতে পারেন?"

—"হ্যাঁ। ঐ লোকটা হচ্ছে আপনার সেই ঘটোৎকচ।"

বিমল হাসতে-হাসতে বললে, "না মাণিকবাবু, না। ঘটোৎকচের চেহারা এতটা ভদ্র হ'তে পারে না।"

মাণিকবাবু বললেন, "ও বাবা, ঐ কাফ্রিটার চেহারা হ'ল আপনার কাছে ভদ্র?"

বিমল মাথা নেড়ে বললে, "না, আমার কাছে নয়—কিন্তু ঘটোৎ-কচের কাছে ওর চেহারা ভদ্র বৈকি। ঘটোৎকচকে সামনে দেখলে আপনি এখনি মূর্চ্ছা যেতেন।"

—"কি ক'রে জানলেন আপনি?"

—"আমার কাছে প্রমাণ আছে। আর সে প্রমাণ আপনিই আমাকে দিয়েছিলেন।"

—"ও বাবা, সে আবার কি?"

—"হ্যাঁ। পরে সব জানতে পারবেন।"

ছয়

ঘটোৎকচ গ্রেপ্তার

সেদিন বৈকালে বিমল, কুমার ও রামহরি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে কথাবার্তা কইছিল। মাণিকবাবু আজ কেবিন থেকে বাইরে বেরুতে পারেননি। তিনি সামুদ্রিক-পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন—ক্রমাগত বমন করছেন।

চারিদিকে নীল জল থৈ থৈ করছে—অগাধ সমুদ্র যেন নিজের

সীমা হারিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে গিলে ফেলে, আকাশের প্রান্তে ছুটে গিয়ে তাকেও ধ'রে টেনে পাতালে চুবিয়ে দিতে চাইছে। এবং সূর্য শূন্য-পথে পশ্চিমে এগুতে এগুতে মহাসাগরের অনন্ত বুক জুড়ে যেন লক্ষ-কোটি হীরের প্রদীপ জ্বালছে আর নেবাচ্ছে—জ্বালছে আর নেবাচ্ছে! সে আলো-খেলার দিকে তাকালেও চোখ অন্ধ হয়ে যায়!

রামহরি বলছিল, "খোকাবাবু, তোমরা মিছে ভয় পেয়েছ। শত্রুরা আমাদের পিছু নিতে পারে নি। তা'হলে এতদিনে নিশ্চয়ই আমরা টের পেতুম।"

বিমল বললে, "হ্যাঁ, আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। আমরা বোধ-হয় তাদের ফাঁকি দিয়েছি।"

কুমার বললে, "একটা বিপদ কমল বটে, কিন্তু আমাদের সামনে এখনো লক্ষ বিপদ আছে।…আচ্ছা বিমল, আমাদের সমুদ্রযাত্রা কবে শেষ হবে বলতে পারো? আর ভালো—"

কুমারের মুখের কথা ফুরুবার আগেই বিমল তাকে ও রামহরিকে এক-এক হাতে প্রচণ্ড এক-একটা ধাক্কা মেরে নিজেও বিদ্যুতের মতন সাঁৎ-ক'রে এক পাশে স'রে গেল। ধাক্কার বেগ সামলাতে না পেরে কুমার ও রামহরি দু-দিকে ঠিক্‌রে প'ড়ে গেল এবং পড়তে পড়তে শুনতে পেলে, তাদের পাশেই দমাস্ ক'রে বিষম এক শব্দ আর ওপর থেকে হো হো ক'রে অট্টহাসির আওয়াজ!

দু'জনে উঠে দেখে, তারা যেখানে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেইখানটায় মস্ত একটা পিপে প'ড়ে ভেঙে গেছে এবং তার ভিতর থেকে একরাশ লোহা-লক্কড় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে!

বিমল হাস্যমুখে বললে, "কুমার, ভাগ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম! নইলে এই লোহা-বোঝাই পিপেটা মাথায় পড়লে আমাদের সমুদ্রযাত্রা আজকেই শেষ হয়ে যেত!"

কুমার বিবর্ণমুখে বললে, "কে এ কাজ করলে?"

—"ওপরের ডেক থেকে এই পিপেটা পড়েছে। সেই সময়েই

পিপেটার দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়ে যায়। আমি আর কিছু দেখতে পাইনি—দেখবার সময়ও ছিল না। কিন্তু আমাদের বধ করবার জন্যেই যে এই পিপেটাকে ফেলা হয়েছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।"

রামহরি বললে, "আমি একটা বিচ্ছিরি হাসি শুনেছি।"

কুমার বললে, "আমিও শুনেছি। চল, ওপরে গিয়ে একবার খোঁজ ক'রে আসা যাক্। যদি তাকে পাই তা'হলে এবারে সে নিশ্চয়ই আর হাসবে না।"

তিন জনে ওপর-ডেকে গেল। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। তখন জাহাজের কাপ্তেন-সাহেবকে ডেকে এনে বিমল সব কথা বললে ও ভাঙা পিপেটাকে দেখালে। কাপ্তেন জাহাজের কর্মচারী ও লস্করদের ডেকে আনিয়ে অনেক প্রশ্ন করলে, কিন্তু কেউ কোন সন্ধান দিতে পারলে না।

পরের রাত্রে—জাহাজ মোম্বাসায় পৌঁছবার আগের রাত্রেই, আবার এক ঘটনা!

বিমলরা একটা গোটা কেবিন 'রিজার্ভ' করে সবাই এক ঘরে থাকত। মাণিকবাবু, কুমার ও রামহরি ঘুমিয়ে পড়বার পরেও বিমল একখানা বই নিয়ে জেগে রইল। তারপর রাত যখন একটা বাজল, তখন সে আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। জাহাজের ওপরে আছড়ে সমুদ্রের জল কেঁদে উঠেছে ; তাই শুনতে শুনতে তার চোখ ঘুমে এলিয়ে এল।

…হঠাৎ বাঘার গোঁ গোঁ গর্জন তারপরই তার আর্তনাদ শুনে চট্ ক'রে বিমলের ঘুম ভেঙে গেল। ধড়্মড়িয়ে উঠে বস্‌তে বস্‌তেই সে শুনলে, বাঘা আবার গর্জন ক'রে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে দড়াম্ ক'রে তাদের কেবিনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল! আলোর চাবি টিপে বিমল দেখলে, বাঘা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে কেবিনের বন্ধ দরজার ওপরে বার-বার ঝাঁপিয়ে পড়ছে! ততক্ষণে আর-সকলেও জেগে উঠল।

বিমল বললে, "অন্ধকারে ঘরের ভিতর কে ঢুকেছিল, বাঘার সঙ্গে লড়াই ক'রে সে আবার দরজা বন্ধ ক'রে চম্পট দিয়েছে!"—ব'লেই সে

নিচে নেমে মেঝে থেকে কি তুলে নিলে।

কুমার বললে, "কি ও?"

—"একরাশ লোম।"

—"লোম!"

—"হ্যাঁ।" বিমল পকেটে হাত দিয়ে একটা কাগজের ছোট মোড়ক বার করে বললে, "মাণিকবাবু, দেখে যান!"

মাণিকবাবু ভয়ে-ভয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

বিমল বললে, "মাণিকবাবু, আপনি প্রথম যেদিন আমাদের বাড়ীতে যান, সেই দিন এই কাগজের মোড়কটা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, মনে আছে?"

—"হ্যাঁ, ওর ভেতরে একথোকা লোম আছে। শত্রুরা আমার বাড়ী আক্রমণ ক'রে চলে যাবার সময়ে আমার মরা-কুকুরের মুখে ঐ লোমগুলো লেগেছিল।"

—"আর কেবিনে যে ঢুকেছিল, তারও গা থেকে বাঘা কামড়ে লোমগুলো তুলে নিয়েছে। দেখুন, এই লোম আর আপনার মোড়কের লোম এক কিনা!"

সকলে আগ্রহে ঝুঁকে প'ড়ে দেখলে, সব লোমই এক-রকমের। মাণিকবাবু ভয়ে ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলেন। রামহরি তাড়াতাড়ি বাঘার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল, তার কোথাও চোট্ লেগেছে কিনা।

কুমার বাঘার মাথা চাপড়ে বললে, "শাবাশ বাঘা। মাণিকবাবুর কুকুর যুদ্ধে মারা পড়েছিল, তুই কিন্তু লড়াই ফতে করেছিস্। আমাদের বাঘা কি যে-সে জীব, জলে-স্থলে-শূন্যে সর্বত্র সে জয়ী হয়েছে!"

এমন সময়ে বাইরে গোলমাল শোনা গেল—চারিদিকে যেন অনেক লোকজন ছুটোছুটি করছে। বিমল, কুমার ও রামহরি তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল। মাণিকবাবু কেবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে হতাশ ভাবে ব'সে প'ড়ে বললেন, "প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারব

না দেখছি !"

ডেকের ওপরে লোকারণ্য। কাপ্তেন-সাহেব দাঁড়িয়ে আছে এবং নিচে দু'হাতে ভর দিয়ে ব'সে একজন পূর্ববঙ্গীয় লস্কর ক্ষীণস্বরে বলছে —"না, না, আমি ভুল দেখিনি। ভূত—একটা ভূত আমাকে মেরেছে!"

একে-তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বিমল ব্যাপারটা সব শুনলে। খানিক আগে ঐ লস্করটা এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। চাঁদের আলোয় হঠাৎ সে দেখতে পায় কে যেন চোরের মত লুকিয়ে-লুকিয়ে তার সামনে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। লস্করটা তাকে ধরতে যায়, অমনি সেও তার ওপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গলা টিপে তাকে অজ্ঞান ক'রে ফেলে। লস্কর বলছে, মানুষের মতন তার হাত-পা আছে বটে, কিন্তু সে মানুষ নয়, ভূত। কাপ্তেন তার কথায় বিশ্বাস করছে না।

ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে বিমল কাপ্তেনের কাছে সেই অজ্ঞাত শত্রুর সঙ্গে বাঘার যুদ্ধের কথা খুলে বললে। কাপ্তেন বিস্মিত-স্বরে বললে, "তুমি বলতে চাও, যে তোমাদের কেবিনে ঢুকেছিল তার গায়ে লোম আছে ?"

—"হ্যাঁ, এই দেখ।" বিমল মোড়কটা কাপ্তেনের সামনে খুলে ধরলে।

কাপ্তেন হতভম্বের মতন মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললে, "জানি না, এ কি ব্যাপার! ভগবান আমাদের রক্ষা করুন।"

কে একজন অস্ফুটকণ্ঠে হেসে উঠল। বিমল চমকে মুখ তুলে দেখলে, ভিড়ের ভিতরে সকলের মাথার ওপরে মাথা তুলে সেই সাড়ে-ছয়-ফুট-উঁচু-লম্বা-চওড়া কাফ্রিটা ওষ্ঠহীন মড়ার মতন দাঁত-বার-করা ভয়ানক মুখে হাসছে, কি যে হাসছে, না ভয় দেখাচ্ছে ?

পরদিন জাহাজ ইস্ট-আফ্রিকার মোম্বাসা বন্দরে এসে থামল। সঙ্গে সঙ্গে অগণ্য ছোট নৌকা এসে পঙ্গপালের মতন জাহাজখানিকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে; এবং তাদের ওপরে ব'সে 'সোয়াহিলি'

জাতের মাঝিমাল্লারা দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে, নানারকম ভঙ্গিতে হাত নেড়ে আপন-আপন নৌকায় আসবার জন্যে যাত্রীদের ডাকতে লাগল।

বিমল, কুমার, মাণিকবাবু ও রামহরি নিজেদের মালপত্তর ডেকের ওপরে এনে রাখছে, এমন সময়ে বিমল হঠাৎ দেখলে, সেই মড়াদেঁতো ঢ্যাঙা কাফ্রিটা ও তার আরো দু'জন স্বদেশী লোক একটা মস্ত সিন্দুক ধরাধরি ক'রে বাইরে ব'য়ে নিয়ে এবং সেটাকে খুব সাবধানে ডেকের ওপরে নামিয়ে রেখে আবার কেবিনের দিকে গেল—খুব সম্ভব, অন্যান্য মোট বাইরে আনবার জন্যে।

সিন্দুকের আকার দেখে বিমলের মনে কেমন সন্দেহ হ'ল। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকটা পরখ করতে লাগল। সিন্দুকটা কাঠের। বিমল টেনে দেখলে, তালা বন্ধ। তারপর ঝুঁকে প'ড়ে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখলে, সিন্দুকের ওপরে গায়ে সর্বত্রই অগুন্তি লোম লেগে রয়েছে। মোড়কটা আবার বার ক'রে সিন্দুকের লোমের সঙ্গে মিলিয়ে সে বুঝলে, এ সবই সেই অজ্ঞাত শত্রুর গায়ের লোম। কিন্তু তার লোম এই সিন্দুকের গায়ে কেন? এই লম্বা-চওড়া সিন্দুক, এর মধ্যেই অনায়াসেই একজন মানুষের ঠাঁই হতে পারে! তবে কি······

কাফ্রিরা তখনো আসেনি। বিমল তাড়াতাড়ি নিজেদের দলের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বললে, "মাণিকবাবু, কুমার! আমি এক অপূর্ব আবিষ্কার করেচি!"

—"কি, কি?"

—"ঘটোৎকচ! ঘটোৎকচ ঐ সিন্দুকের ভেতর লুকিয়ে আছে।" মাণিকবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, "অ্যাঁ!"

—"চুপ! গোল করবেন না। চললুম আমি কাপ্তেনের কাছে,—আজ ঘটোৎকচ গ্রেপ্তার হবে।"—বিমল তীরবেগে কাপ্তেনের খোঁজে ছুট্‌ল।

মাণিকবাবু দুই চোখ কপালে তুলে বললেন, "ও বাবা! আরব্য-উপন্যাসের দৈত্য বেরিয়েছিল কলসীর ভেতর থেকে। আর আজ এই

সিন্দুকের ভেতর থেকে বেরুবে ঘটোৎকচ? এখন আমার উপায়?··· ও কুমারবাবু, আমাকে এখানে একলা ফেলে আপনিও বিমলবাবুর সঙ্গে কোথায় চললেন? ও রামহরি! তুমিও যাও যে! বাঘা, বাঘা! আরে, বাঘাও নেই! ঐ সিন্দুকে ঘটোৎকচ, আর আমি এখানে একা। যদি সে ফস্ ক'রে সিন্দুক থেকে বেরিয়ে পড়ে? ও বাবা!"—মাণিকবাবু মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়ে, ভয়ে ভয়ে তুই চোখ মুদে ফেললেন।

সাত

সিন্দুকের রহস্য

বিমল জাহাজের ডেকের ওপর খানিকক্ষণ ছুটোছুটি ক'রেও কাপ্তেনের দেখা পেলে না; তারপর খবর পেলে, কি কাজের জন্যে কাপ্তেন জাহাজের ইঞ্জিন-ঘরে গিয়েছে।

সে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল। কাপ্তেন ইঞ্জিন-ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, এমন সময়ে বিমল তাকে গিয়ে ধরলে।

বিমলকে অমন হন্ত-দন্ত হয়ে আসতে দেখে কাপ্তেন বললে, "ব্যাপার কি?"

বিমল খুব সংক্ষেপে সব কথা খুলে বললে। কাপ্তেন এক লাফ মেরে ইংরাজীতে একটা শপথ ক'রে বললে, "অ্যাঁ, বল কি? সিন্দুকের ভেতর শত্রু! সে মানুষ, না ভূত?"

বিমল বললে, "সেটা এখনি জানতে পারা যাবে। সায়েব, তোমার লোকজনদের ডাকো!" ব'লেই পিছন ফিরে কুমার আর রামহরিকে দেখে ব'লে উঠল, "একি, তোমরাও এখানে এসেচ কেন? যাও যাও, সেখানে পাহারা দাও গে! ছি ছি, তোমাদের কি বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছুই নেই?"

কুমার আর রামহরি অপ্রস্তুত হয়ে আগে-আগে ছুটল, কাপ্তেনও চেঁচিয়ে লোকজনদের ডাকতে-ডাকতে তাদের পিছনে পিছনে চলল।

কাপ্তেনের হাঁক-ডাক শুনে অনেক লোক এসে জুটল। তারপর দলে খুব ভারী হয়ে সবাই যখন যথাস্থানে গিয়ে হাজির হ'ল, তখন সিন্দুকও দেখা গেল না, কাফ্রি তিনজনও অদৃশ্য!

বিমল হতাশভাবে বললে, "ঘটোৎকচ আবার আমাদের কলা দেখালে! কুমার, রামহরি, তোমাদের বোকামিতেই এবারে সে পালাতে পারলে!"

কুমার দোষীর মতন সঙ্কুচিত-স্বরে বললে, "আমাদের দোষ আমরা মানচি। কিন্তু মাণিকবাবু কোথায় গেলেন? তিনি তো এইখানেই ছিলেন।"

বিমল বললে, "তাইতো! মাণিকবাবু কোন বিপদে পড়লেন না তো? মাণিকবাবু, মাণিকবাবু!"

ডেকের ওপরে একটা মস্ত কেঠো বা কাঠের বালতি উপুড় হয়ে প'ড়েছিল, হঠাৎ সেটা নড়ে উঠল। কাঠের বালতিকে জীবনলাভ করতে দেখে বাঘা ভয়ানক অবাক্ হয়ে গেল এবং বালতির চারিদিক সাবধানে শুঁকে চীৎকার সুরু ক'রে দিলে।

বালতির একপাশ একটু উঁচু হ'ল এবং ফাঁক দিয়ে আওয়াজ এল, "ও বিমলবাবু, আপনাদের বাঘাকে সাম্‌লান, দম বন্ধ হয়ে আমি হাঁপিয়ে মারা যেতে বসেচি যে!"

বাঘা বালতির ফাঁকে নাক ঢুকিয়ে দিয়ে ফোঁস ক'রে নিশ্বাস ফেলে বললে, "গরর্‌র্‌র্ গরর্‌র্‌র্।" ফাঁকটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

কুমার বাঘার কান ধরে টেনে আনলে, বিমল কেঠোটা টেনে তুলে ধরলে এবং ভিতর থেকে হাপরের মতন হাঁপাতে হাঁপাতে গলদঘর্ম মাণিকবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

কুমার বললে, "মাণিকবাবু, ওর মধ্যে ঢুকে কি করছিলেন?"

মাণিকবাবু গায়ের ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন, "প্রাণ বাঁচাচ্ছিলুম

মশাই, প্রাণ বাঁচাচ্ছিলুম! বাইরে থাকলে ঘটোৎকচ কি আর আমাকে ছেড়ে কথা কইত?"

কাপ্তেন-সায়েব এতক্ষণ রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে কি দেখছিল, হঠাৎ দূরবীণ নামিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "পেয়েচি পেয়েচি,—তাদের দেখা পেয়েচি!" বিমল ও কুমার একদৌড়ে কাপ্তেনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কাপ্তেন একদিকে আঙুল তুলে দেখালে, একখানা নৌকা তীরের দিকে বয়ে চলেছে, তার ওপরে মাঝিমাল্লার সঙ্গে তিনজন কাফ্রি আর সেই সিন্দুকটা রয়েছে!

কাপ্তেনের হুকুমে তখনি জাহাজের দু'খানা বোট নামিয়ে জলে ভাসানো হ'ল এবং কয়েকজন খালাসী, জাহাজী গোরার সঙ্গে কাপ্তেন, বিমল ও কুমার গিয়ে সেই বোটের উপর চ'ড়ে বসল। বোট বেগে এগুতে লাগ্‌ল।

খানিকক্ষণ পরে বিমল বললে, "ঐ সেই ঠোঁটকাটা ঢ্যাঙা কাফ্রিটা সিন্দুকের ওপরে ব'সে আমাদের পানে তাকিয়ে হাসছে। ওরা বুঝতে পেরেছে যে, আমরা ওদেরই পিছনে যাচ্ছি?"

কুমার বললে, "কিন্তু ওদের ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে না যে, আমাদের দেখে ওরা কিছু ভয় পেয়েছে!"

কাপ্তেন তার রিভলভারটা নাড়তে নাড়তে বললে, "ঐ ঢ্যাঙা কাফ্রিটাকে দেখলেই আমার রাগ হয়। ওদের অপরাধের প্রমাণ পেলে কারুকে আমি ছাড়ব না—সব পুলিশের কাছে চালান ক'রে দেব!"

জাহাজের বোট দু'খানা কাফ্রিদের নৌকার খুব কাছে গিয়ে পড়ল একটা কাফ্রি সেই মড়া-দেঁতো কাফ্রির কানের কাছে মুখ এনে কি বললে। কিন্তু মড়া-দেঁতো কোন জবাব দিলে না, বিশাল বুকের ওপরে দু'খানা বিপুল বাহু রেখে কালো ব্রোঞ্জের মূর্তির মতন স্থিরভাবে সিন্দুকের ওপরে ব'সে রইল।

বিমলের গা টিপে কুমার বললে, "বিমল, দেখ—দেখ।"

—"কি ?"

—"ঐ যে আর একখানা নৌকা যাচ্ছে, তার ওপরে তিনজন লোক, —ঠিক যেন বাঙালীর মতন দেখতে !"

বিমল অল্পক্ষণ তাদের দেখে কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঐ নৌকার লোকগুলোও কি আমাদের জাহাজে ছিল ?"

কাপ্তেন দূরবীণ ক'ষে ভালো ক'রে তাদের দেখে বললে, "হ্যাঁ, ওরাও বাঙালী।"

—"কিন্তু জাহাজে তো ওদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি !"

—"না হওয়ারই কথা। ওদের ব্যবহার কেমন যেন রহস্যময় ব'লে মনে হ'ত। ওরা কেবিনের বাইরে বড়-একটা আসত না, কারুর সঙ্গে মেলামেশা করত না। ওরা নাকি ইস্ট-আফ্রিকায় ব্যবসা করতে যাচ্ছে। ...হ্যাঁ, আর-একটা কথা মনে হচ্ছে বটে। একদিন ঐ ঢ্যাঙা কাফ্রি-শয়তানটাকে ওদের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলুম !"

বিমল মৃদুস্বরে বললে, "কুমার, আমার বিশ্বাস ঐ বাঙালী তিনজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন আমাদের মাণিকবাবুর গুণধর ছোট কাকা। মাণিকবাবু আমাদের সঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই ওকে চিনতে পারতেন।"

কুমার বললে, "আমরা কিন্তু ভবিষ্যতে ওকে দেখলে আর চিনতে পারব না—এত দূর থেকে ভালো ক'রে নজরই চলছে না। দেখ—দেখ, ওরা নৌকার বেগ বাড়িয়ে দিলে। ওরা বুঝতে পেরেছে যে, আমরা ওদের লক্ষ্য করছি।"

কিন্তু আর সেদিকে দৃষ্টি রাখবার অবকাশ ছিল না, কারণ জাহাজের বোট দু'খানা তখন কাফ্রিদের নৌকার দু'পাশে এসে পড়েছে !

কাপ্তেন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "এই ! নৌকা থামাও !"

কাফ্রিদের নৌকা থেমে গেল। কাপ্তেন, বিমল ও কুমার এক এক লাফে নৌকার উপরে গিয়ে উঠল, কাফ্রিদের কেউ কোন আপত্তি করলে না।

মড়া-দেঁতো তেমনি অটলভাবেই সিন্দুকের ওপরে ব'সে ছিল।

কাপ্তেন হুকুম দিলে, "তুমি উঠে দাঁড়াও।"

মড়া-দেঁতোর চোখ বাঘের চোখের মত জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রে উঠ্‌ল—কিন্তু পরমুহূর্তেই কাপ্তেনের হাতে চক্‌চকে রিভলভার দেখে তার জ্বল্‌জ্বলে চোখের আগুন নিবে গেল। যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই সে-সিন্দুকের ওপর থেকে উঠে দাঁড়াল।

কাপ্তেন একটানে সিন্দুকের ডালাটা খুলে ফেলে মহা-আগ্রহে তার ভিতরটা দেখতে লাগল, তারপর হতাশভাবে বিমলের দিকে মুখ ফেরালে।

বিমল হেঁট হয়ে দেখলে, সিন্দুকের ভিতরে কেউ নেই।

কাপ্তেন বললে, "কিন্তু সিন্দুকের ভিতরে এত লোম কেন? এ কিসের লোম? এর ভিতরে কি ছিল?"

মড়া-দেঁতো কোন জবাব দিলে না। মুখটা একবার খিঁচিয়ে নৌকার এক কোণে গিয়ে বসে পড়ল।

কাপ্তেন বিমলের দিকে ফিরে বললে, "তোমার মোড়কে যে লোমগুলি দেখেছিলুম, এগুলোও ঠিক সেইরকম দেখতে। এ সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক, জেব্রা, হরিণ কি বানরের গায়ের লোম নয়। তবে এ কোন্‌ জীবের লোম?"

বিমল কি জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কি ভেবে চুপ মেরে গেল।

কাপ্তেন হতাশকণ্ঠে বললে, "রহস্যের কোন কিনারা হ'ল না। এই কাফ্রি-শয়তানরা আগেই সাবধান হয়ে সিন্দুকে যে ছিল তাকে সরিয়ে ফেলেচে। চল, আর এখানে থেকে লাভ নেই!"

কুমার চারিদিকে চেয়ে দেখল, কিন্তু যে-নৌকায় তিনজন বাঙালী ছিল তাদের আর কোথাও দেখতে পেলে না।

আট

ঘটোৎকচের উৎকোচ লাভ

আফ্রিকার পূর্বদিকে, ভারত-সাগরের মধ্যে মোম্বাসা হচ্ছে একটি ছোট দ্বীপ। তার বাসিন্দার সংখ্যা চল্লিশ হাজার। হাতীর দাঁত, চামড়া ও রবারের ব্যবসার জন্যে এ দ্বীপে অনেক লোক আনাগোনা করে।

এই দ্বীপটি ইতিহাসে অনেক দিন থেকেই বিখ্যাত। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ নাবিক ভাস্কো ডা গামা এখানে এসেছিলেন। সেই সময়ে একজন আরবী, জাহাজ-সুদ্ধ তাঁকে ডুবিয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করে। ভাস্কো ডা গামা কোনগতিকে সেটা জানতে পেরে মহাখাপ্পা হয়ে মোম্বাসা শহরকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে উদ্যত হন, কিন্তু স্থানীয় সুলতান পায়ে-হাতে ধ'রে তাঁকে ঠাণ্ডা করেন। মোম্বাসার প্রধান রাজপথ—ভাস্কো ডা গামা স্ট্রীট আজও এই অমর নাবিকের স্মৃতি বহন করছে।

মোম্বাসা শহর প্রতিষ্ঠা হয় প্রায় হাজার বছর আগে। কিন্তু এ শহরটি যে আরো পুরানো, এখানে আবিষ্কৃত প্রাচীন চীন, মিশর ও পারস্য দেশের অনেক জিনিস দেখে তা বোঝা যায়। ১৫০৫ থেকে ১৭২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দ্বীপটি ছিল পর্তুগীজদের অধিকারে। আরবদের সঙ্গে পর্তুগীজদের কয়েকবার যুদ্ধবিগ্রহও হয়ে গেছে। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাস থেকে সুদীর্ঘ তিন বছর তিন মাস ধ'রে পর্তুগীজরা আরবদের দ্বারা এই দ্বীপে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। পর্তুগাল থেকে সাহায্য পাবার আশায় অবরুদ্ধ পর্তুগীজরা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু তাদের আশা সফল হয় না। আরবদের তরবারির মুখে শেষটা পর্তুগীজদের আবাল-বৃদ্ধবনিতার প্রাণ যায় এবং নিয়তির এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে, সেই হত্যাকাণ্ডের ঠিক দু'দিন পরেই পর্তুগাল থেকে সাহায্য এসে উপস্থিত হয়।

কিছুদিন পরে মোম্বাসা আবার পর্তুগীজদের হাতে যায় বটে, কিন্তু তাদের সে প্রাধান্য স্থায়ী হয় না। মোম্বাসা এখন জাঞ্জিবারের সুলতানের অধীনে। এবং দ্বীপের "যীশু কেল্লা" আজও প্রাচীন পর্তুগীজ প্রাধান্যের নিদর্শনের মত দাঁড়িয়ে আছে।

মোম্বাসা শহরটি বেশ। আফ্রিকার বিশাল বুকের ভিতর যে গভীর জঙ্গল, দুরারোহ পর্বতমালা ও বিজন মরুভূমি লুকিয়ে আছে, মোম্বাসাকে দেখলে তা মনে হয় না। এই শহরটিতে আধুনিক-সভ্যতার কোন চিহ্নেরই অভাব নেই। বাষ্পীয়-পোত, মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী, দোতলা-তেতালা বাড়ী ও বড়-বড় হোটেল সবই দেখা যায়। বাসিন্দাদের ভিতরে আরবদের সংখ্যাই বেশি হ'লেও অন্যান্য অনেক জাতীয়—এমন কি, ভারতীয় লোকের সঙ্গেও পথে-ঘাটে সাক্ষাৎ হয়। রাজপথের প্রধান গাড়ী হচ্ছে এক রকম "ট্রলি", সরু রেল-লাইনের উপর দিয়ে আনাগোনা করে এবং তাকে ঠেলে নিয়ে যায় সোয়াহিলি জাতের দু'জন ক'রে কুলি।

শহরের বাইরেই সুন্দর সবুজ বন। সে বনে বাওবাব্ (আর এক নাম, বাঁদুরে-রুটি-গাছ), কলা, আম, খেজুর ও নারিকেল প্রভৃতি নানা গাছ চোখে পড়ে। মাঝে-মাঝে ছোট ছোট পাহাড়। উজ্জ্বল রোদের সোনার জল দিয়ে ধোয়া মোম্বাসা নগরী যখন নিস্তরঙ্গ ভারত-সাগরের স্থির নীলদর্পণে নিজেই নিজের ছায়া দেখতে পায়, তখন তার কী শোভাই যে হয় তা আর বলবার নয়।

হোটেলের বারান্দায় ব'সে বিমল, কুমার ও মাণিকবাবু চুপি-চুপি কথা কইছিলেন। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রামহরি চা তৈরী করছে এবং তার সামনে ব'সে বাঘা মুখ উঁচু ক'রে ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়ছে—একটু আধটু চিনি বা দু-এক টুক্‌রো রুটি বকশিস পাবার লোভে।

মাণিকবাবু বললেন, "তাহ'লে এখান থেকে আমাদের যেতে হবে উজিজিতে ?"

কুমার বললে, "হুঁ", বুড়ো সর্দার গাটুলার খোঁজে।"

—"যদি সে ম'রে গিয়ে থাকে, কি তার দেখা না পাই, তা'হলে আমরা কি করব ?"

বিমল বললে, "সে কথা নিয়ে এখনো মাথা ঘামাইনি······আচ্ছা কুমার, আমার সঙ্গে যাবার জন্যে তুমি কত লোক ঠিক করেছ ?"

—"ঠিক একশো চব্বিশ জন।"

—"তাদের জন্যে মাসে কত খরচ পড়বে ?"

—"প্রায় সাতশো টাকা।"

—"আস্কারি নিয়েছ ক'জন ?"

—"চব্বিশ জন।"

মাণিকবাবু সুধোলেন, "আস্কারি কি ?"

—"সশস্ত্র কুলি।"

—"ও বাবা ! অত অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে কি হবে ? আমাদের যুদ্ধ করতে হবে নাকি ?"

বিমল গম্ভীর ভাবে বললে, "হ'তে পারে।"

রামহরি চা দিয়ে গেল। সকলে নীরবে চা পান করতে লাগল।

কুমার বললে, "আচ্ছা বিমল, মাণিকবাবুর মেজো কাকা যে ম্যাপ দিয়েছেন, সেখানা তুমি কোথায় রেখেছ ?"

বিমল অকারণে কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বললে, "ম্যাপখানা আমার কোটের ভিতরকার পকেটে আছে ?"

কুমার বললে, "আঃ, অত চেঁচিয়ে কথা কইচ কেন, কেউ যদি শুনতে পায় !"

বিমল খুব নীচু গলায় হাসতে-হাসতে বললে, "শুনতে পায় কি, শুনতে পেয়েছে !"

—"তার মানে ?"

—"আমাদের পিছনে ঐ যে থামটা রয়েছে, ওর আড়ালে দাঁড়িয়ে একজন লোক এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিল।"

সভয়ে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বিমলের কাছে স'রে এসে মাণিকবাবু

বললেন, "ও বাবা। বলেন কি মশাই? আপনি কি ক'রে জানলেন?"

—"আমার সামনে টেবিলের ওপরে এই যে কামরার আরশিখানা আছে, এর ভেতর দিয়েই সেই লোকটার ওপরে আমি নজর রেখেছিলুম!"

—"কে সে?"

—"বোধ হয় সে বাঙালী!"

—"অ্যাঁ! বাঙালী!"

—"হ্যাঁ। ঐ দেখুন মাণিকবাবু, হোটেল থেকে বেরিয়ে সে রাস্তায় গিয়ে পড়েচে!" বলেই বিমল পকেট থেকে একটা ছোট দূরবীণ বার ক'রে লোকটাকে দেখতে লাগল।

মাণিকবাবু হঠাৎ একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে, বারান্দার ধারে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, "ছোটকাকা! অ ছোটকাকা! ছোটকাকা!"

লোকটা যেন শুনতেই পেলে না, আপন মনে এগিয়ে গিয়ে একখানা চলন্ত ট্রলি গাড়ীতে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল!

চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে বিমল ধীরে-ধীরে বললে, "উনিই আপনার ছোট কাকা? ওঁরই নাম মাখনবাবু?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু কি আশ্চর্য! আমি এত চেঁচিয়ে ডাকলুম, তবু উনি শুনতে পেলেন না।"

—"মাখনবাবু আপনার ডাক শুনতে রাজি নন।"

—"রাজি নন! কেন?"

—"কেন? তাও বুঝতে পারচেন না? উনিই যে ঘটোৎকচের প্রভু!"

অতিরিক্ত বিস্ময়ে মাণিকবাবু অবাক হয়ে বিমলের মুখের দিকে মূঢ়ের মতন তাকিয়ে রইলেন।

বিমল দুলতে-দুলতে বললে, "আমার মনের ক্যামেরায় আমি মাখনবাবুর ফটোগ্রাফ তুলে নিয়েচি। ওর মুখ আর ভুলব না।"

কুমার বললে, "বিমল, মাখনবাবু টের পেয়েছেন, ম্যাপখানা কোথায় আছে। ম্যাপখানা তুমি অন্য কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখো।"

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বিমল ফিরে বললে, "রামহরি,

আজ রাত্রে তুমি বাঘাকে ঘরের ভেতর থেকে বার ক'রে দিও।"

অনেক রাত্রে বিমলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের ভিতরে খুস্-খুস্ ক'রে শব্দ হচ্ছে—যেন কে আস্তে-আস্তে চ'লে বেড়াচ্ছে।

বিমলের মনে হ'ল যেন তার মুখের উপরে কার গরম নিঃশ্বাস এসে পড়ল। সে অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইল, রিভলভারটা জোরে চেপে ধ'রে।

পায়ের দিকে একটা খোলা জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। আকাশের বুকে চাঁদের মুখ নেই,—খালি হাজার-হাজার তারা মিট্‌মিট্ ক'রে জ্বলছে, স্থির জোনাকির মতন।

হঠাৎ জানলার আকাশ অদৃশ্য হয়ে গেল—একটা চলন্ত অন্ধকার এগিয়ে এসে যেন জানলার ফাঁকাটা একেবারে বুজিয়ে দিলে।

আচম্বিতে অন্ধকার অদৃশ্য হ'ল এবং তারা-ভরা আকাশ আবার দেখা যেতে লাগল।

বিমলও শান্ত ভাবে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল বেলায় চোখ মেলেই কুমার দেখলে, বিমল একটা জানলার কাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

কুমার বললে, "ওখানে কি করচ?"

—"ঘটোৎকচ কোন স্মরণ-চিহ্ন রেখে গেছে কিনা দেখচি।"

কুমার ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে বললে, "তার মানে?"

—"এই জানলার গরাদ ভেঙ্গে কাল রাতে ঘটোৎকচ ঘরের ভেতরে এসেছিল।"

—"ম্যাপ, ম্যাপ—তোমার পকেটে ম্যাপখানা আছে তো?"

—"না।"

—"সর্বনাশ!"

—"ঘটোৎকচ ম্যাপখানা নিয়ে লম্বা দিয়েছে। আমার হাতে রিভলভার ছিল, ইচ্ছা করলেই আমি তাকে গুলি করতে পারতুম, কিন্তু আমি তা করিনি। আমি তাকে পালাতে দিয়েছি।"

—"বিমল, তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে?"

—"শোনো, ম্যাপখানা কোথায় আছে, সে খোঁজ কাল বৈকালে আমি তো শত্রুপক্ষকে দিয়েছিলুম! শত্রু যে আসবে সেটা তো আমি আগে থাকতেই জানতুম! ধরতে গেলে, ঘটোৎকচকে আমি একরকম নিমন্ত্রণ করেই এখানে আনিয়েছিলুম। বাঘাকে পর্যন্ত ঘরের ভেতরে রাখিনি, পাছে সে ঘটোৎকচকে পছন্দ না করে।"

—"বিমল, তোমার কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না!"

বিমল জানলার কাছ থেকে স'রে এসে বললে, "কুমার, ঘটোৎকচ যে ম্যাপখানা নিয়ে গেছে, সেখানা হচ্ছে নকল। আসল ম্যাপ আমার কাছে!"

কুমার আনন্দে এক লাফ মেরে ব'লে উঠল, "ওহো বুঝেছি—বুঝেছি!"

বিমল বললে, "ঐ নকল ম্যাপ দেখে যে গুপ্তধন আনতে যাবে তাকে ভুল পথে ঘুরে-ঘুরে মরতে হবে। নকল ম্যাপখানা অনেক কষ্টে আমি তৈরি করেছি।"

নয়

ভীষণ অরণ্যে

আসল পথ-চলা শুরু হয়েছে। সকলে দল বেঁধে চলেছে—কখনো বনের ভিতরে, কখনো পাহাড়ের কোলে, কখনো নদীর ধারে, কখনো মাঠের উপরে! মাঝে মাঝে এক-একখানা নোংরা গ্রাম, তার কুঁড়েঘরগুলো যেমন নড়বড়ে আর ভাঙাচোরা, তার বাসিন্দারাও তেমনি গরীব

ও শ্রীহীন। মাঝে মাঝে ধান ও আখ প্রভৃতির ক্ষেতও চোখে পড়ে। অনেক জায়গা দেখেই ভারতবর্ষকে মনে পড়ে।

পথে যেতে-যেতে কতরকম জানোয়ারই দেখা যায়! কোথাও উট-পাখীর দল ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা পা ফেলে ছুটোছুটি করছে, কোথাও একদল জেব্রা মানুষ দেখেই দৌড় দিচ্ছে, কোথাও বেঢপ জিরাফ তার অদ্ভুত গলা বাড়িয়ে গাছের আগডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে, তারপর মানুষের সাড়া পেয়েই ছুটে পালাচ্ছে!...এই জিরাফদের ছুটে পালাবার ভঙ্গি এমন বেয়াড়া যে, দেখলে গোম্‌ড়া-মুখো প্যাঁচারা পর্যন্ত না হেসে থাকতে পারবে না। এখানে গাছের উপর ব'সে বেবুন-বাঁদরের দল মানুষকে মুখ ভ্যাংচায়, নদীর জলে হিপোপটেমাসের দল সাঁতার কাটে ও বড় বড় কুমির কিলবিল করে এবং মানুষের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে যেন বলতে চায়—"তোমরা দয়া ক'রে একবার জলে নামো, আমাদের বড্ড খিদে পেয়েছে।" এখানে পায়ের তলায় ঘাসের ভিতর থেকে সাপ ফোঁস ক'রে ওঠে, রাত্রিবেলায় চারিদিকে হায়নারা হা-হা ক'রে হাসে, চিতেবাঘেরা তাঁবুর ভিতরেও বেড়াতে আসে এবং সিংহের দল কাছ ও দূর থেকে মেঘের ডাকের মতন এমন গম্ভীর গর্জন করে যে, অন্ধকার অরণ্য যেন শিউরে ওঠে এবং পৃথিবীর মাটি যেন থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে থাকে!

মাণিকবাবুর অশান্তির আর সীমা নেই। তাঁর মতে এখানকার প্রত্যেক ঝোপই হচ্ছে কোন-না-কোন ভয়ঙ্কর জানোয়ারের বৈঠকখানা এবং প্রত্যেক গাছই হচ্ছে ভূত-প্রেতের আড্ডা! সন্ধ্যা হ'লেই তিনি রাম-নাম জপ করতে আরম্ভ করেন এবং পাছে কোন বদমেজাজী জন্তুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়, সেই ভয়ে তাঁবুর ভিতর থেকে একবারও বাইরে উঁকি মারেন না।

মাঝে মাঝে কাতরমুখে বলেন, "বিমলবাবু, আমি তো আপনাদের কাছে কোন দোষই করিনি, তবে দেশ থেকে এখানে টেনে এনে কেন আপনারা আমাকে অপঘাতে মারতে চান?"

বিমল বললে, "মাণিকবাবু, জানেন তো, কাপুরুষ মরে দিনে একশো বার ক'রে, কিন্তু সাহসী মরে জীবনে একবার মাত্র!"

মাণিকবাবু বললেন, "সাহসেরও একটা সীমা আছে তো? মরণকে যখন সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে অষ্টপ্রহর দেখতে পাচ্ছি তখন ভয় না পেয়ে কি করি বলুন তো?"

—"মরণকে নিয়ে খেলা করুন, মরণকে দেখলে তাহ'লে আর ভয় পাবেন না।"

—"পাগলের সঙ্গে কথা ক'য়েও লাভ নেই," এই বলে মাণিকবাবু মুখভার ক'রে সেখান থেকে চ'লে যান।

সেদিন বনের ভিতর দিয়ে চলতে-চলতে হঠাৎ একটা কাফ্রিজাতীয় স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেল। তার দেহের নিচের অংশ নেই, উপর অংশও ভীষণরূপে ক্ষতবিক্ষত এবং তার মরা চোখদুটো ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে আকাশের পানে তাকিয়ে আছে!

সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখেই মাণিকবাবু 'আঁ' বলে আঁৎকে উঠে উন্মত্তের মতন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বনের ভিতরে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

কুমার মৃতদেহের দিকে চেয়ে বললে, "সিংহের কীর্তি!"

বিমল বললে, "হুঁ। সিংহটা বোধহয় আমাদের সাড়া পেয়ে শিকার ছেড়ে বনের ভেতর গিয়ে লুকিয়েছে।"

রামহরি বললে, "কিন্তু মাণিকবাবু যে ঐ বনের ভেতরেই গিয়ে ঢুকলেন!"

—"ওঁকে ডেকে নিয়ে এস রামহরি, নইলে বিপদ—"

বিমলের মুখের কথা শেষ হবার আগেই শোনা গেল, বনের ভিতর থেকে মাণিকবাবু চীৎকার ক'রে বলছেন, "গেলুম, গেলুম,—বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।"

বিমল, কুমার, রামহরি ও 'আস্কারি' বা সশস্ত্র কুলির দল তখনি বনের ভিতরে ছুটে গেল এবং খানিক পরেই যে দৃশ্য দেখা গেল তা হচ্ছে এই: —মাণিকবাবু একটা গাছের মাঝ-বরাবর উঠে প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছেন এবং

ঠিক তাঁর মাথার উপরকার ডালে ব'সে একটা মস্ত-বড় বেবুন বাঁদর মুখ খিঁচিয়ে তাঁকে ক্রমাগত ধমক দিচ্ছে এবং নিচে দাঁড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড গণ্ডার গাছের গুঁড়ির উপরে বারবার খড়্গাঘাত করছে। মাণিকবাবুর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—তিনি না পারছেন উপরে উঠতে, না পারছেন নিচেয় নামতে !

একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুকের গুলি খেয়ে গণ্ডারটা তখনি মাটির উপরে প'ড়ে গেল এবং বেবুনটাও একলাফে অন্য গাছে গিয়ে প্রাণ বাঁচালে। তারপর সকলে মিলে মাণিকবাবুকে প্রায় মরো-মরো অবস্থায় গাছের উপর থেকে নামিয়ে আনলে।

এবং সেই রাত্রেই আর-এক ব্যাপার ! সেদিন আহারের ব্যবস্থা ছিল কিছু গুরুতর। কুমার মেরেছিল ছুটো বুনো হাঁস এবং বিমল মেরেছিল একটা হরিণ। কাজেই সারাদিনই আজ রামহরির হাতজোড়া। কি আমিষ আর কি নিরামিষ রন্ধনে সে ছিল অদ্বিতীয় এবং যত বেশি রান্নাবান্নায় সময় পাওয়া যেত, সে হ'ত তত বেশি খুশি।

রাত্রিবেলায় রামহরি এসে যখন সুধোলে, "খোকাবাবু, খাবার দেব কি ?" বিমল তখন জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার আজকের রান্নার ফর্দটা কি শুনি ?"

রামহরি বললে, "চপ্, কাট্লেট, কোপ্তা, রোষ্ট্, আলু-মাকাল্লা আর লুচি ! একটা চাট্নিও আছে।"

কুমার খুশি হয়ে হাততালি দিয়ে বললে, "রামহরি, তুমি অমর হও ! তোমার দয়ায় আমরা বনবাস করতে এসেও স্বর্গ খুঁজে পেয়েছি !"

মাণিকবাবুর জিভ দিয়ে জল গড়াতে লাগল ! লম্বা একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "আহা, রামহরি, কি মধুর কথাই শোনালে ! আজ দিনের বেলাটায় বেবুনের মুখ-খিঁচুনি আর গণ্ডারের তাড়া খেয়ে প্রায় মরো-মরো হয়ে আছি, এখন দেখা যাক্, রাতের বেলায় তোমার হাতের অমৃত খেয়ে আবার ভালো ক'রে চাঙ্গা হ'য়ে উঠতে পারি কি না।"

বিমল বললে, "রক্ষে করুন মাণিকবাবু, আপনি আরো ভালো ক'রে

চাঙ্গা আর হবেন না। আফ্রিকায় এসে আপনার ভুঁড়ির বহর দুগুণ বেড়ে গিয়েছে, সেটা লক্ষ্য করেছেন কি?"

মাণিকবাবু মুখ ভার ক'রে বললেন, "আপনারা যখন-তখন আমার ভুঁড়ির ওপরে নজর দেন। এটা আমি পছন্দ করি না।"

বিমল হেসে বললে, "কিন্তু আপনার ভুঁড়ি যদি এইভাবে বাড়তেই থাকে, তাহ'লে আফ্রিকার প্রত্যেক সিংহের নজর আপনার ওপরে পড়বে, সেটা আপনি দেখছেন কি?"

মাণিকবাবু চম্‌কে উঠে বললেন, "ও বাবা, বলেন কি?"

—"হ্যাঁ। মানুষরা যখন মোটা পাঁঠা খোঁজে, তখন সিংহরাও নধর চেহারার মানুষ খুঁজবে না কেন?"

মাণিকবাবু ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বললেন, "খাওয়ার কথা শুনে আমার মনে যে আনন্দ হয়েছিল, আপনার কথা শুনে সে আনন্দ কর্পূরের মতন উবে গেল···বিমলবাবু, আফ্রিকায় আমাদের আরো কতদিন থাকতে হবে?"

বিমল বললে, "এই তো সবে কলির সন্ধ্যে। আপাততঃ আমরা যেখানে আছি, এ-জায়গাটার নাম হচ্ছে, ট্যাবোরা। এখান থেকে উজিজি আরো কিছুদিনের পথ। পথের বিপদ এড়িয়ে আগে উজিজিতে গিয়ে পৌঁছোই, তারপর অন্য কথা। আমাদের আসল 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' শুরু হবে উজিজি থেকেই।"

—"আসল 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' মানে তো আসল বিপদ? অর্থাৎ আপনি বলতে চান তো, যে, উজিজিতে গিয়ে পৌঁছোবার পরে প্রতি ক্ষণেই আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে?"

—"হ্যাঁ!"

—"কেন? ঘটোৎকচ তো আর আমাদের পিছনে নেই!"

কুমার বললে, "এখন নেই বটে, কিন্তু দুদিন পরে নিজের ভ্রম বুঝতে পারলেই আবার সে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে আসবে।"

মাণিকবাবুর মুখের ভাব যেরকম হ'ল, সেটা আর বর্ণনা না করাই ভালো।

আচম্‌কা কুমারের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের ঘোর কাটবার আগেই সে বেশ বুঝতে পারলে, তার মুখের উপরে কার উত্তপ্ত শ্বাস পড়ছে। সে শ্বাসে কি দুর্গন্ধ!

খুব সন্তর্পণে আড়-চোখে চেয়ে দেখলে, অন্ধকার তাঁবুর ভিতরে কার দুটো বড়-বড় চোখ দপ্‌ দপ্‌ ক'রে জ্বলছে।

উত্তপ্ত নিঃশ্বাসটা তার মুখের উপর থেকে স'রে গেল।

কুমার অত্যন্ত আড়ষ্ট হ'য়ে শুয়ে রইল—কারণ, একটু নড়লেই মৃত্যু নিশ্চয়। জ্বলন্ত চোখ দুটো যে তার পানেই তাকিয়ে আছে, এটাও সে বেশ বুঝতে পারলে।

বাইরে বনভূমি তখন ঘন-ঘন সিংহের গর্জনে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। চারিদিক থেকে আরো যে কতরকম চীৎকার শোনা যাচ্ছে তা বলবার নয়। মানুষেরা ঘুমোচ্ছে, কিন্তু তাদের শত্রুরা এখন জাগরিত।

এ তাঁবুর ভিতরে বিমল আর মাণিকবাবুও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন,—কিন্তু এখন কারুকে সাবধান করবারও সময় নেই।

তাঁবুর ভিতরে এই অসময়ে কার আবির্ভাব হ'ল? এ মানুষ না কোন হিংস্র জন্তু?

এ ঘটোৎকচ নয় তো? সে কি এখনি তার ভ্রম বুঝতে পেরেছে?

কিছুই বুঝবার উপায় নেই। যে-শত্রু তাদের গ্রাস করতে এসেছে অন্ধকার তাকে গ্রাস করেছে। কেবল দুটো প্রদীপ্ত চক্ষু এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে আর আসছে,—যাচ্ছে আর আসছে। সে যেন অন্ধকারের চক্ষু। মায়াহীন উপবাসী চক্ষু, তারা যেন বিশ্বকে পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দিতে চায়!

আচম্বিতে কি একটা শব্দ হ'ল। একটা কি ভারী জিনিস পড়ার শব্দ......

কুমার আর থাকতে পারলে না, এক লাফে উঠে ব'সে, পাশ থেকে বন্দুকটা তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "বিমল, বিমল!"

সঙ্গে সঙ্গে বিমলের গলা পাওয়া গেল—"কি হয়েছে কুমার, কি হয়েছে ?"

—"ঘরের ভেতরে কে এসেছে ?"

পরমুহূর্তে বিমলের 'টর্চ' জ্বলে উঠল। কিন্তু কৈ, ঘরের ভেতরে তো কেউ নেই !

বিমল বললে, "এ কি ! মাণিকবাবু কোথায় গেলেন ?"

কুমার বিস্মিত চক্ষে দেখলো, তাঁবুর ভিতরে মাণিকবাবুও নেই, তাঁর বিছানাও নেই !

দশ

গভীরতর অরণ্য

বিছানা থেকে লাফিয়ে প'ড়ে বিমল চেঁচিয়ে ডাক দিলে, "মাণিক-বাবু ! মাণিকবাবু !"

মাণিকবাবুর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

কুমার বললে, "মাণিকবাবু তো এই রাত্রে একলা বাইরে বেরুবার পাত্র নন।"

—"তুমি না বললে, ঘরের ভেতরে কে ঢুকেছিল ?"

—"হাঁা।"

—"কে সে ? মানুষ না জন্তু ?"

—"জানি না।"

—"দেখ, মাণিকবাবুর বিছানায় তাঁর লেপখানাও নেই। লেপ মুড়ি দিয়ে কেউ বাইরে বেরোয় না ! লেপসুদ্ধ নিশ্চয় কেউ তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেছে !"

—"কে তাঁকে ধ'রে নিয়ে যাবে ? কোন জন্তু ?"

—"ঘটোৎকচ যে আসেনি, তাই-বা কে বলতে পারে?"

বাহির থেকে কে কাতর-কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে বাবা রে, মেরে ফেল্‌লে রে!"

—"ঐ মাণিকবাবুর গলা! এস কুমার, আমার সঙ্গে এস!" বলতে বলতে বিমল নিজের বন্দুকটা তুলে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

সে-রাত্রে আকাশ থেকে চাঁদ আলোর ধারা ঢালছিল বটে, কিন্তু সে-আলো যেন আরো বেশি ক'রে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছিল নিবিড় অরণ্যের ভীষণ বিজনতাকে!

গাছের পর গাছ পরস্পরকে জড়াজড়ি ক'রে যেন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কেঁপে-কেঁপে শিউরে-শিউরে উঠছে—তারা এইমাত্র কি একটা ভয়ানক কাণ্ড দেখতে পেয়েছে!

বন এত ঘন যে, চাঁদের আলোতেও তার ভিতরে নজর চলে না।

বনের বাইরেই একটুখানি পথের রেখা, তারপরেই ছোট একটি মাঠ। সেইখানেই আজ তাঁবু খাটানো হয়েছে।

এদিকে-ওদিকে চারিদিকে তাকিয়েও বিমল ও কুমার কোন জীবজন্তু বা মাণিকবাবুকে আবিষ্কার করতে পারলে না।

—"মাণিকবাবু! মাণিকবাবু!"

দূর থেকে সাড়া দিলে কেবল প্রতিধ্বনি। তারপরেই আরো অনেক দূর থেকে অনেকগুলো সিংহ একসঙ্গে ঘন-ঘন গর্জন করতে লাগল! কি-একটা অজানা জানোয়ারের মৃত্যু-আর্তনাদ শোনা গেল। একদল শেয়াল চেঁচিয়ে জানতে চাইলে—কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া?

কুমার কাতরভাবে বললে, "মাণিকবাবু বোধহয় আর বেঁচে নেই।"

বিমল কান পেতে কি শুনছিল। সে বললে, "মাণিকবাবু বেঁচে আছেন কিনা জানি না, কিন্তু যে-শত্রু আজ আমাদের তাঁবুতে এসেছিল, বোধহয় ঐখানটা দিয়ে সে বনের ভেতরে ঢুকেছে"—ব'লে সে বনের একজায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে দেখাল।

কুমার বললে, "কি করে জান্‌লে তুমি?"

—"শুনছ না, ঐখানটার গাছের ওপরে পাখী আর বাঁদররা কিচির-মিচির করছে? যেন কোন অস্বাভাবিক কাণ্ড দেখে ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, আর ঘুমোতে পারছে না।"

—"তা'হলে এখন আমাদের কি করা উচিত?"

—"এখনি ঐ বনের ভিতর ঢুকব।"

—"লোকজনদের ডাকব না?"

—"সে সময় কোথায়?" বলেই বন্দুকটা বগলদাবা ক'রে বিমল অগ্রসর হ'ল।

—"ঠিক বলেছ" ব'লে কুমারও তার পিছন ধরল।

ভীষণ বন! ভালো ক'রে ভিতরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই কাঁটা-ঝোপের আক্রমণে বিমলের ও কুমারের কাপড়-জামা গেল ছিন্নভিন্ন হয়ে, সর্বাঙ্গ গেল ক্ষতবিক্ষত হয়ে। এমন অসময়ে, এই দুর্গম অরণ্যে মানুষকে ঢুকতে দেখে বিস্মিত বানর ও পাখীর দল আরো জোরে কলরব ক'রে উঠল।

কুমার বললে, "বিমল, এদিক দিয়ে আর এগুবার চেষ্টা করা বৃথা। এখান দিয়ে কোন জীব যেতে পারে না—আমাদের শত্রু নিশ্চয় এ পথ দিয়ে যায় নি।"

'টর্চে'র আলো একটা ঝোপের উপর ফেলে বিমল বললে, "দেখ।"

কুমার সবিস্ময়ে দেখলে, একটা কাঁটাগাছে সাদা একখানা কাপড় ঝুলছে। সে বললে, "কি ও?"

—"মাণিকবাবুর বিছানার চাদর। এখন বুঝছ তো, শত্রু কোন্ পথে গেছে?"

বিমল চাদরখানা নেড়েচেড়ে ভালো ক'রে দেখে বললে, "এখন পর্যন্ত মাণিকবাবু যে আহত হয়েছেন, এমন কোন প্রমাণ পেলুম না। কুমার, দেখ, চাদরে রক্তের দাগ নেই।"

কুমার বললে, "ভগবান তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন। নইলে তাঁর জন্যে দায়ী হব আমরাই। কারণ, আমরাই তাঁকে জোর ক'রে এই বিপদের ভেতরে টেনে এনেছি। আহা, বেচারা···"

"শুধু বেচারা নয়, গো-বেচারা। এইরকম সব গো-বেচারা সন্তান প্রসব করেছেন ব'লেই বাংলা-মায়ের আজ এমন দশা। আমাদের বঙ্গ-জননীকে ব্যাঘ্রবাহিনী ব'লে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু কোথায় সে ব্যাঘ্র?"

কুমার বললে, "আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বন্দী হয়ে হালুম-হুলুম করছে।"

বিমল বললে, "কিন্তু যেদিন খাঁচা ভেঙে বেরুবে, মায়ের ভক্ত এই গো-বেচারার দল কি করবে?"

সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কুমার বললে, "বিমল, দেখ—দেখ!"

কুমারের 'টর্চে'র আলো একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় গিয়ে পড়েছে। সেখানে প'ড়ে আছে একটা চিতাবাঘের দেহকে জড়িয়ে ধ'রে মস্ত-বড় একটা অজগর সাপ। অজগরের সর্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন। বাঘ আর সাপ কেউ নড়ছে না।

বিমল খুব সাবধানে কয় পা এগিয়ে গিয়ে বললে, "হুঁ, ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। সর্পরাজ ভুল শিকার ধরেছিল। যদিও তার আলিঙ্গনে প'ড়ে ব্যাঘ্রমশাইকে স্বর্গ দেখতে হয়েছে, তবু চোখ বোজবার আগে আঁচ্‌ড়ে-কাম্‌ড়ে আদর ক'রে সর্পরাজকেও সঙ্গে টেনে নিয়ে গিয়েছে।"

বিমল বন্দুকের নল্‌চে দিয়ে সাপ আর বাঘের দেহকে দু-চারবার নাড়া দিল। তারা ম'রে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে আছে।

একটু তফাতে ঝোপের ভিতর থেকে তিন-চারটে হায়নার মাথা দেখা গেল।

কুমার বললে, "চল বিমল, হায়নার দল আসন্ন ভোজের আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমাদের দেখে ওরা এদিকে আসছে না—ওকি বিমল, তোমার মুখ হঠাৎ ওরকম ধারা হয়ে গেল কেন?" বিমল যে-দিকে তাকিয়েছিল, সেই দিকে তাকিয়ে কুমারও যা দেখলে, তাতে তার গায়ের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে গেল!

সাম্‌নের ঝোপের ভিতরে প্রকাণ্ড একখানা কালো মুখ জেগে উঠেছে! সে মুখ মানুষের মতন বটে, কিন্তু মানুষের মুখ নয়!

ঠিক তার পাশের ঝোপ দুলে উঠল এবং সেখানেও দেখা দিলে আর-একখানা তেমনি কালো, কুৎসিত, নিষ্ঠুর,—মানুষের মতন, অথচ অমানুষিক ভীষণ মুখ !

আর-একটা ঝোপ দুলিয়ে আবার আর-একখানা ভয়ঙ্কর মুখ বাইরে বেরিয়ে এল !

তার পরেই একটা গাছের উপর থেকে দুম্ দুম্ দুম্ ক'রে মাটি কাঁপিয়ে আবির্ভূত হ'ল দানবের মতন মস্ত আরো চার-পাঁচটা মূর্তি !

কুমার শুক্‌নো গলায় অস্ফুট স্বরে বললে, "বিমল, আর রক্ষে নেই —আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত !"

বিমল কিছু বললে না, তার মুখ স্থির। প্রথম যে-মূর্তিটা মুখ বাড়িয়েছিল, ঝোপের আড়াল থেকে ধীরে-ধীরে সে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

বিমল বললে, "কুমার, এরা আমাদের আক্রমণ করবে। এরা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি বলিষ্ঠ,—বনের হিংস্র জন্তুরা পর্যন্ত ভয়ে এদের ছায়া মাড়ায় না। এরা কি জীব, তা জানো তো ?"

—"হুঁ, গরিলা।"

—"তাহলে মরবার জন্যে প্রস্তুত হও।"

এগারো

শৃঙ্গী হস্তী

বিমল এমন শান্তস্বরে বললে যে, "তাহলে মরবার জন্যে প্রস্তুত হও"—কুমার সমস্ত বিপদের কথা ভুলে তার মুখের পানে আর-একবার না তাকিয়ে থাকতে পারলে না। অবশ্য এ অভিজ্ঞতাও তার পক্ষে নূতন নয়। কারণ, কুমার বরাবরই দেখে এসেছে, বিপদ যত গুরুতর হয়, বিমলের মাথাও হয়ে ওঠে তত বেশি শান্ত। বিপদকে সে খুব সহজ ভাবেই

গ্রহণ করত ব'লে তার বিরুদ্ধে অটল পদে দাঁড়িয়ে শেষপর্যন্ত যুঝতেও পারত।

কুমারের কাছেও বিপদ অপরিচিত নয়। আসামের জঙ্গলে যখের ধন আনতে গিয়ে, মঙ্গলগ্রহের বামনদের হাতে বন্দী হয়ে, এবং ময়নামতীর মায়াকাননে পথ হারিয়ে যতরকম মহাবিপদ থাকতে পারে, সে সমস্তেরই সঙ্গে তাকে পরিচিত হ'তে হয়েছে, সুতরাং আজকের এই মস্ত বিপদ দেখেও কুমারের মনের ভাব যেরকম হ'ল, তা কাপুরুষের মনের ভাব নয়।

এত দেশ বেড়িয়েও বিমল ও কুমার আজ পর্যন্ত স্বচক্ষে জ্যান্ত গরিলা দেখেনি। আজ তাদের প্রথম দেখে তারা বুঝতে পারলে যে, পশুরাজ সিংহ পর্যন্ত গরিলা দেখে কেন মানে-মানে পথ ছেড়ে দেয়। এরা যেন শক্তি সাহস ভীষণতা ও নিষ্ঠুরতার জীবন্ত মূর্তি। তাদের হিংস্র চক্ষু, দাঁতওয়ালা মুখ আর মস্ত বুকের পাটা দেখলে প্রাণমন আঁৎকে ওঠে। আকারে তারা অন্য-সব জীবের চেয়ে মানুষেরই কাছাকাছি আসে বটে, কিন্তু তবু তাদের চেহারার সঙ্গে স্যাণ্ডোর মতন কোন মহাবলবান মানুষেরও তুলনা হয় না। তাদের হাতের এক চড় খেলে স্যাণ্ডোর কাঁধ থেকেও মাথা বোধ হয় উড়ে যেত।

সর্বপ্রথমে যে গরিলাটা ছিল, সেই-ই বোধহয় দলের সর্দার। হঠাৎ সে দু-হাতে বুক চাপ্‌ড়ে গর্জন ক'রে উঠল।

বিমল বললে, "বন্দুক ছোঁড়ো কুমার! ওরা এইবারে আমাদের আক্রমণ করবে। ওরা বেশি কাছে এলে আমরা আর কিছুই করতে পারব না।"

বিমলের কথাই ঠিক। সর্দারের সঙ্গে-সঙ্গেই অন্যান্য গরিলাগুলোও দুই হাতে বুক চাপ্‌ড়াতে-চাপ্‌ড়াতে ও গজ্‌রাতে-গজ্‌রাতে অগ্রসর হ'তে লাগল।

প্রায় একসঙ্গেই বিমল ও কুমারের বন্দুক সশব্দে অগ্নি উদ্গার করলে। সর্দার-গরিলার গায়ে বোধহয় গুলি লাগল। চীৎকার ক'রে ব'সে পড়েই সে আবার উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু উপরি-উপরি দু-দুটো বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গেই আর-

এক কাণ্ড। বিমল ও কুমারের পিছন দিকের বাম পাশের বনের ভিতর থেকে আচম্বিতে যেন একদল দানব ঘুম থেকে জেগে উঠল! তারপর সে কী মাতামাতি আর দাপাদাপির শব্দ! মাটি কাঁপতে লাগল থর্‌থর্‌ ক'রে, তিন-চারটে গাছ ভেঙে পড়ল মড়্‌-মড়্‌ ক'রে। কারা যেন দ্রুতপদে ধেয়ে আসছে!

গরিলাগুলো এক মুহূর্তের মধ্যে কে যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, তার আর কোনই পাত্তা পাওয়া গেল না!

ছুটো সিংহ কোথা থেকে বেরিয়ে বিদ্যুতের মতন আর-এক দিকে দৌড়ে গেল—বিমল ও কুমারের পানে ফিরেও তাকালে না!

কুমার সবিস্ময়ে বললে, 'ওরা কারা আসছে,—ওদের দেখে গরিলারা আর সিংহেরাও ভয়ে পালিয়ে গেল?"

কুমারকে টেনে নিয়ে বিমল একটা ঝোপের ভিতরে ঢুকে গুড়ি মেরে ব'সে পড়ল!

তারপর বনের ভিতর থেকে বেরুল, একে-একে বারো-তেরোটা চলন্ত পাহাড়ের মতন মূর্তি,—চারিদিকে ধুলো ও শব্দে ঝড় বহিয়ে তারা বেগে আর-একটা জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল!

বিমল বললে, "হাতির দল। আমাদের বন্দুকের আওয়াজে ভয় পেয়েছে।

কুমার বললে, "হাতি! হাতির মাথায় কি শিং থাকে?"

বিমল বললে, "কুমার, অন্তত তোমার আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। আর কোন মানুষেরা চোখে যা দেখেনি, ময়নামতীর মায়াকাননে গিয়ে সেই-সব অদ্ভুত জীবও তুমি তো দেখে এসেছো?"

কুমার বললে, "ময়নামতীর মায়াকানন হচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিছাড়া দেশ,—আর এ হচ্ছে আফ্রিকা। এখানে যে শৃঙ্গী হস্তী পাওয়া যায়, এমন কথা আমি কোনদিন শুনিনি।"

বিমল বললে "কিন্তু এই শৃঙ্গী হস্তীর কথা সম্প্রতি আমি একখানা ইংরেজী কেতাবে পড়েছি। এরা দুর্লভ জীব,—খুব কম লোকই দেখেছে।

এখনো অনেকে এদের কথা বিশ্বাস করে না।...যাক্, এখন আর এ-সব আলোচনায় দরকার নেই। চাঁদ পশ্চিম আকাশে নেমে গেছে। গরিলারা আবার দেখা দিতে পারে। আশেপাশে সিংহরা গর্জন করছে। অন্ধকার হবার আগেই আমাদের তাঁবুতে ফিরে যেতে হবে।"

কুমার কাতরকণ্ঠে বললে, "সবই তো বুঝছি, কিন্তু মাণিকবাবুর কোন খোঁজই তো পাওয়া গেল না!"

বিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "সেটা আমাদের দোষ নয়। আজ আর খোঁজাখুঁজি বৃথা। কাল সকালে আবার সে-চেষ্টা করা যাবে।"

কুমার বললে, "মাণিকবাবু আর বেঁচে নেই।"

সে কথার জবাব না দিয়ে বিমল বললে, "ওঠ কুমার!"

দু'জনে আবার জঙ্গল ভেঙে পথ খুঁজতে লাগল—কিন্তু পথ কোথায়? যেখানেই 'টর্চে'র আলো পড়ে, সেখানেই ছোট-বড় ঝোপঝাপ বা নিবিড় অরণ্য ছাড়া অপর কিছুই দেখা যায় না।

বিমল বললে, "আমরা যেদিক দিয়ে এসেছি, সেদিক দিয়ে ফিরতে গেলেই আবার গরিলাদের কবলে গিয়ে পড়ব। এখন কি করা যায়? এই বনে ব'সেই কি রাত কাটাতে হবে?"

কুমার মাটির উপরে 'টর্চে'র আলো ফেলে বললে, "দেখ, এখানে কতরকম জন্তুর পায়ের দাগ। মাটিও যেন স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করছে। এর কারণ কি?"

বিমল হেঁট হয়ে কিছুক্ষণ দেখে বললে, "হ্যাঁ। গণ্ডার, হিপো, হাতি, সিংহ, হরিণ—নানারকম জীবেরই পায়ের দাগ দেখছি বটে! মাটিও খুব নরম। নিশ্চয়ই কাছে কোন জলাশয় আছে—এইখান দিয়ে জানোয়ারেরা জল খেতে যায়। কুমার, আর কোন ভয় নেই—কাছেই একটা-না-একটা পথ আছেই—যদিও সেটা তাঁবুতে ফেরবার পথ নয়, তবু পথ তো!"

বিমলের কথাই সত্য। সামনের একটা বড় ঝোপের আড়ালেই জানোয়ারদের পায়ে-চলা পথ পাওয়া গেল। অদূরে আকাশ কাঁপিয়ে

কি-একটা বড় জন্তু চীৎকার ক'রে উঠল।

বিমল বললে, "হিপোর চীৎকার। জলে সাঁতার কাটতে-কাটতে হিপোর দল মাঝে-মাঝে চেঁচিয়ে মনের আরাম জানায়।"

পথ দিয়ে এগুতে-এগুতে বিমল বললে, "কুমার, চারিদিকে চোখ রেখে সাবধানে চল। এই পথে নানা জীব জল পান করতে যায়। তাই শিকার ধরবার জন্যে বাঘ আর সিংহেরা আশেপাশে ওঁৎ পেতে ব'সে থাকে।"

সৌভাগ্যক্রমে ব্যাঘ্র বা সিংহ কারুর সঙ্গেই শুভদৃষ্টি হ'ল না। পথ শেষ হ'তেই সামনে দেখা গেল প্রকাণ্ড এক জলাশয়। তার একদিকে কালো বনের আড়ালে অদৃশ্য হবার আগে চাঁদ ম্লান-চোখে পৃথিবীকে শেষ-দেখা দেখে নিচ্ছে! জলের ভিতরে অনেকগুলো জীব ডুব দিচ্ছে বা সাঁতার কাটছে—দূর থেকে তাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না!

বিমল বললে, "হিপোপটেমাস।"

কুমার বললে, "আঃ, জল দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল। যা তেষ্টা পেয়েছে!" ব'লেই সে একদৌড়ে জলের ধারে গিয়ে তীরের উপর উপুড় হয়ে পড়ল। তারপর হাত বাড়িয়ে অঞ্জলি ক'রে জলপান করতে যাবে, অমনি জলের ভিতর থেকে বিদকুটে দুঃস্বপ্নের মতন একখানা প্রকাণ্ড ও ভীষণ মুখ ঠিক তার মুখের সুমুখেই হঠাৎ জেগে উঠল—এবং সেই সঙ্গেই পিছন থেকে বন্দুকের শব্দ এবং জলের ভিতরে ভয়ানক তোলপাড়।

একটানে কুমারকে জলের ধার থেকে সরিয়ে এনে বিমল বললে, "বন্ধু, সাত-তাড়াতাড়ি জল খেতে গিয়ে এখনি কুমিরের জলখাবার হয়েছিলে যে! যাক্, তুমি ঠাণ্ডা না হও, কুমিরের পো'কে ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছি। ...আরে, ও আবার কি?"

খানিক তফাতেই একটা মস্ত জানোয়ার দাঁড়িয়ে বন্দুকের শব্দে খাপ্পা হয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে।

—"বোধহয় গণ্ডার! পালিয়ে এস কুমার, পালিয়ে এস!"

বিমল ও কুমার যত-জোরে-পারে দৌড় দিয়ে আবার নিবিড় জঙ্গলের

ভিতরে গিয়ে ঢুকলে—ধুপ্‌ ধুপ্‌ শব্দ শুনে বুঝলে গণ্ডারটাও তাদের পিছনে-পিছনে ছুটে আসছে।

জঙ্গলের ভিতর আর দৌড়োবার উপায় নেই—চারিদিকেই অন্ধকার আর গাছপালা, দৌড়োবার চেষ্টা করলে কোন গাছের ধাক্কা লেগে হাড়-গোড় গুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। বিমল বললে, "কুমার শুয়ে পড়!"

তারা শুয়ে-পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে পাঞ্জাব মেলের ইঞ্জিনের মত বেগে ছুটে এসে, গণ্ডারটা ঠিক তাদের পাশ দিয়ে চ'লে গেল—সামনের জঙ্গল ছত্রভঙ্গ ক'রে গাছপালা কাঁটাঝোপ ভেঙে-চুরে!

খানিক পরে বিমল উঠে ব'সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, "ভাগ্যে গণ্ডারদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ নয়, আর তারা এক রোখা হয়ে ঠিক সোজা পথে ছোটে, তাই এ-যাত্রাও বেঁচে যাওয়া গেল।"

কুমার বললে, "এ কি কঠিন ঠাঁই বাবা! প্রাণ বাঁচাতে বাঁচাতেই প্রাণ তো যায়-যায় হয়ে উঠল!—উঃ!"

জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে চোখ চালিয়ে বিমল বললে, "ঐ চাঁদ অস্ত গেল। ব্যস্‌, আজকের রাতের মত বনবাস ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ঐ যাঃ! কুমিরটাকে গুলি করবার সময় 'টর্চ'টা হাত থেকে প'ড়ে গিয়েছিল, গণ্ডারের তাড়া খেয়ে সেটা আর তুলে আনবার সময় পাইনি!"

কুমার বললে, "আমার অবস্থা তোমার চেয়েও খারাপ। জল খাবার সময়ে 'টর্চ' আর বন্দুক দু'টি পাশে রেখেছিলুম। সে দুটো সেখানেই আছে।

বিমল বললে, "কি সু-খবর! এই অন্ধকারেই আমার নৃত্য করতে ইচ্ছে করছে।"

কুমার গুম হয়ে রইল।...

বিরাট অন্ধকার নিয়ে বিপুল অরণ্য তাদের বুকের উপরে ক্রমেই যেন চেপে বসতে লাগল। দূরে-দূরে আশে-পাশে কাদের সব আনা-গোনার শব্দ—কখনো থেমে-থেমে কখনো তাড়াতাড়ি, কখনো ধীরে-ধীরে! চারদিকে কারা যেন নিঃশব্দে পরামর্শ আর ষড়যন্ত্র করছে—

চারদিকে কারা যেন চক্ষুহীন চক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে—চারিদিকে ঝিঁঝিদের অশ্রান্ত আর্তনাদ, গাছের পাতায়-পাতায় বাতাসের কান্না।

আলো যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ। সে আশীর্বাদ হারালে পৃথিবীর রূপ বদলে যেতে বিলম্ব হয় না।

পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে কেবল অন্ধকারের মহাবন্যা বইছে। বিমলের মনে হলো, এমন অন্ধকার সে ভারতবর্ষে কখনো দেখেনি,—এ অসম্ভব শব্দময় অন্ধকারের গর্ভে বন্দী হওয়ার চেয়ে সিংহ, গণ্ডার বা গরিলার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোও ভালো,—এ অন্ধকার তাকে যেন অন্ধ আর দম বন্ধ ক'রে হত্যা করতে চায়। বিমলের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল—নিজের দুর্বলতায় নিজেই লজ্জিত হয়ে সে ভাবতে লাগল, আজ কেন তার এ-রকম দুশ্চিন্তা হচ্ছে ?

হঠাৎ খুব কাছেই কতকগুলো শুক্‌নো পাতা মড়্‌-মড়্‌ ক'রে উঠল, তারপরেই চুপচাপ!

কোন অদৃশ্য শত্রু কি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে? কোন হিংস্র জন্তু কি আবার তাদের আক্রমণ করতে চায়? তার আত্মা কি আগে থাকতে সেটা জানতে পেরে তাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছে? এই অজ্ঞাত ভয় কি তাহ'লে অমূলক নয়? বিমল প্রাণপণে অন্ধকার ভেদ ক'রে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না।

সে অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে চুপি-চুপি ডাক্‌লে, "কুমার!"

—"কি বল্‌ছ?"

—"কাছেই একটা শব্দ শুন্‌লে? পায়ের শব্দের মত?"

—"হুঁ। একটু আগে আমার মনে হলো, কারা যেন ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে কথা কইছে।"

—"ওটা তোমার শোনবার ভুল। কিন্তু শুকনো পাতার উপরে একটা শব্দ হয়েছে। হয়তো কোন জীবজন্তু!"

—"সম্ভব।"

—"কিন্তু দেখবার কোন উপায় নেই। অন্ধকারে আমরা এখন অন্ধ।"

—"আমার কাছে একটা দেশলাই আছে। জ্বালব নাকি ?"

বিমল কি জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আচম্বিতে কারা তার উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল—কোন রকম আত্মরক্ষার চেষ্টা করার আগেই মাথার উপরে সে ভীষণ এক আঘাত অনুভব করলে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল।

বারো

শত্রুর কবলে

যখন জ্ঞান হলো, চোখ মেলে বিমল দেখলে যে, ভোরের আলোয় চারিদিক ঝল্‌মল্‌ করছে।

প্রথমে তার কিছুই স্মরণ হলো না; তার মনে হলো সে সবে ঘুম থেকে জেগে উঠলো। কিন্তু হঠাৎ ব্যথা অনুভব ক'রে সে মাথায় হাত দিলে। সঙ্গে-সঙ্গে তার হাত ভিজে গেল। চম্‌কে হাতখানা চোখের সাম্‌নে এনে সে দেখলে, হাতময় রক্ত!......তখন তার সব কথা মনে পড়ল।

সে চিৎ হয়ে শুয়েছিল, তাড়াতাড়ি উঠে বসল। তারপর যে-দৃশ্য দেখলে, তাতে তার বুকের ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

তার চারিদিকে গোল হয়ে প্রায় ৩০/৪০ জন লোক ব'সে আছে। প্রত্যেকেরি চেহারা কাল যেন কষ্টিপাথর, দেহ প্রায় উলঙ্গ, কেবল কোমরে লেংটির মত একখানা ক'রে ন্যাকড়া জড়ানো। তাদের প্রত্যেকেরি হাতে একটি ক'রে বর্শা, সকালের রোদে বর্শার ফলাগুলো জ্বলে জ্বলে উঠছে আগুনের ফুল্‌কির মত। লোকগুলো যে আফ্রিকারই বুনোমানুষ, বিমলের তা বুঝতে বিলম্ব হলো না! তার পরে হঠাৎ বাংলা

কথা শুনে তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরে বসল এবং সবিস্ময়ে দেখলে, খাকি পোশাক-পরা তিনজন লোক সেখানে ব'সে আছে। তারা পরস্পরের সঙ্গে বাংলা ভাষাতেই কথাবার্তা কইছে;—সুতরাং তারা যে বাঙালী সে বিষয়ে তার সন্দেহ রইলো না।

আর-একটু লক্ষ্য ক'রে দেখে, সেই তিনজনের ভিতরে তু'জনকে সে চিনতেও পারলে, তাদের একজনকে সে মোম্বাসার হোটেলের ভিতরে দেখেছিল এবং তিনি হচ্ছেন মাণিকবাবুর ছোটকাকা সেই মাখনবাবু।

আর-একজন হচ্ছে সেই রামু, কলকাতায় মাণিকবাবুর বাড়ীতে ম্যাপ চুরি করবার জন্যে যে চাকর সেজে কাজ নিয়েছিল।

বিমলকে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে মাখনবাবু গাত্রোত্থান ক'রে তার কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর হাস্যমুখে বললেন, "কি বিমলবাবু, এখন কেমন আছেন?"

বিমল কোন জবাব দিলে না।

—"আমার সঙ্গের লোকগুলোকে দেখে কি আপনার ভয় করছে? ভয়েই কি আপনার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না?"

মাখনবাবুর চোখের উপরে চোখ রেখে শান্তস্বরে বিমল বললে, "ভয়ের সঙ্গে এ জীবনে কোন দিনও পরিচয় হয়নি—এ জগতে কারুকে আমি ভয় করি না।"

মাখনবাবু হো হো ক'রে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, "আপনি যে খুব একজন সাহসী ব্যক্তি সেটা জেনে খুশি হলুম। কিন্তু আপনার এ সাহস আজ কোন কাজে লাগবে ব'লে মনে হচ্ছে না।"

বিমল সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললে, "আপনাকে আমি চিনি। আপনি মাণিকবাবুর কাকা মাখনবাবু। কিন্তু আমাকে আপনারা ধ'রে এনেছেন কেন?"

মাখনবাবু বললেন, "ধ'রে এনেছি কেন? নিমন্ত্রণ করলে আপনি আসতেন না ব'লে।"

—"কিন্তু আমি আসি না আসি, তাতে আপনার কি আসে যায়?"

—"আসে-যায় অনেকখানি। বেশি কথায় দরকার নেই, একবারেই আসল কথা শুনুন। আপনার কাছ থেকে আমি একখানা ম্যাপ চাই।"

বিমল বিস্ময়ের ভান ক'রে বললে, "ম্যাপ? কিসের ম্যাপ?"

—"ম্যাপখানা যে কিসের, তা আমিও জানি, আপনিও জানেন। তা নিয়ে আর লুকোচুরি করা বৃথা। সে ম্যাপখানা আমার হাতে দিন, সমস্ত গোলমাল এখুনি মিটে যাবে!"

—"একখানা ম্যাপ আমার কাছে ছিল বটে, কিন্তু মোম্বাসার হোটেলে সেটা চুরি গেছে, একথা আপনি জানেন বোধহয়?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু সেখানা যে জাল ম্যাপ তাও আমার অজানা নেই! বিমলবাবু, আপনার চালাকিকে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু ও-চালাকির চাল আজ আর চলবে না। আপনি বুদ্ধিমান, ম্যাপখানা যে এখন আমাকে দেওয়াই উচিত একটু ভেবে দেখলেই তা বুঝতে পারবেন!"

বিমল চুপ ক'রে রইলো। তারপর ধীরে-ধীরে মাথা তুলে বললে, "সে ম্যাপ এখন আপনাকে আমি কি ক'রে দেবো? সেখানা তো আমার কাছে নেই।"

মাখনবাবু বললেন, "ম্যাপখানা যে আপনার কাছে নেই তা আমরা জানি, কারণ, আমরা আপনার কাপড়-চোপড় খুঁজে দেখেছি। কিন্তু সেখানা আপনাদের তাঁবুর ভেতরে নিশ্চয় আছে। কোথায় আছে এখন কেবল সেইটেই আমরা জানতে চাই। একবার তার খোঁজ পেলে সেখানা হস্তগত করতে আমাদের বেশি বিলম্ব হবে না।"

বিমল বললে, "ম্যাপের ঠিকানা পেলেই আপনারা আমাকে ছেড়ে দেবেন তো?"

মাখনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "আপনি খুব মূল্যবান জীব নন। ম্যাপখানা পেলে পরেও আপনাকে ধ'রে রেখে আমাদের কোনই লাভ নেই!"

বিমল বললে, "আর ম্যাপের ঠিকানা যদি না বলি?"

—"তাহ'লে বিনা বাক্যব্যয়ে পরলোকে যাবার জন্যে প্রস্তুত হোন!"

বিমল আবার খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "আমি পরলোকে যাবার জন্যে প্রস্তুত, আপনারা কি করতে চান, করুন।"

মাখনবাবু কর্কশকণ্ঠে বললেন, "তাহ'লে ম্যাপের ঠিকানা আপনি বলবেন না? দেখুন, ভালো ক'রে ভেবে দেখুন।"

বিমল বললে, "এর মধ্যে ভাববার কিছুই নেই। ম্যাপের ঠিকানা আমি বলবো না।"

—"বলবেন না? বলবেন না?"—বলতে বলতে দারুণ ক্রোধে মাখন-বাবুর সমস্ত মুখখানা লাল-টক্‌টকে হয়ে উঠলো। একেবারে বিমলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তিনি আবার বললেন, "বিমলবাবু, আপনার সঙ্গে বেশি কথা কইবার সময় আমাদের নেই, আমাকে যারা চেনে তারা সবাই জানে, বেশি কথার মানুষ আমি নই। আমি হাসতে হাসতে মানুষকে আলিঙ্গন করতে পারি। আবার পরমুহূর্তে তেমনি হাসতে হাসতেই তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারি। আর একবার মাত্র আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, ম্যাপের ঠিকানা আপনি দেবেন কিনা বলুন।"

বিমল হাসতে হাসতে বললে, "আপনারা অনেক লোক আর আমি একলা। আপনাদের বাধা দেবার শক্তি আমার নেই। আপনাদের যা খুশি করতে পারেন—ম্যাপের ঠিকানা আমি বলবো না।"

মাখনবাবু হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—"রামু!"

রামু তখনি উঠে মাখনবাবুর কাছে দাঁড়ালো।

মাখনবাবু বললেন, "এই হতভাগাকে এখনি ঐ গাছের ডালে লট্‌কে দে।"

সাম্‌নেই একটা মস্তবড় গাছ অনেক উঁচুতে মাথা তুলে আকাশের অনেকখানি ছেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারি একটা লম্বা ডালে দড়ি ঝুলিয়ে রামু মহা-উৎসাহে ফাঁসির আয়োজনে লেগে গেল।

বিমল আর-একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে। সেই প্রায়-উলঙ্গ

অসভ্য লোকগুলো এক-একটা কাল পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসেছিল। কিন্তু তাদের চোখগুলো তখন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে ঠিক যেন সব নিষ্ঠুর হিংস্র পশুর মত!

নিজের অসাধারণ শক্তির কথা বিমল জানত। এবং ইচ্ছা করলে সে যে এখনি মরবার আগে অন্ততঃ পাঁচ-ছয় জন শত্রুকে বধ ক'রে যেতে পারে এটাও তার অজানা ছিল না। কিন্তু অকারণে নরহত্যা করতে তার সাধ হলো না। কারণ, পাঁচ-ছ'জন শত্রুকে বধ করলেও তার মৃত্যু যে নিশ্চিত এটা সে বুঝতে পারলে। কাজেই সে আর কোনরকম বাধা দেবার চেষ্টা করলে না।

হঠাৎ পিছন থেকে কে এসে বিমলের দুই কাঁধের উপর দুই হাত রাখলে। মুখ ফেরাতেই বিমলের চোখে পড়ল সেই প্রকাণ্ড লম্বা মড়া-দেঁতো কাফ্রিটার কদাকার মুখখানা। এও যে ভিড়ের ভিতরে ছিল এতক্ষণ বিমল তা দেখতে পায়নি।

মাখনবাবু হাঁকলেন, "রামু! ফাঁস ঠিক হয়েছে তো?"

রামু বললে, আজ্ঞে, সব তৈরি।"

মাখনবাবু বললেন, "তাহ'লে ওকে ঐখানে নিয়ে যাও।"

মড়া-দেঁতো বিমলের একখানা হাত ধ'রে টেনে বাওয়াব্ গাছের দিকে অগ্রসর হলো, বিমলও কোন বাধা না দিয়ে আস্তে আস্তে তার সঙ্গে গাছের তলায় এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। রামু একমুখ হাসি নিয়ে বিমলের গলায় দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে দিলে।

মড়া-দেঁতো দড়ির অন্য প্রান্তটা ধ'রে বিমলকে টেনে শূন্যে তোলবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

মাখনবাবু বললেন, "ছোক্‌রা, এই শেষবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, ম্যাপের ঠিকানা আমাকে বলবে কি?"

বিমল অটল স্বরে বললে, "না।"

সঙ্গে সঙ্গে মাখনবাবু হুকুম দিলেন, "তাহ'লে ওকে টেনে তোল।"

চারপাশের লোকগুলো মহা আনন্দে অজানা-ভাষায় চেঁচিয়ে

উঠলো। মড়া-দেঁতো ফাঁসির দড়ি ধ'রে টান মারতে উদ্যত হলো—

—সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে উপরি-উপরি ছয় সাতটা বন্দুকের আওয়াজ! পরমুহূর্তেই ভিড়ের ভিতর থেকে তিন জন লোক আর্তনাদ ক'রে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়লো!

আবার অনেকগুলো বন্দুকের আওয়াজ—আবার আরো—কয়েক জন লোক মাটির উপরে প'ড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল!

তেরো

ম্যাপের সন্ধান

ফট্‌ ক'রে একটা বিশ্রী আওয়াজ, তারপরেই গোঁ-গোঁ শব্দ! কুমার বেশ বুঝলে, কার মাথায় লাঠি পড়ল।

জঙ্গলের ভিতরে স্যাঁৎসেঁতে ভিজে জমির উপরে সে নিজের ক্লান্ত দেহটাকে বিছিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তার অদৃষ্টে আজ বিশ্রাম নেই। শত্রুরা তাদের আক্রমণ করেছে এবং বিমল নিশ্চয়ই তাদের কবলে গিয়ে পড়েছে। কাদের ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে কথাও তার কানে গেল। সে একা। এখন আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে মাটির উপর দিয়ে খুব সাবধানে গড়িয়ে গড়িয়ে সে ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল।

হঠাৎ একটা আলো জ্ব'লে উঠলো। কিন্তু শত্রুরা যে কারা, সেটা দেখবারও সময় সে পেলে না, সড়াৎ করে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়েই কুমার গুঁড়ি মেরে যতটা জোরে পারা যায়, এগিয়ে যেতে শুরু করলে।···মিনিট পনেরো পরে যখন সে থামল, তখন কাঁটা ঝোপে তার গা ব'য়ে রক্ত ঝরছে এবং গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে তার সারা দেহ থেঁতো হয়ে গেছে।

মাটির উপরে প'ড়ে খানিকক্ষণ কুমার কান পেতে রইল—কিন্তু শত্রুর আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কতকটা আশ্বস্ত হয়ে সে শুয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল—

আর ভাবতে লাগল।···

বিমলের কি হলো? সে বেঁচে আছে, না নেই? যদি এখনো বেঁচে থাকে, তাহ'লে তাকে উদ্ধার করবার উপায় কি?···

আচম্বিতে কুমারের মনে হলো, তার পাশেই কে যেন খুব জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে! একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে আরো ভালো ক'রে সে শোনবার চেষ্টা করলে।

হ্যাঁ, নিশ্বাস যে পড়ছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই! কিন্তু কে এ? মানুষ না জন্তু? অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না!

সন্তর্পণের সঙ্গে কুমার আবার গড়িয়ে সরে যেতে গেল এবং একেবারে গিয়ে পড়ল একটা জ্যান্তো দেহের ওপরে!—সঙ্গে সঙ্গে "আঁ আঁ" করে একটা বিকট চিৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে কুমার মাটিতে শুয়ে শুয়েই সেই দেহটার উপরে জোড়া-পায়ে লাথি মারলে!

আবার চিৎকার হলো—"ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে, ওরে বাবা রে!"

এ যে মাণিকবাবুর গলা!

ধড়্ মড়িয়ে উঠে ব'সে কুমার সবিস্ময়ে বললে, "অ্যাঁ, মাণিকবাবু নাকি?"

"ওরে বাবা রে, গেছি রে! ওরে বাবা রে, এই রাত-আঁধারে বন-বাদাড়ে নাম ধ'রে কে ডাকে রে! ওরে বাবা রে, শেষটা ভূতের হাতে পড়লুম রে!"

—"মাণিকবাবু, মাণিকবাবু—শুনুন, আমি ভূত নই, আমি কুমার" —এই বলেই সে পকেট থেকে দেশলাই বার ক'রে জ্বাললে।

জোড়া-পায়ের লাথি খেয়ে মাণিকবাবু তখন মাটির উপর প'ড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, এখন কুমারের নাম শুনেই তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন

এবং চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "অ্যাঁ কুমারবাবু? আপনি?"—বলতে বলতে মনের আবেগে তিনি কেঁদে ফেললেন!

কুমার অনেক কষ্টে মাণিকবাবুকে শান্ত ক'রে বললে, "আমরা তো আপনার খোঁজেই বেরিয়েছিলুম। কিন্তু আপনি এখানে এলেন কেমন ক'রে?"

মাণিকবাবু বললেন, "আরে মশাই, সে অনেক কথা, ভাবতেও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে—উঃ!"

কুমার বললে, "ভালো ক'রে সব পরে শুনব অখন। এখন খুব সংক্ষেপে দু-কথায় বলুন দেখি, ব্যাপারটা কি হয়েছিল?"

মাণিকবাবু বললেন, "আচ্ছা, তবে সংক্ষেপেই শুনুন।……কাল রাত্রে তাঁবুর ভিতরে লেপ মুড়ি দিয়ে তো দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছিলুম—হঠাৎ আমার ঘুম গেল ভেঙে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'লো, আমার বিছানা যেন চ'লে বেড়াচ্ছে। প্রথমে ভাবলুম, আমি একটা বিদঘুটে স্বপ্ন দেখছি—কিন্তু তারপরেই বুঝলুম, এ তো স্বপ্ন নয়, এ যে সত্যি। লেপের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতেই দেখলুম, চাঁদের আলোয় বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমি চলেছি। আমি একটু নড়তেই গরর্ গরর্ করে একটা গর্জন হলো, আমিও একেবারে আড়ষ্ট। ও বাবা, ও যেন বুনো জন্তর আওয়াজ। তোষক আর লেপ-সুদ্ধ সে আমাকে মুখে ক'রে নিয়ে চলেছে, আর আমার দেহ তার মধ্যে কোনরকমে জড়িয়ে বন্দী হয়ে আছে। এখন উপায়? জানোয়ারটাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না, লেপ আর তোষক ফুঁড়ে তার দাঁতও আমার গায়ে বেঁধেনি।…হঠাৎ জানোয়ারটা একটা লাফ মারলে, কতকগুলো ঝোপঝাড় দুলে উঠল আর আমিও ভয়ে না চেঁচিয়ে পারলুম না—সঙ্গে সঙ্গে আমিও বিছানার ভিতর থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে একটা ঝোপের ভিতর গিয়ে পড়লুম। তাকিয়ে দেখি, মস্ত একটা সিংহ আমার বিছানা মুখে ক'রে লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি যে আর বিছানার ভিতরে নেই, সেটা সে টেরই পেলে না। তারপর আর বেশী কথা কি বলব, সিংহটা পাছে আবার আমাকে খুঁজতে আসে,

সেই ভয়ে আমি তো তখনি উঠে চম্পট দিলুম—কিন্তু কোথায়, কোন্ দিকে যাচ্ছি সে কথাটা একবারও ভেবে দেখলুম না। তার ফল হ'লো এই যে, কাল রাত থেকেই পথ হারিয়ে, পদে পদে খাবি খেয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি—বাঁচবার আর কোন আশাই ছিল না—"

মাণিকবাবুকে বাধা দিয়ে কুমার বললে, "তারপর কি হলো আর তা বলতে হবে না ; আমি সব বুঝতে পেরেছি।"

মাণিকবাবু বললেন, "কিন্তু আপনি একলা কেন? বিমলবাবু কোথায়?"

কুমার ভাঙা ভাঙা গলায় বললে, "বিমল এখন ইহলোকে না পরলোকে, একমাত্র ভগবানই তা জানেন।"

মাণিকবাবু সচমকে বললেন, "ও বাবা, সে কি কথা?"

"চুপ"—ব'লেই কুমার মাণিকবাবুর হাত চেপে ধরলে। খানিক তফাতেই জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে অনেকগুলো আলো দেখা গেল।

মাণিকবাবু চুপি চুপি বললেন, "ও কিসের আলো?"

—"আলোগুলো এইদিকেই আসছে। নিশ্চয়ই শত্রুরা আমাদের খুঁজছে!"

—"শত্রু? শত্রু আবার কারা?"

—"বোধহয় ঘটোৎকচের দল।"

—"ও বাবা, বলেন কি! এই বিপদের ওপরে আবার ঘটোৎকচ। গোদের ওপরে বিষফোড়া। তাহ'লেই আমরা গেছি!"—মাণিকবাবু একেবারেই হাল ছেড়ে দিলেন।

আলোগুলো নাচতে নাচতে ক্রমেই কাছে এসে পড়ল—অনেক লোকের গলাও শোনা যেতে লাগল। তারপর একটা কুকুরের চীৎকার—ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!

কুমার একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সানন্দে বললে, "এ যে আমার বাঘার গলা? মাণিকবাবু, আর ভয় নেই—রামহরি নিশ্চয়ই লোকজন নিয়ে আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। রামহরি, রামহরি! আমরা এখানে

আছি! রামহরি!"—বলতে-বলতে সে আলোগুলোর দিকে ছুটে এগিয়ে গেল এবং বলা বাহুল্য যে, মাণিকবাবুও কুমারের পিছনে-পিছনে ছুটতে একটুও দেরি করলেন না।

কুমারের আন্দাজ মিথ্যা নয়। সকলের আগে আগে আসছে ঘেউ ঘেউ করতে করতে বাঘা, তারপর একদল 'আস্কারি' বা বন্দুকধারী রক্ষী। 'পোর্টার' বা কুলির দল লণ্ঠন হাতে ক'রে তাদের পথ দেখিয়ে আনছে।

কুমারকে দেখেই বাঘা বিপুল আনন্দে ছুটে এসে, পিছনের দুই পায়ে দাঁড়িয়ে সাম্‌নের পা দু'টো দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরলে। রামহরিও মহা-আহ্লাদে ব'লে উঠল—"জয়, বাবা তারকনাথের জয়! এই যে কুমারবাবু, এই যে মাণিকবাবু। কিন্তু আমার খোকাবাবু কোথায়?"

কুমার বিমর্ষমুখে বললে, "রামহরি, বিমল আর বেঁচে আছে কিনা জানি না।"

রামহরি ধপাস্‌ ক'রে ব'সে প'ড়ে বললে, "অ্যাঃ! বল কি!"

কুমার অল্প দু'চার কথায় তাদের বিপদের কথা বর্ণনা করলে।

রামহরি তখন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "তা'হলে আর এখানে দেরি করা নয়। হয়তো এখনো গেলে খোকাবাবুকে বাঁচাতে পারব!"

ভোরের আলো যখন গাছের সবুজ পাতায় পাতায় শিশুর মতন খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে, কুমার ও তার দলবল তখন একটা ঢিপির মতন ছোট পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

সেই ছোট পাহাড়টার উপরে উঠতে তাদের মিনিট-তিনেকের বেশি লাগল না। তারপরেই কুমারের চোখে যে-ভীষণ দৃশ্য জেগে উঠল, আমরা আগের পরিচ্ছেদেই তা বর্ণনা করেছি। কুমার এবং আর সকলে কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল।...প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে, বাওয়াব-গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রামু তখন মহা উৎসাহে বিমলের গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে ব্যস্ত।

আর অপেক্ষা করার সময় নেই। রক্ষী দলকে ইঙ্গিত ক'রে কুমার নিজেও একটা বন্দুক নিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে লাগল।

মড়া-দেঁতো ফাঁসির দড়ি ধ'রে বিমলকে শূন্যে টেনে তুলতে উদ্যত হলো, সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে কুমারের, তারপর রক্ষীদের বন্দুক ঘন ঘন অগ্নিবর্ষণ শুরু করলে।

দেখতে-দেখতে শত্রুরা যে যেদিকে পারলে, প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলে; ঘটনাস্থলে রইল খালি বিমল আর জনকয়েক হত ও আহত জুলু আর কাফ্রি-জাতের লোক। কুমার ও রামহরি একছুটে নিচে নেমে গিয়ে বিমলের গলার বাঁধন খুলে দিলে।

বিমল হাসতে-হাসতে বললে, "মাণিকবাবুর কাকার অনুগ্রহে দিব্য স্বর্গে যাচ্ছিলুম, তোমরা এসে আমার স্বর্গ-যাত্রায় বাধা দিলে কেন?"

পুরাতন ভৃত্য রামহরি ধমক দিয়ে বললে, "জ্যাঠামি করতে হবে না, ঢের হয়েছে!"

কুমার বললে, "ওরা তোমাকে ফাঁসিতে লট্‌কে দিচ্ছিল কেন বিমল?"

—"গুপ্তধনের ম্যাপ কোথায় আছে বলিনি ব'লে।"

কুমার তৎক্ষণাৎ উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, "সর্বনাশ! তাঁবুতে এখন বেশি লোকজন তো নেই? ওরা যদি এখন গিয়ে ম্যাপের লোভে আবার আমাদের তাঁবু আক্রমণ করে?"

বিমল নিশ্চিন্তভাবেই বললে, "তাহ'লে তাঁবুতে তারা ম্যাপ খুঁজে পাবে না!"

—"খুঁজে পাবে না?"

—"না"—ব'লেই বিমল ব'সে পড়ল এবং নিজের জুতোর গোড়ালির এক পাশ ধ'রে বিশেষ এক কায়দায় টান মারলে। অমনি গোড়ালির খানিকটা বাইরে বেরিয়ে এল এবং তার ভিতর থেকে সে একখণ্ড কাগজ বার ক'রে কুমারকে দেখালে।

কুমার সবিস্ময়ে বললে, "ও কি ব্যাপার?"

বিমল বললে, "ম্যাপ। আমি 'অর্ডার' দিয়ে কৌশলে এই জুতো তৈরি করিয়েছি। আমার জুতোর গোড়ালির একপাশ ফাঁপা······গুপ্তধনের ম্যাপ ওর মধ্যেই পরম আরামে বিশ্রাম করে।"

রামহরি বললে, "ছি ছি, খোকাবাবু! ওটা তো তোমার কাছেই ছিল, তবু ওটা তাদের হাতে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করনি? তুচ্ছ গুপ্তধনের জন্যে—"

বিমল বাধা দিয়ে বললে, "না রামহরি, না! সে শয়তানদের তুমি চেনো না,—আমি ম্যাপখানা দিলেও তারা আমাকে রেহাই দিত না! তাই আমি প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করিনি, বুঝেছ?······যাক্ ও-কথা। এখন তাঁবুতে ফেরা যাক্। কাল সকালেই আমরা উজিজি যাত্রা করব।"

চৌদ্দ

সিংহদমন গাটুলা

এই তো টাঙ্গানিকা হ্রদ! কিন্তু এ কি হ্রদ, না, সমুদ্র?

চোখের সামনে আকাশের কোল জুড়ে থৈ-থৈ করছে শুধু জল আর জল,—কোথায় তার ওপার, আর কোথায় তার তল!

এপারে তীরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর শ্যাম বনানী এবং আকাশের নীল-মাখানো জল-আয়নায় নিজেদের ছায়া দেখে বনের গাছপালারা যেন মনের আনন্দে মর্মর-গান গেয়ে গেয়ে উঠছে।

বিমল, কুমার, মাণিকবাবু ও রামহরি হ্রদের ধারে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কারণ, যদিও মাণিকবাবুর মেজো কাকার পত্রে তারা জেনেছিল যে, টাঙ্গানিকার চেয়ে লম্বা হ্রদ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই এবং স্থানে স্থানে তা পঁয়তাল্লিশ মাইল চওড়া, তবু টাঙ্গানিকাকে স্বচক্ষে দেখবার আগে তারা এর বিপুলতার স্পষ্ট ধারণা করতে পারেনি।

বনের ভিতরে Mvule নামে এক জাতের গাছ দেখা গেল, তাদের বিপুলতা দেখলেও আশ্চর্য হ'তে হয়। তাদেরই গুঁড়ি কেটে নিয়ে এদেশী লোকেরা যে-সব নৌকা তৈরি করেছে, হ্রদের উপরে সেগুলি সারে সারে নেচে নেচে ভেসে যাচ্ছে। কূল দিয়ে একখানা বড় স্টিমারও হ্রদের বুক দুলিয়ে চ'লে গেল, কুমার দেখলে, স্টিমারে তার নাম লেখা রয়েছে, Hedwig von Wissmann !

কুমার বললে, "নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে, এখানা জার্মান স্টিমার।"

বিমল বললে, "হুঁ, উজিজি যখন জার্মানদের স্টেশন তখন এখানে তাদের স্টিমার থাকা স্বাভাবিক।" তারপর পথ-প্রদর্শকের কাছ থেকে তারা জানতে পারলে যে, টাঙ্গানিকার পূর্ব তীরে জার্মানদের, দক্ষিণ তীরে ইংরেজদের ও পশ্চিম তীরে বেলজিয়ানদের প্রভুত্ব এবং তার জলে স্টিমারও ভাসে অনেকগুলো।

উজিজি নামে যে বড় গ্রামখানি হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, তা জার্মান স্টেশন হ'লেও দলে দলে আরব এসে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে এবং সোয়াহিলি জাতের লোকেরাও এখানে দলে বেশ ভারী। "সোয়াহিলি" কথাটির সৃষ্টি হয়েছে "সোয়া হিলি" শব্দ থেকে। "সোয়াহিলি"র (Swahili) মানে হচ্ছে, "যারা শত্রু-মিত্র সবাইকে সমান ঠকায়।" চমৎকার নাম।

গ্রামের ঠিক বাইরেই, টাঙ্গানিকার তীরে বিমলদের তাঁবু পড়ল।

রামহরি আঁজলা ক'রে টাঙ্গানিকার জল মুখে দিয়ে বললে, "ও খোকাবাবু, সমুদ্দুরের জলের মতন অতটা না হোক, এ-জলও যে বেশ একটু নোন্তা। এ-জল তো খেতে ভালো লাগে না।"

বিমল বললে, "তা'হলে খাবার জল অন্য জায়গা থেকে আনতে হবে। কিন্তু রামহরি, তোমাকে এখন অন্য কাজ করতে হবে। জনকয়েক লোক নিয়ে একবার গাঁয়ের ভেতরে যাও। দেখে এস, এখানে হাট-বাজার কিছু আছে কিনা। আর গাটুলা ব'লে কোন বুড়ো সর্দার এই গাঁয়ে বাস করে কিনা, সে খোঁজটাও নিয়ে এস।"

রামহরি বললে, "গাটুলা? সে আবার কে?"

—"মাণিকবাবুর মেজো কাকা। সুরেনবাবুর চিঠিতে তার পরিচয় পেয়েছি। সুরেনবাবুর সঙ্গে গাটুলাও গুপ্তধন আনতে গিয়েছিল, আমরাও তাকে সঙ্গে নেব। পথের খবর সে সব জানে।"

রামহরি বললে, "পারি তো গাটুলাকে তোমার কাছে নিয়ে আসব কি?"

—"হ্যাঁ।"

রামহরি চ'লে গেল। মাণিকবাবু এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে বললেন, "বিমলবাবু আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

—"বলুন।"

—আপনারা তাহ'লে গুপ্তধন না নিয়ে ফিরবেন না?"

—"এই রকমই তো আমাদের মনের ইচ্ছে!"

—"মেজো কাকার চিঠি প'ড়ে যা বুঝেছি, আমরা গুপ্তধন আনতে গেলে সেখানকার অসভ্য লোকদের সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে অর্থাৎ এখন যে-সব বিপদের বোঝা আমাদের ঘাড়ের ওপরে চেপে রয়েছে, তার ওপরেও এই নতুন বিপদ নিয়ে আমাদের ভুগতে হবে?"

—"হুঁ।"

—"মশাই, তাহ'লে আপনারাই গুপ্তধন আনতে যান। আমি লিখে দিচ্ছি, তার বখ্‌রা আমার চাই না!"

—"আপনি কি করবেন?"

—"দেশে যাব।"

—"বেশ, আগে তো গুপ্তধনের সন্ধানে যাওয়া যাক, তারপর আপনার কথামত কাজ করা যাবে"—গম্ভীরভাবে এই কথাগুলো ব'লে বিমল একটা গাছতলায় গিয়ে ব'সে পড়ল।

মাণিকবাবু খানিকক্ষণ নিরাশমুখেই সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে, ফোঁস ক'রে একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলে ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন এবং এ-যাত্রা প্রাণটা নিতান্তই বাজে খরচ হবে বুঝে বিছানাকে আশ্রয় ক'রে দুই চক্ষু

মুদে ফেললেন।

হ্রদে খুব মাছ পাওয়া যায় শুনে কুমার মাছ ধরবার আয়োজন করবার জন্যে বেরিয়ে গেল।

তাঁবু থেকে খানিক তফাতে একটা সঙ্গীহীন একানিয়া গাছের উপরে চ'ড়ে একটা বানর ভারী বিপদে পড়েছে। তাকে দেখেই সুযোগ বুঝে বাঘা সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে এবং থাবা পেতে গাছতলায় ব'সে এক দৃষ্টিতে বানরটার দিকে তাকিয়ে নীরব ভাষায় যেন বলছে,—আর তো পালাবার পথ নেই স্যাঙাত্! কাজেই সুড় সুড় ক'রে নেমে এসে দেখ, আমি কেমন চমৎকার কামড়ে দিতে শিখেছি!

ঘণ্টাখানেক পরে রামহরি একদল আরবের সঙ্গে ফিরে এল। আরবদের ভিতর থেকে একটা লোক দূর হ'তেই বিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তার মুণ্ডটা প্রকাণ্ড এক ফুটবলের মতন গোলাকার, তার বক্ষ-দেশ প্রকাণ্ড এক বৃক্ষের কাণ্ডের মতন চওড়া, তার ভুঁড়িটি প্রকাণ্ড এক পোট্লার মতন, যেন কোমরে বাঁধা থেকে ঝুলছে ও দুলছে এবং তার প্রকাণ্ড পা দুটো পৃথিবীর উপর দিয়ে চলছে, আর মনে হচ্ছে, দু'দুখানা কোদাল যেন মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এগিয়ে আসছে! এ-লোকটার আগা-গোড়া সমস্তই প্রকাণ্ড!

রামহরি এসে বললে, "খোকাবাবু, তুমি যাকে খুঁজছিলে তাকে এনেছি!"

বিমল বললে, "গাটুলা?"

সেই প্রকাণ্ড-মুণ্ড-বুক-ভুঁড়ি-পা-ওয়ালা লোকটি প্রকাণ্ড একটা হাঁ ক'রে হা হা স্বরে হেসে বললে, 'হ্যাঁ হুজুর! আমারই নাম গাটুলা—লোকে আমাকে সিংহদমন গাটুলা সর্দার ব'লে ডাকে—আজ পর্যন্ত সতেরোটা সিংহকে আমি যমের বাড়ীর রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি।"

বিমল বিস্মিত হ'য়ে বললে, "গাটুলা, তুমি বাংলা জানো?"

—"হ্যাঁ জানি বৈকি,—বাংলা জানি, ফার্সী জানি, ইংলিশ জানি, জার্মান জানি! আমি বাংলা শিখেছি সুরেনবাবু হুজুরের—তাঁর আত্মা

স্বর্গবাস করুক—কাছ থেকে।”

—“আমরাও সুরেনবাবুর চিঠিতে তোমার পরিচয় পেয়েছি। সুরেন-বাবুর ভাইপোর সঙ্গে আমরা বাংলাদেশ থেকে তোমার কাছেই এসেছি।”

গাটুলা আগ্রহভরে বললে, “কোথায় সুরেনবাবুর ভাইপো ? আমি তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে ভালোবাসা জানাতে চাই।”

—“তিনি তাঁবুর ভেতরে বিশ্রাম করছেন, একটু পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।”

গাটুলা মাটির উপরে ব'সে প'ড়ে দুলতে দুলতে বললে, “হুঁ, আপনারা কেন এসেছেন, তা আমি জানি। আপনারা যে শীঘ্রই আমার কাছে আসবেন, তাও আমি কাল রাতেই টের পেয়েছিলাম।”

বিমল আশ্চর্য হয়ে বললে, “কাল রাতেই টের পেয়েছিলে ? কেমন ক'রে ?”

—“শুনুন হুজুর, বলি। আমি বেশি কথার মানুষ নই, যা বলব দু-চার কথায় বলব। যারা বেশি কথা কয়, তারা বাজে কথা কয়। যারা বাজে কথা কয়, তারা সিঙ্গী মারতে পারে না। যারা সিঙ্গী মারতে পারে না, তারা বীরপুরুষ নয়। আর যারা বীরপুরুষ নয়, সিংহদমন গাটুলা সর্দার তাদের মুখে থুতু দেয়”—এই ব'লে গাটুলা ভূমিতলে থু থু ক'রে থুতু ফেললে।

মনে মনে হেসে বিমল গম্ভীর মুখে বললে, “হ্যাঁ, তুমি যে বেশি কথার মানুষ নও, তোমার কথা শুনেই তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমরা যে শীঘ্রই এখানে আসব, কাল রাতেই তুমি কেমন ক'রে তা টের পেয়েছিলে ?”

—“সেই কথা জানতে চান তো শুনুন হুজুর, বলি। সাধু লোক রাত্রে ঘুমোয়। গাটুলা সর্দার সাধু লোক, কাজেই অন্য রাত্রের মত কাল রাত্রেও সে ঘুমোতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, ঘুমোলে অতি বড় জ্ঞানবান লোকও অজ্ঞান হয়ে যায়। কাজেই কে এক অসাধু ব্যক্তি কাল রাত্রে কখন যে আমাকে চুরি করতে এসেছিল, আমি তো

মোটেই জানতে পারিনি।”

আশ্চর্য স্বরে বিমল বললে, “তোমাকে চুরি করতে এসেছিল? বল কি?”

—“হ্যাঁ হুজুর, হ্যাঁ। চোরের আস্পর্ধাটা বুঝুন একবার! আমি হলুম গিয়ে সিংহদমন গাটুলা সর্দার, আমি কি মেয়েদের কানের মাকড়ি, নাকের নথ বা হাতের চুড়ি, যে বেমালুম আমাকে চুরি ক'রে নিয়ে যাবে?…কিন্তু হুজুর, এ বড় সোজা চোর নয়—হয় তো এ মানুষই নয়—”

বিমল বাধা দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, “অ্যাঁ, মানুষই নয়!”

—“উহুঁ, মানুষ তো নয়ই, তবে ভূত-প্রেত দৈত্য-দানা কিনা জানি না, তা, আচ্ছা হুজুর, ভূত-প্রেতের গায়ে কি লোম থাকে?

—“তার গায়ে কি লোম ছিল?”

—“সে যখন আমাকে কোলে ক'রে নিয়ে পালাচ্ছিল, তখন আমার ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে কারুকে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল তার গায়ে হাত বুলিয়ে পেলুম খালি রাশি রাশি লোম।”

বিমল রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, “তারপর—তারপর?”

—“তারপর আর কি গাটুলা-সর্দারের সিংহগর্জন—সিংহের কাছ থেকেই আমি গর্জন করতে শিখেছি, শুনে—চারিদিক থেকে লোকজন এসে পড়ল, চোরটাও তখন আমাকে ফেলে অদৃশ্য হ'ল।”

—“কেউ তাকে দেখতে পায়নি?”

—“না।”

—“কিন্তু আমরা যে আসব, সেটা তুমি জানলে কি ক'রে?”

—“জানব না কেন? গাটুলা-সর্দার আজ পঁয়ষট্টি বৎসর এ-অঞ্চলে বিচরণ ক'রে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললে, কিন্তু তাকে চুরি করতে পারে এমন মানুষ সে দেখেনি। আর, তাকে চুরি ক'রে কার লাভ? তাকে চুরি করবেই বা কেন? নিশ্চয় গুপ্তধনের লোভে। সম্রাট্ লেনানার

গুপ্তধনের ভাণ্ডার কোথায়, আমার তা জানা আছে। আর এ-কথা এখন জানেন কেবল সুরেনবাবুর ভাই আর ভাইপো। কাজেই আমি আন্দাজে বুঝেছিলাম যে, এ অঞ্চলে হয়তো আপনাদের কারুর-না-কারুর শুভাগমন হয়েছে!...কিন্তু হুঁসিয়ার।" এই ব'লে চীৎকার ক'রেই গাটুলা বিদ্যুৎ-বেগে সাম্‌নের দিকে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল—এবং পরমুহূর্তে দেখা গেল তার দক্ষিণ হস্তের দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টির ভিতরে এক সুদীর্ঘ ও সুতীক্ষ্ণ বর্শার আবির্ভাব হয়েছে। এ যেন এক ভেল্কিবাজি!

রামহরি বললে, "খোকাবাবু, এ বর্শা তোমাকে টিপ ক'রে ছোঁড়া হয়েছে! কিন্তু, কে এটা ছুঁড়লে!"

বিমল বললে, "যেই ছুঁড়ুক কিন্তু গাটুলা-সর্দার বর্শাটাকে ধ'রে না ফেললে এতক্ষণে আমাকে মাটিতে লোটাতে হ'ত।...নিশ্চয় এ বিষাক্ত বর্শা। সর্দার, তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে। এ-কথা আমি ভুলব না।"

গাটুলা একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আরে—আরে, শীগ্‌গির গাছের আড়ালে এসে দাঁড়ান, দেখছেন না, আরো বর্শা আসছে?"

আরো পাঁচ-ছয়টা বর্শা বিদ্যুৎশিখার মতন এদিক-ওদিক দিয়ে সাঁৎ সাঁৎ ক'রে চ'লে গেল,—সকলে তাড়াতাড়ি একটা প্রকাণ্ড গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল। নিজের হাতের বর্শাটাকে ক্ষণকাল পরীক্ষা ক'রে গাটুলা বললে, "ওয়া-কিকুউ জাতের যোদ্ধারাই এ রকম বর্শা ব্যবহার করে! কিন্তু তারা আমাদের আক্রমণ করলে কেন?"

পনেরো

যক্ষপুরীর কথা

বিমল বললে, "সর্দার, ওয়া-কিকুউ কাদের বলে ?"

গাটুলা বললে, "তারা অসভ্য জাতের লোক, কেনিয়া জেলার কেডং নদীর ধারে তাদের বাস। তারা লড়াই করতে খুব ভালোবাসে, আর ভারী নিষ্ঠুর। কিন্তু তারা এ মুল্লুকে এল কেন, আর আমাদেরই বা আক্রমণ করলে কেন, এটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। আমি হলুম গিয়ে সিংহদমন গাটুলা-সর্দার, আমাকেও তারা ধাঁধায় ফেললে দেখছি।"

বিমল বললে, "কোন ভাবনা নেই সর্দার, তোমার ধাঁধার জবাব এখনি পাবে", ব'লেই সে পকেট থেকে একটা ছোট বাঁশি বার ক'রে খুব জোরে বাজালে।

পর-মুহূর্তে তাঁবুর ভিতর থেকে আস্কারি—অর্থাৎ সশস্ত্র রক্ষীর দল বেগে বেরিয়ে এল।

বিমল হুকুম দিলে, "ঐ জঙ্গলের ভিতর থেকে আমাদের লক্ষ্য ক'রে কারা বর্শা ছুঁড়ছে। তাদের তাড়িয়ে দাও, আর পারো তো তাদের এখানে ধ'রে নিয়ে এস।"

রক্ষীর দল বন্দুক কাঁধে ক'রে চ্যাচাতে চ্যাঁচাতে জঙ্গলের দিকে ছুটল।

গাটুলা বললে, "বা, বাবু-সাহেব, বা! আপনারা লোকজন নিয়ে একেবারে তৈরী হয়ে এসেছেন দেখছি। তাহ'লে গুপ্তধন না নিয়ে আর ফিরবেন না ?"

বিমল বললে, "এই রকম তো আমাদের মনের ইচ্ছে। আর এই জন্যেই তো আমরা তোমার সাহায্য চাই।"

গাটুলা বললে, "সুরেনবাবু-হুজুরের ভাইপো যখন আপনাদের দলে, তখন গাটুলা সর্দার আপনাদের গোলাম হয়ে থাকবে। কিন্তু সম্রাট লেনানার গুপ্তধন তো ছেলের হাতের মোয়া নয়, যে আব্দার ধরলেই পাওয়া যাবে? যার প্রাণের মায়া আছে, সেখানে সে যেতে পারে না।"

বিমল বললে, "আমরা, হাসতে হাসতে প্রাণ দিতেও পারি, নিতেও পারি সর্দার। কিন্তু একটা প্রাণ দেবার আগে দশটা প্রাণ নিয়ে মরব, এটা তুমি জেনে রেখ।"

গাটুলা বললে, "শাবাশ বাবু-সাহেব! আপনার কথা শুনে সিংহ-দমন গাটুলা-সর্দার পরম তুষ্ট হ'ল। কিন্তু—"

এমন সময় রক্ষীরা ফিরে এসে খবর দিলে, জঙ্গলের ভিতরে কারুকে দেখতে পাওয়া গেল না।

বিমল বললে, "তাহলে তারা পালিয়েছে। আচ্ছা, তোমরা যাও।" তারপর গাটুলার দিকে ফিরে বললে, "কিন্তু কি বলছিলে সর্দার?"

গাটুলা বললে, "কিন্তু হুজুর, সম্রাট্ লেনানার গুপ্তধন যেখানে আছে, সেখানে মানুষ যেতে পারে না।"

বিমল বললে, "তুমি কি বলছ সর্দার, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সে গুপ্তধন কি শূন্যে আছে, না পাতালে আছে, যে মানুষ সেখানে যেতে পারবে না?"

গাটুলা বললে, "হুজুর, এখন তো আকাশেও মানুষ যাচ্ছে, পাতালেও মানুষ যাচ্ছে; সুতরাং আকাশ-পাতালের কথা কি বলছেন? আকাশে কি পাতালে এ-গুপ্তধন থাকলে এতদিনে মানুষ নিশ্চয়ই তা' লুটে আনত,—কিন্তু এ আকাশও নয়, আর পাতালও নয়, আর সেইটেই তো হচ্ছে দুঃখের কথা।"

বিমল কিঞ্চিৎ অধীর-স্বরে বললে, "সর্দার, তুমি ত' বেশি কথার মানুষ নও, যা ব'লতে চাও, অল্প কথায় গুছিয়ে বল।"

গাটুলা সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে রহস্যময় ভাবে অস্ফুটস্বরে থেমে থেমে বললে, "সম্রাট্ লেনানার সে-গুপ্তধন হচ্ছে, যখের ধন।"

—"যখের ধন ?"

—"হ্যাঁ হুজুর, যখের ধন। কিন্তু এ এক-আধ জন যখ নয়,—হাজার-দু' হাজার যখ !"

—"কী তুমি বলছ, গাটুলা ?"

গাটুলা তার ভয়-মাখানো দৃষ্টি দূরে—বহু দূরে—স্থাপন ক'রে, কেমন যেন আচ্ছন্নভাবে বললে, "হাজার-দু' হাজার যখ—কতকাল, কত যুগ আগে থেকে কাবাগো-পাহাড়ের বিপুল সেই অন্ধকার গুহার ভেতরে ব'সে ব'সে এই গুপ্তধনের উপর কড়া পাহারা দিয়ে আসছে, তার ঠিক হিসেব কেউ জানে না। মানুষ তো ছাড়, বোধকরি দেবতা-দানবও সেখানে পা বাড়াতে ভরসা পায় না। তার ভেতরে ত' দূরের কথা, কোন মানুষ তার আশ-পাশ দিয়েও হাঁটতে চায় না।······কতবার কত লোক গুপ্তধনের লোভে সেখানে গিয়েছে—কিন্তু যারা গিয়েছে, তারা গিয়েছেই, প্রাণ নিয়ে তাদের কেউ আর ফিরে আসেনি। এই তিরিশ বছর আগেই আট-দশ জন সায়েব অনেক তোড়-জোড় ক'রে গুপ্তধন আনতে গিয়েছিল। শোনা যায়, গুপ্তধনের সন্ধানও তারা পেয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তারপর যে তাদের কি হ'ল, কর্পূরের মতন তারা যে কোথায় উবে গেল কেউ তা বলতে পারে না। কেবল একজন সায়েবকে ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে ফিরে আসতে দেখা গিয়েছিল কিন্তু পাগল অবস্থায়।···যুগ যুগ ধ'রে এই যে শত শত লোভী মানুষ গুপ্তধন আনতে গিয়ে প্রাণ খুইয়েছে, গুহার বাইরে, চারিদিকের নিবিড় অরণ্যে অরণ্যে, আজও তাদের অশান্ত আত্মা নাকি হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। প্রতি রাত্রে নাকি তাদের অমানুষিক কান্না শুনে বাঘ-সিঙ্গীরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গর্জন ভুলে যায়—"

বিমলের পাশ থেকে হঠাৎ কে ব'লে উঠল, "বাবা, বল কি !"

বিমল ফিরে দেখে বললে, "এই যে, মাণিকবাবু যে। আপনি কখন এলেন এখানে ?"

—"আমি কখন এসেছি, আপনারা দেখতে পাননি, গল্প শুনতেই

মত্ত হয়ে আছেন।...কিন্তু এ-লোকটি কে? এ যা বলেছে, তা কি সত্যি? সত্যি হ'লে তো ভারী সমস্যার বিষয়।"

—"কিছুই সমস্যার বিষয় নয়। কারণ আমি ভূত মানি না। আর যখের নাম শুনলেও ভয় পাবার ছেলে আমি নই।"

—"কিন্তু বিমলবাবু, আমি ভূতও মানি, যখেও বিশ্বাস করি।"

—"তাতে আমার কিছু এসে যায় না।"

—"কিন্তু আমার বিলক্ষণই এসে যায়। গুপ্তধনের লোভে ভূত-প্রেতের হাতে প্রাণ খোয়াতে আমি রাজি নই।"

—"কিন্তু মাণিকবাবু, সে-সমস্যার সমাধান তো আমি আগেই ক'রে দিয়েছি! আপনার যদি ইচ্ছে না থাকে, আপনি তো অনায়াসেই দেশে চ'লে যেতে পারেন।"

—"ধন্যবাদ। কথাটা আপনি যত সহজে বল্‌ছেন; কাজে সেটা ততটা সহজ হবে না বোধহয়। এ তো মামার বাড়ী থেকে বাপের বাড়ী যাওয়া নয়, এ সাত-সমুদ্দুর পেরিয়ে আফ্রিকা থেকে বাংলাদেশে যাওয়া। তার ওপর বনের বাঘ-সিঙ্গীর কথা ছেড়ে দি, পথে যদি ঘটোৎকচের দলের সঙ্গে একবার দেখা হয়ে যায়, তাহ'লে—বাপ্‌রে—"

—"হুঁ, তাহ'লে ব্যাপারটা যা দাঁড়াবে, আন্দাজেই আমি সেটা বুঝতে পারছি। সুতরাং বেশি আর গোল করবেন না, সুড়্‌ সুড়্‌ করে লক্ষ্মী ছেলেটির মতন আমাদের সঙ্গে চলুন।"

মাণিকবাবু কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন, "হা অদৃষ্ট, আমার কপালে শেষটা এই ছিল গা! সিঙ্গীর মুখ থেকেও বেঁচে ফিরেছি, কিন্তু এবারে ভূতের হাতে প'ড়েই আমার বুঝি দফা রফা হ'ল!"

রামহরি এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে শুনছিল। এতক্ষণে সে-ও এগিয়ে এসে বললে, "খোকাবাবু, মাণিকবাবু ঠিক কথাই বলেছেন, আর এ নতুন বিপদের ভেতরে তুমি যেয়ো না, লক্ষ্মীটি।"

গাটুলা মাণিকবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "এ ভদ্দরলোকটি কে, হুজুর?"

বিমল বললে, "ইনিই তোমার সেই সুরেনবাবুর ভাইপো।"

গাটুলা প্রকাণ্ড মুখে প্রকাণ্ড একটা হাঁ ক'রে সবিস্ময়ে বললে, "সুরেনবাবু-হুজুরের ভাইপো। অমন সাহসী লোকের এমন ভীতু ভাইপো! আমি বিশ্বাস করি না!"

বিমল বললে, "না সর্দার, বাঙালী কখনো ভীতু হয় না। মাণিকবাবুও ভীতু নন, তবে দেশের জন্যে ওঁর মন কেমন করছে ব'লেই উনি এমনি সব নানান মিথ্যে ওজর তুলছেন।"

গাটুলা বললে, "ও, বুঝিছি! আমারও অমন হয়। আমি হলুম গিয়ে সিংহদমন গাটুলা সর্দার, কিন্তু বিদেশ-বিভুঁয়ে গেলে বলব কি হুজুর, বৌ-এর জন্যে আমারও মন কেমন করে।" এই ব'লেই সে তার প্রকাণ্ড হাত দু'খানা দিয়ে মাণিকবাবুকে নিজের বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বললে, "আপনি হচ্ছেন আমার প্রভু সুরেনবাবু-হুজুরের—তাঁর আত্মা স্বর্গলাভ করুক—ভাইপো! আসুন, আপনাকে আমি আলিঙ্গন করি।"

বিমল ব'সে ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "তাহ'লে গাটুলা সর্দার, আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার কোন আপত্তি হবে না, বোধহয়? যে-সব বিপদ-আপদের কথা বললে, আমি বাঙালীর ছেলে, সে-সব বিপদ-আপদকে আমি একটুও গ্রাহ্য করি না। বিপদকে আমি ভালবাসি, ছুটে গিয়ে বিপদের ভেতরে আমি ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই! বিপদের কথা নিয়ে যারা বেশি মাথা ঘামায়, বিপদ আগে আক্রমণ করে তাদেরই!"

গাটুলা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "শাবাশ, শাবাশ! এই তো মরদকা বাত্! আমি সাহসীর গোলাম, আপনারা যেখানে যাবেন, আমি সেইখানেই আপনাদের সঙ্গে যাব।"

বিমল বললে, "তাহ'লে কালকেই আমরা কাবাগো-পাহাড়ের দিকে যাত্রা করব। ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, যে যেখানে আছে সকলকেই আমি আমন্ত্রণ করছি, তারা পারে তো আমাদের বাধা দিয়ে দেখুক!"

মাণিকবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, "ও বাবা, বলেন কি!"

ষোলো

যক্ষপুরীর রক্ষী

চলেছে সকলে দল বেঁধে যক্ষপুরীর দিকে—যেখানে যুগ-যুগান্তরের গুপ্তধন ভাগ্যবানের জন্যে অপেক্ষা করছে, যেখানে হাজার হাজার যক্ষ সেই ধন-রত্নের উপরে বুক পেতে ব'সে আছে, যেখানে শত শত অভিশপ্ত অশান্ত আত্মা উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে আকাশ-বাতাসকে কাতর ক'রে তুলেছে।

টাঙ্গানিকা হ্রদের ধার দিয়ে বিমলদের এই মস্ত দলটি কোলাহল করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে! সর্বাগ্রে চলেছে গাটুলা সর্দারের নিজের লোকজন,—গুনতিতে তারা পঁচাত্তরের কম নয়। তারপর যাচ্ছে বিমল-দের দল, সংখ্যায় তারাও একশো চব্বিশ জন। আস্কারি বা বন্দুকধারী রক্ষীরা দলের চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে, কারণ কখন কোন্‌দিক থেকে বিপদ এসে হাজির হয় কেউ তা বলতে পারে না। আস্কারি ছাড়া অন্য সকলের কাছে বন্দুক নেই বটে, কিন্তু দলের সামান্য কুলিরা পর্যন্ত সশস্ত্র,—কারুর কাছে খালি বর্শা, কারুর কাছে বর্শা ও তীর-ধনুক দুই-ই। এ হচ্ছে আফ্রিকার বনপথ, এখানে অস্ত্র ছাড়া কেউ এক পা হাঁটতে ভরসা করে না।

মাঝে মাঝে পাহাড়, মাঝে মাঝে অরণ্য এবং মাঝে মাঝে ধান, আখ, আলু বা অন্যান্য শাক-সব্জি ও শস্যের ক্ষেত দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এক-একটা নদী এসে টাঙ্গানিকার বিপুল বুকের ভিতরে হারিয়ে যাচ্ছে। সে-সব জায়গায় আকাশে উড়ে পালাচ্ছে জল-মুর্গির দল এবং জলে খেলা করছে কিম্ভূতকিমাকার হিপোপটেমাসের দল আর ডাঙা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মস্ত মস্ত কুমির।

কিন্তু বন, পাহাড়, নদী ও শস্যক্ষেত পেরিয়ে অশ্রান্ত দেহে চলেছে এই দুই শতাধিক মনুষ্য,—পথের নেশা আজ যেন তাদের মনকে মাতিয়ে

ফুলেছে এবং কোথায় গিয়ে যে তাদের নেশার ঘোর কাটবে, দলের সেরা সেরা দু-চারজন লোক ছাড়া আর কেউ তা জানে না।

দলের ভিতরে সব চেয়ে বেশি ফাঁপরে পড়েছেন বেচারা মাণিকবাবু। তাঁর আরামের শরীর, কলকাতায় থাকতে মোটর ছাড়া তিনি এক পাও চলতে পারতেন না, আর হাঁটতে হাঁটতে আজ তাঁর ননীর দেহের দুর্গতির সীমা নেই। মাঝে মাঝে "ও বাবা, গেলুম যে" ব'লে তিনি ধপাস ক'রে ব'সে প'ড়ে হাপরের মতন হাঁপাতে থাকেন, কিন্তু হায় রে, আশ্ মিটিয়ে বেশিক্ষণ কি হাঁপাবারও যো আছে? দলের লোকগুলো এমন নিষ্ঠুর যে, তাঁর মুখ চেয়ে কেউ একটুও অপেক্ষা করতে রাজি হয় না! কাজেই দলছাড়া হবার ভয়ে আবার তাঁকে উঠে হাঁসফাঁস করতে করতে ছুটতে হয়। মনের ব্যথা কারুর কাছে প্রকাশ ক'রেও লাভ নেই, কারণ তাঁর কথা শুনে বিমল ও কুমার খালি হা-হা ক'রে হাসতে থাকে!

তবে টাঙ্গানিকার জলে যে-সব মাছ ও নদীর মুখে মুখে যে-সব জল-মুর্গি পাওয়া যাচ্ছে, তাদের মাংস যে অতীব উপাদেয়, এত দুঃখেও মাণিকবাবুকে হাসিমুখে সে-কথা বারবার স্বীকার করতে হচ্ছে।

সেদিন তিনটে জল-মুর্গির 'রোষ্ট্' উদরস্থ ক'রে মাণিকবাবু প্রসন্ন মুখে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বললেন, "হ্যাঁ, এ পৃথিবীতে নিছক্ দুঃখ ব'লে যে কিছুই নেই, সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি।"

কুমার বললে, "এত-বড় সত্যি কথাটা ফস্ ক'রে বুঝে ফেললেন কেমন ক'রে মাণিকবাবু?"

মাণিকবাবু ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "ও বাবা, তা আর বুঝব না? এই হাড়ভাঙ্গা হাঁটুনিতে আর খাটুনিতে এতদিনে নিশ্চয়ই আমি অক্কা লাভ করতুম, কিন্তু বেঁচে আছি এই চপ্, কাট্‌লেট, রোষ্টের জোরে। এমনি পেট-ভরা খানা যদি জোটে—"

—"তাহ'লে কাবাগো-পাহাড়ের ভূতের দলও আপনার কিছুই করতে পারবে না, কেমন মাণিকবাবু, আপনি এই কথাটি বলতে চান তো?"

মাণিকবাবু অমনি মুখ ম্লান ক'রে বললেন, "ঐ তো! ঐ তো

আপনাদের দোষ। সুখের সময়ে ও-সব ভূত-প্রেতের কথা মনে করিয়ে দেন কেন, বদ্‌হজম হবে যে।"

—"যাদের নামেই আপনার বদ্‌হজম হয়, তাদের কাছে গেলে আপনি কি করবেন?"

—"ও বাবা, বলেন কি! আমি যাব তাদের কাছে? আমার বয়ে গেছে। পাতে দু-চারখানা কাটলেট-টাটলেট দিয়ে আপনারা যদি আমাকে আড়ালে কোন নিরাপদ জায়গায় বসিয়ে রাখেন, তাহ'লেই আমি খুশি থাকব! ভূত-প্রেতের সঙ্গে আলাপ করবার শখ আমার মোটেই নেই।"

কাবাগো-পাহাড়ের কালো চুড়ো দেখা গেল, সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

সূর্য অস্ত যাবার পরেই পশ্চিম আকাশের রক্তাক্ত বুকের উপরে নিবিড় কাজলের প্রলেপের মতন একখানা প্রকাণ্ড মেঘের কালো আবরণ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল।

গাটুলা বললে, "বিমলবাবু, এইবারে আপনারা এমন একটা দৃশ্য দেখবেন, জীবনে যা কখনও দেখেননি। টাঙ্গানিকার ওপরে মেঘের খেলা দেখলে সায়েবরা ভারী সুখ্যাতি করে। আমি সিংহদমন গাটুলা সর্দার, আমিও বলছি, সত্যিই সে এক আশ্চর্য দৃশ্য।"

বিমল বললে, "কিন্তু গাটুলা, ঝড়-বৃষ্টি আসবার আগেই আমাদের ছাউনি পাত্‌তে হবে যে।"

গাটুলা বললে, "আমি হলুম গিয়ে সিংহদমন গাটুলা সর্দার, আমার কাজে আজ পর্যন্ত কেউ খুঁৎ ধরতে পারেনি। ছাউনি পাত্‌বার ব্যবস্থা না ক'রেই কি মেঘের খেলা দেখে আশ্চর্য হতে এসেছি?"

ঘন ঘন বিদ্যুৎ-ভরা মেঘখানা ক্রমেই এগিয়ে আসছে আর মনে হচ্ছে একটা বিরাট কৃষ্ণদৈত্য যেন অগ্নিময় দন্ত বিকাশ করতে করতে সারা-আকাশকে গিলে ফেলতে চাইছে।...অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত আকাশ মেঘে চাপা প'ড়ে গেল, টাঙ্গানিকার নীলিমা দেখতে দেখতে কালিমায়

আচ্ছন্ন হয়ে গেল। গুরু গুরু বাজের আওয়াজে সৃষ্টির আর-সব শব্দ যেন বোবা হয়ে পড়ল এবং বাজের ডাক শুনে যেই ঝড়ের ঘুম ভাঙল, অমনি অরণ্যের যত গাছপালা পাগল হয়ে তাণ্ডব নাচ শুরু ক'রে দিলে।

অশান্ত টাঙ্গানিকার জলে সে কী তোল্পাড়। পাতাল-কারাগারের ভিতর থেকে যেন কোন্ অতিকায় দানব জলের ঢাকা ঠেলে উপরে উঠতে চায়।

মেঘের পটে বিদ্যুৎ-লতার ডালপালাগুলো থেকে থেকে চোখ ধাঁধিয়ে দেখা দিচ্ছে আর মনে হচ্ছে, তারা কোন অশরীরীর অদৃশ্য দেহের জ্বলন্ত সব শিরা উপশিরা।

গাটুলা ঠিক বলেছে, মেঘের যে এমন ঘনকাজল রং হ'তে পারে, বিদ্যুতের তীব্র খেলা যে এত দ্রুত হ'তে পারে এবং বজ্রের গর্জন যে এত ভীষণ ও উচ্চ হ'তে পারে, বিমল বা কুমার আগে তা জানত না। কিন্তু এ ভয়াবহ সৌন্দর্য তারা বেশিক্ষণ উপভোগ করতে পারলে না, বিষম ঝড়ের ঝাপ্টায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে তারা বনের ভিতর দিয়ে ছুট্তে ছুট্তে পাহাড়ের তলায় যেখানে ছাউনি পাতা হয়েছে, সেইখানেই গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

ঘণ্টাখানেক পরে ঝড় থামল, বৃষ্টি শুরু হ'ল।

তাঁবুর ভিতরে তখন পরামর্শ-সভা বসেছে।

বিমল বলছিল, "এই তো আমরা কাবাগো-পাহাড়ের কাছে এসে পৌঁছেছি। এখন—"

বাধা দিয়ে গাটুলা বললে, "আমরা কাবাগো-পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছি বটে, কিন্তু গুপ্তধন যত তফাতে ছিল, ঠিক তত তফাতেই আছে।"

—"তার মানে?"

—"তার মানে হচ্ছে, কাবাগো-পাহাড়ে উঠতে গেলেই গুপ্তধনের রক্ষীরা আমাদের আক্রমণ করবে। কোন বিদেশীর সে পাহাড়ে ওঠবার অধিকার নেই, কারণ, সে হচ্ছে পবিত্র পাহাড়।"

—"এই রক্ষীরা কোন্ জাতের লোক?"

—"তাদের দেহে জুলু-রক্ত আছে বটে, কিন্তু তারা খাঁটি জুলু নয়।"

—"তারা কি দলে বেশ ভারী ?"

—"তা হাজার-ছয়েক হবে। তবে ভরসা এই, তাদের অস্ত্র কেবল ঢাল, তরোয়াল, বর্শা, যুদ্ধ-কুঠার আর তীর-ধনুক। তাদের দলে দু'এক-টার বেশি বন্দুক নেই—তাও সেকেলে বন্দুক।"

—"এ খুব ভালো কথা। তোমার আর আমাদের দলে বন্দুক আছে চল্লিশটা। তবে আর ভয় কিসের ?"

—"তারা যদি পাহাড়ের আড়াল থেকে তীর আর বর্শা ছোঁড়ে, তাহ'লে কি করবেন ?"

—"তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।"

—"মানলুম। কিন্তু রক্ষীদের হাত থেকে পার পেলেও রক্ষে নেই, তারপর আছে যক্ষের দল, তারা পাহারা দেয় গুহার ভিতরে। সেই গুহাকে খালি গুহা বললে ভুল হবে, সে হচ্ছে প্রকাণ্ড এক গুহা-নগর। সে গুহা-নগরে কি আছে আর কি নেই, আমি তা জানি না—কেউ তা জানে না। আমি সেই গুহা-নগরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছি। গুহার রক্ষীরাও ভিতরে ঢুকতে পায় না, ঢুকতে সাহসও করে না। কারণ ভিতরে আছে যক্ষের দল।"

বিমল অধীর স্বরে বললো, "সর্দার, আমি বার বার বলছি, ও-সব যখ-টক আমি বিশ্বাস করি না, সুতরাং ও-সব বাজে কথা শুনতেও আমি রাজী নই। আজ তুমি বিশ্রাম কর-গে যাও, কাল সকালে আমরা কাবাগো-পাহাড়ে গিয়ে উঠব,—কারুর বাধা মানব না।"

গাটুলা সর্দার আর কোন কথা না ব'লে বাইরে গেল।

রাত্রে হঠাৎ বিমলের ঘুম ভেঙে গেল—তার গা ধ'রে কে নাড়া দিচ্ছে।

চোখ মেলে দেখে, একটা লণ্ঠন হাতে ক'রে গাটুলা সর্দার তার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

—"কি ব্যাপার সর্দার ? এমন সময়ে ডাকাডাকি কেন ?"

—"একবার বাইরে আসুন !"

বিমল বিছানা ছেড়ে গাটুলার সঙ্গে তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার রাত। তখনো অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে ও মাঝে মাঝে বাজ ডাকছে।

গাটুলা বললে, "কিছু শুনতে পাচ্ছেন ?"

—"হ্যাঁ, বাজ ডাকছে।"

—"বাজ নয়, বাজ নয় ! ভালো ক'রে শুনুন।"

বিমল কান-পেতে শুনতে লাগল। দূরে,—খুব দূরে যেন কিসের শব্দ হচ্ছে !

—"হুঁ, একটা শব্দ শুনছি বটে। ও কিসের শব্দ, সর্দার ?"

—"অসংখ্য ঢাক-ঢোলের আওয়াজ !"

—"ঢাক-ঢোল ! এই নিবিড় বনে ঢাক-ঢোল বাজায় কারা ?"

—"কাবাগো-পাহাড়ের রক্ষীরা। তারা যুদ্ধের বাজনা বাজাচ্ছে।"

—"কেন ?"

—"যুদ্ধের বাজনা বাজাতে বাজাতে তারা আমাদের দিকেই আসছে। তারা নিশ্চয়ই খবর পেয়েছে যে, গুপ্তধনের ভাণ্ডার লুঠ করবার জন্যে আমরা এখানে এসে হাজির হয়েছি।"

দূরে ঢাকের আওয়াজ ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে লাগল,—ক্রমে আরো, আরো স্পষ্ট !

হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ ! যেন চার-পাঁচশো ঢাক-ঢোল বাজাতে বাজাতে তালে তালে পা ফেলে কারা এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে !

হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ ! ক্রমে সেই সঙ্গে একটা অস্পষ্ট কোলাহলও শোনা গেল। খানিক পরে বোঝা গেল, তা কোলাহল নয়—বহুকণ্ঠের সঙ্গীত ! যেন হাজার-হাজার কণ্ঠ দামামার তালে তালে সুগম্ভীর যুদ্ধসঙ্গীত বা জাতীয় সঙ্গীত গাইছে।

হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ ! ঢাক-ঢোলের শব্দে আর ঐকতান-

সঙ্গীতে ক্রমে সারা বনভূমি গম্ গম্ করতে লাগল। তারপর আবার আর-এক শব্দ! ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্! সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বুক যেন কাঁপতে লাগল—ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্! মাটির উপরে তালে তালে পড়ছে হাজার হাজার সৈনিকের পা!

গাটুলা হাসতে হাসতে বললে, "এখন বুঝছেন বিমলবাবু, গুপ্তধনের আশা কত-বড় দুরাশা?"

বিমল চুপ ক'রে দেখতে লাগল, অন্ধকারে আবছায়ার মত দলে দলে হাতী, গণ্ডার, হিপো, সিংহ, হায়েনা, হরিণ, জিরাফ ও শৃগালেরা উদ্‌ভ্রান্তের মত চারিদিকে ছুটে পালাচ্ছে। বনের ভিতরে কত-বড় বিরাট বাহিনী দেখে যে তারা এতটা ভয় পেয়েছে, সে-কথা বুঝতে বিমলেরও বিলম্ব হ'ল না!

তারপরে বন-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে অনেক দূরে দেখা গেল চার-পাঁচশো মশালের আলো!

গাটুলা গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "বিমলবাবু, এখনো প্রাণ নিয়ে পালাবার সময় আছে!"

বিমল প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে গাটুলার দিকে তাকিয়ে বললে, "বাঙালীর ছেলে প্রাণ নিয়ে পালাতে শেখেনি, সর্দার! আমরা যুদ্ধ করব!"

গাটুলা বিমলকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, "বাহাদুর মরদের বাচ্চা, তোমার সঙ্গে ম'রেও আমোদ পাওয়া যাবে!"

বিমল বিপদ জানাবার জন্যে বাঁশী বার ক'রে খুব জোরে ফুঁ দিলে—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর ভিতরে দুশো লোকের ঘুম ভেঙে গেল।

সতেরো

দুইফোঁড় বিপদ

ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ পা পড়ে মাটির উপরে তালে তালে,—আর টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ কাঁপতে থাকে পৃথিবীর বুক! আর সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে শত শত ঢাকের বাদ্যি!

বিমলের সঙ্গের দুই শত লোক বিছানার ওপরে সচকিতে জেগে ব'সে দুরু দুরু প্রাণে কান পেতে শুনতে লাগল, সেই দুই হাজার অসভ্য বন্য-সৈনিকের চার হাজার পায়ের শব্দ ও চার-পাঁচশো ঢাক-ঢোলের বিষম গণ্ডগোল!

আবার বিমলের বাঁশী বেজে উঠল। দুই শত লোক তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল!

শত্রুদের অসংখ্য মশালের সামনে থেকে অরণ্যের নিবিড় অন্ধকার ক্রমেই পিছু হ'টে আসতে লাগল।

খুব চীৎকার ক'রে বিমল বললে, "কেউ আলো জ্বেলো না! বন-জঙ্গলের আড়ালে গা ঢেকে সবাই ছড়িয়ে প'ড়ে দাঁড়াও! প্রত্যেক দু-তিনজন লোকের পরে এক একজন ক'রে বন্দুকধারী আস্কারি থাক! আর গাটুলা সর্দার! তুমি দেখ আমার হুকুম মত কাজ করা হয় কিনা।"

দূরে দূরে বনের আলোকিত অংশে দলে দলে কালো কালো প্রায় ন্যাংটো মূর্তি দেখা গেল। তাদের হাতের চক্চকে বর্শা ও তরোয়াল প্রভৃতি অস্ত্র ক্রমাগত বিদ্যুৎ সৃষ্টি করছে! মূর্তির পরে মূর্তির সারি—শত্রুদলের যেন অন্ত নেই! তারা ঢোল বাজাচ্ছে আর নৃত্য করছে, প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে আর গান গাইছে। সারা পৃথিবীর শ্মশান-মশানকে

ভূতশূন্য ক'রে আজ যেন সমস্ত ভূত এই জঙ্গলে এসে একজোট হয়েছে।

গাটুলা একদৃষ্টিতে শত্রুদের দিকে তাকিয়ে একমনে কি ভাবছিল।

বিমল তার গা ধ'রে নাড়া দিয়ে বললে, "সর্দার, এখন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নেই,—যা বললুম কর।"

গাটুলা সহাস্যে বললে, "বিমলবাবু, তুমি তাহ'লে সত্যিই যুদ্ধ করবে?"

বিমল বললে, "যুদ্ধ করব না তো কি করব? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতেও পারব না, আর কাপুরুষের মতন পালাতেও পারব না!"

গাটুলা বললে, "আচ্ছা, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকো, আর আমি কি করি দেখ!—এই ব'লে সে ফিরে দাঁড়িয়ে হুকুম দিলে, "বন্ধুগণ! তোমরা তাড়াতাড়ি তাঁবু তুলে জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নাও। তারপর আলো-গুলো জ্বেলে ফেলো। তারপর খুব চীৎকার করতে করতে যে-দিক দিয়ে আমরা এসেছি সেইদিকেই ছুটতে শুরু কর।"

বিমল বললে, "সর্দার, সর্দার! এ তুমি কী বলছ? আমরা পালা-বার জন্যে এতদূর আসিনি!"

গাটুলা কঠিন স্বরে বললে, "বিমলবাবু, চুপ কর, আমাকে বাধা দিও না!...খামিসি, খামিসি!"

একজন আরবী-লোক ছুটে গাটুলার সামনে এসে দাঁড়াল।

গাটুলা বললে, "খামিসি, তুমি আমার ডান হাত, সিংহদমন গাটুলা সর্দারের কথা মত কাজ করতে তুমি পারবে। এই সমস্ত লোকের ভার আমি তোমাকেই দিলুম। এদের দিয়ে তুমি খুব সোরগোল করতে করতে পিছিয়ে পড়ো আর মাঝে মাঝে বন্দুক ছোঁড়ো—কিন্তু খবরদার, দাঁড়িয়ে কোথাও লড়াই করো না। হিপোনদীর ধারে সেই যে গুপ্তস্থান, তার কথা তুমিও জানো। একেবারে সদলবলে সেইখানে গিয়ে হাজির হও,—সেখানে গেলে শত্রুরা তোমাদের কিছুই করতে পারবে না। সেইখানে গিয়ে তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে।"

খামিসি বললে, "যো হুকুম।"

কুমার এগিয়ে এসে বললে, "সর্দার, আমি কিন্তু পালানো-দলে নেই, পালাতে কোনদিন শিখিনি।"

রামহরি বললে, "কে পালাবে, আর কে পালাবে না, আমি তা জানতে চাই না। আমি কেবল খোকাবাবুর সঙ্গে থাকতে চাই।" এই ব'লে সে বিমলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

গাটুলা হেসে বললে, "আমি যা করব, তোমরাও তাই করবে। তোমরা যে পালাতে চাইবে না, সে কথা আমিও জানি!"

ইতিমধ্যে বনের ভিতর থেকে তাঁবুগুলো অদৃশ্য হয়েছে, এবং পেট্রোলের উজ্জ্বল লণ্ঠনগুলো চতুর্দিক আলোকিত ক'রে তুলেছে!

শত্রুরা ততক্ষণে আরো কাছে এসে পড়েছে।

আলো দেখে তাদের চীৎকার, নৃত্য, আস্ফালন ও ঢাকের বাদ্যি দ্বিগুণ হ'য়ে উঠল, দু-চারটে বন্দুকের আওয়াজও শোনা গেল।

বিমল বিরক্ত স্বরে বললে, "সর্দার, তোমার উদ্দেশ্য কি, আগে আমাকে বল!"

গাটুলা বললে, "আমাকে কিছুই বলতে হবে না। এখুনি যা হবে, চোখের সাম্‌নেই তুমি তা দেখতে পাবে।"

খামিসি তখন তার লোকজনদের নিয়ে চীৎকার করতে করতে ছুটতে শুরু করেছে এবং আস্কারিরা মাঝে মাঝে শত্রুদের লক্ষ্য ক'রে বন্দুকও ছুঁড়ছে!

গাটুলা বললে, "বিমলবাবু, এখন আমাদের এক-একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে লুকিয়ে পড়া উচিত। শত্রুরা আমাদের দেখতে পেলে সব কৌশলই ব্যর্থ হবে।"

বিমল, কুমার, রামহরি ও গাটুলা এক-একটা ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। বাঘাও কুমারের সঙ্গ ছাড়লে না।

ঝোপের ভিতরে গা-ঢাকা দিয়ে বিমল দেখতে লাগল, খামিসির সঙ্গে তাদের নিজেদের লোকজনেরা যেই উল্টোদিকে পলায়ন শুরু করলে, শত্রুপক্ষের ভিতর থেকে অমনি একটা গগনভেদী জয়ধ্বনি জেগে

সেই বিশাল অরণ্যকে কাঁপিয়ে তুললে। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের গতি গেল বদ্‌লে। খামিসির লোকজনেরা যে-দিকে পালাচ্ছে, তারাও সে-দিকে ছুটতে আরম্ভ করলে!

এতক্ষণে বিমল গাটুলার চাতুরী বুঝতে পারলে। গাটুলা বিনাযুদ্ধে ও রক্তপাতে কাবাগো-পাহাড়ে যাবার পথ পরিষ্কার করতে চায়। শত্রু-পক্ষ এখন খামিসির দলের পিছনেই লেগে থাকবে এবং এই অবকাশে তারাও নিরাপদে—বিনা বাধায় কাবাগোর রক্ষীহীন রত্নগুহার দ্বারদেশে গিয়ে উপস্থিত হ'তে পারবে।

গাটুলার এই আশ্চর্য চালাকি দেখে বিমল একেবারে অবাক্ হয়ে গেল! এবং এই বৃদ্ধ সর্দারের জন্যে তার মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির সঞ্চার হ'ল।

রত্ন-গুহার যাত্রা-পথ পরিষ্কার হ'ল বটে, কিন্তু গাটুলার কথা যদি সত্য হয়, তবে সেই গুহার ভিতরে কোন একটা অলৌকিক বিপদ নিশ্চয়ই তাদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে! কী যে সেই বিপদ এবং কি ক'রে যে সেই বিপদ এড়িয়ে কেল্লা ফতে ক'রে আবার তারা ফিরে আসবে এবং কেমন ক'রে তখন আবার তারা দুই হাজার উন্মত্ত রক্ষী-সৈন্যকে বাধা দান করবে, বিমল ব'সে ব'সে সেই কথাই খালি ভাবতে লাগল।

এ দিকে অরণ্য আবার ধীরে ধীরে নীরবতায় ও অন্ধকারের নিবিড়-তায় আচ্ছন্ন হয়ে আসছে!

বহু দূর থেকে ভেসে আসছিল কেবল একটা অস্পষ্ট গোলমাল ও মাঝে মাঝে বন্দুকের শব্দ এবং একটা সুদীর্ঘ আলোক-রেখার আভাস। শত্রুরা খামিসির দলের পিছনে বোকার মত ছুটছে এবং কালকেও হয়তো এ ছোটাছুটি শেষ হবে না!

বিমল একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেললে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনেও কে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলে!

সচমকে পিছনে ফিরে বিমল কিছুই দেখতে পেলে না, অন্ধকার শুধু কালো কষ্টিপাথরের মতন জমাট হয়ে আছে!

তার ডান পাশে কি একটা অস্পষ্ট শব্দ হ'ল—বিমলও চট্ ক'রে পাশ ফিরে বসল। চারিদিকে হাত বাড়িয়ে একবার হাতড়ে দেখলে, কিন্তু হাতে তার কিছুই ঠেক্‌ল না।

ঝোপের বাহির থেকে গাটুলার গলা শোনা গেল—"সবাই বেরিয়ে এস, পথ সাফ্।"

বিমল উঠে দাঁড়াল এবং সেই সঙ্গেই প্রকাণ্ড একটা দেহ বিপুল বেগে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই অতর্কিত আক্রমণের টাল সামলাবার আগে বজ্রের মতন দু'খানা হাত তার টুঁটি টিপে ধরলে এবং প্রাণপণ চেষ্টাতেও বিমল সেই অদৃশ্য বাহুপাশ থেকে আপনাকে মুক্ত করতে পারলে না,—দেখতে দেখতে তার দম বন্ধ হয়ে এল, তার দুই চোখ কপালে উঠল!

কিন্তু সেই অবস্থাতেও বিমল বুঝতে পারলে, যে তাকে ধরেছে সে জন্তুও নয়, মানুষও নয়, অথচ তার গায়ে ও হাতে জানোয়ারের মতন লম্বা লম্বা লোম আছে।

ধীরে ধীরে এই অমানুষিক শত্রুর সাংঘাতিক আলিঙ্গনের মধ্যে বিমলের সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে গেল।

আঠারো

রত্ন-গুহার বিভীষিকা

গাটুলা চেঁচিয়ে ডাকলে, "সবাই বেরিয়ে এস, পথ সাফ্।"

কুমার, রামহরি ও সঙ্গে সঙ্গে বাঘা ঝোপ ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল এবং তারপরেই "ওরে বাপ্‌রে" ব'লে বিকট এক আর্তনাদ ক'রে একটা গাছের উপর থেকে কে মাটির উপরে সশব্দে আছড়ে পড়ল। সবাই ছুটে গিয়ে দেখে, মাণিকবাবু।

কুমার বললে, "একি মাণিকবাবু, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?"
মাণিকবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "ঐ গাছের ওপরে!"

—"গাছের ওপরে! কেন?"

—"শত্রুদের আসতে দেখে আমি ঐ গাছের ওপরে উঠে লুকিয়ে-ছিলুম।...কিন্তু—"

—"কিন্তু কি?"

মাণিকবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "কিন্তু তখন কি আমি জানতুম যে, গাছের পাশের ঝোপেই ভূতের বাসা আছে?"

কুমার বললে, "কি আপনি বলছেন মাণিকবাবু, আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?"

মাণিকবাবু বললেন, "পাগল এখনো হইনি বটে, তবে আপনাদের পাল্লায় প'ড়ে আমার পাগল হ'তেও আর বেশি দেরি নেই বোধ হয়। আমি দেখলুম স্বচক্ষে ভূত, আর আপনি আমাকে বলছেন, পাগল?"
—"যাক বাজে কথা। আপনি কি দেখেছেন আগে তাই বলুন!"

—"একটু আগেই মেঘের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলো ফুটেছিল। সেই আলোতে দেখলুম, ঐ ঝোপের ভেতর থেকে প্রকাণ্ড একটা কালো ভূত বেরিয়ে এক দৌড়ে কোথায় মিলিয়ে গেল!"

গাটুলা সেই ঝোপের ভিতরে ছুটে গেল এবং বিমলের মূর্চ্ছিত দেহ কোলে নিয়ে তখনি আবার বাইয়ে বেরিরে এল।

সকলের সেবা শুশ্রূষায় জ্ঞান লাভ ক'রে বিমল সব কথা খুলে বললে।

গাটুলা বললে, "জন্তুও নয় মানুষও নয়—আর তার গায়ে জানোয়ার-এর মত লম্বা লম্বা লোম! বুঝেছি, এ হচ্ছে সেই জীবটা—সিংহদমন গাটুলা সর্দারকে যে চুরি করতে এসেছিল।"

মাণিকবাবু বললেন, "ভূত, ভূত,—আস্ত ভূত, মস্ত ভূত! আমি স্বচক্ষে দেখেছি!"

রামহরি আড়ষ্ট ভাবে বললে, "রাম, রাম, রাম, রাম !"

কুমার বললে, "এ আর কেউ নয়, সেই ঘটোৎকচ আবার আমাদের পিছনে লেগেছে।"

বিমল বললে, "কুমার, তুমি ঠিক বলেছ, এ নিশ্চয়ই সেই ঘটোৎকচ। এবারে আমি হেরেছি। সে এসেছিল গুপ্তধনের ম্যাপ নিতে—"

কুমার রুদ্ধশ্বাসে বললে, "তারপর ?"

—"এবারে ম্যাপ সে নিয়েও গেছে !"

—"সর্বনাশ !"

সকলে খানিকক্ষণ নীরবে হতাশ ভাবে ব'সে রইল।

গাটুলা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীরে-ধীরে বললে, "ভেবেছিলুম আমরাই খুব চালাক! কিন্তু তা নয়, আমাদের আসল শত্রুরাও চালাকিতে বড় কম যায় না দেখছি। তারা গুপ্তধনের রক্ষীদের আমাদের পিছনে লেলিয়ে দিয়ে আমাদের দলবলকে এখান থেকে সরিয়েছে! তারপর ম্যাপ চুরি ক'রে নির্বিবাদে গুপ্তধনের দিকে ছুটেছে।"

মাণিকবাবু বললে, "আর আমাদের এখন কাদা ঘেঁটে, দেহ মাটি আর মুখ চূণ ক'রে খালি হাতেই ফিরতে হবে ! আলেয়ার পিছনে ছুটলে এম্‌নিই হয় !"

গাটুলা বললে, "কিন্তু বাবুজী, আমি এখনো হাল ছাড়িনি। গুহার ভেতরে ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানো কি আছে আমি তা জানি না, গুপ্তধন কোনখানে লুকানো আছে তাও আমি বলতে পারি না, কিন্তু সেই গুহার মুখে গিয়ে পৌঁছবার এমন একটি গুপ্ত পথ আমি জানি, যে-পথ দিয়ে গেলে শত্রুদের অনেক আগেই আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হ'তে পারব !"

বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "তবে তাই চল সর্দার, আর এক মিনিটও দেরি করা উচিত নয় !"

অন্ধকারের সঙ্গে অস্পষ্ট চাঁদের আলো মাখামাখি হয়ে গিয়ে বনের

চারিদিকে তখন অদ্ভুত রহস্যের আবছায়া সৃষ্টি করেছে। বিমলরা উর্ধ্ব-শ্বাসে বনের পথ দিয়ে ছুটছে আর ছুটছে।

কাবাগো-পাহাড়ের উঁচু-নীচু কালো কালো চূড়োগুলো ক্রমেই চোখের খুব কাছেই এগিয়ে এল।

গাটুলা একটা ঘন বনের ভিতরে ঢুকে বললে, "এখন আমাদের এই বনের ভেতর দিয়ে আধ মাইল পার হ'তে হবে। তার পরেই সামনে গুহায় ওঠবারপ াহাড়ে-পথ পাব।" তারপর চুপি চুপি আবার বললে, "এ বনকে সবাই এখানে 'ভূতের বন' ব'লে থাকে, এর মধ্যে ভয়ে কেউ ঢোকে না।"

'টর্চে'র আলো জ্বেলেও পদে পদে হোঁচট্ খেয়ে খুব কষ্টে সকলে সেই জঙ্গলাকীর্ণ সংকীর্ণ পথ দিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলো—সে পথ কোন দিন চাঁদ-সূর্যের মুখ দেখেনি। সে পথের একমাত্র আত্মীয় হচ্ছে নিবিড় অন্ধকার এবং সেই অন্ধকারে বাস করে যে-সব অজ্ঞাত জীব, আচম্বিতে আজ এখানে মানুষের আবির্ভাব দেখে তারা সবাই মিলে অজানা ভাষায় কি যেন কানাকানি করতে লাগ্‌ল! হঠাৎ বিমলের পায়ে শক্ত কি একটা ঠেক্‌ল, হেঁট হয়ে দেখ্‌লে, একটা নরকঙ্কাল!

কুমার বললে, "কিন্তু ওর মুণ্ডটা কে কেটে নিয়ে গেছে?"

যেন তার প্রশ্নের উত্তরেই কাছ থেকে কে বিকট স্বরে হেসে উঠল—হা হা হা হা হা হা হা হা—সে হা হা অট্টহাসি যেন আর থামবে না!

'টর্চে'র আলোতে দেখা গেল, একটা কঙ্কালসার উলঙ্গ ভীষণ মূর্তি ক্রমাগত হাসতে হাসতে যে দিক দিয়ে বিমলরা এসেছে, সেই দিকে ছুটতে ছুটতে চ'লে যাচ্ছে। সে মূর্তি এতক্ষণ এই গভীর নিশীথে, এই ভয়ানক স্থানে কি যে করছিল, কেউ তা বুঝতে পারলে না—বুঝতে চেষ্টাও করলে না।

গাটুলা বিকৃত স্বরে তাড়াতাড়ি বললে, "এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!"

সবাই এগিয়ে চলল এবং পিছনে অনবরত উঠতে লাগল সেই বিশ্রী অট্টহাস্য!

হঠাৎ একটা ফর্সা জায়গায় বেরিয়ে এসে গাটুলা বলে উঠল, "ভূতের বন শেষ হল, ঐ হচ্ছে গুহায় ওঠবার পথ!"

সবাই দেখলে, পঁচিশ-ত্রিশ হাত তফাতে দৃষ্টিপথ রোধ ক'রে মস্ত একটা পাহাড়, তার নিচে অন্ধকার আর উপরে ম্লান চাঁদের আলো!

খোলা হাওয়ায় হাঁপ ছাড়বার জন্যে মাণিকবাবু ধপাস্ ক'রে ব'সে পড়লেন, কিন্তু বিমল একটানে তাঁকে আবার দাঁড় করিয়ে দিয়ে কঠিন স্বরে বললে, "এখন জিরুবার সময় নয় মাণিকবাবু। আসুন আমাদের সঙ্গে!"

গাটুলার পিছনে পিছনে সবাই পাহাড়-পথ ধ'রে উপরে উঠতে শুরু করলে।

কুমার শুধোলে, "আমাদের কতটা উপরে উঠতে হবে?"

গাটুলা বললে, "প্রায় হাজার ফুট। কিন্তু কথা কয়ো না, চুপি-চুপি ওঠ!"

খানিকক্ষণ সকলে নিঃশব্দে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল।

তারপর একটা বাঁকের মুখে এসে গাটুলা থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়ে চুপি-চুপি বললে, "ঐ দেখ রত্নগুহার মুখ।...গেলবারে সুরেনবাবুর সঙ্গে ঐ পর্যন্ত আসতে গিয়ে আমাদের দলের অনেক লোক মারা প'ড়েছিল —কিন্তু তবু আমরা এর বেশি আর এগুতে পারিনি। এবারে গুহার রক্ষীরা বোকার মত খামিসির দলের পিছনে ছুটছে ব'লেই আমরা নিরাপদে এতটা আসতে পেরেছি,—নইলে দেখতে, গুহায় ওঠবার পথে দলে দলে লোক পাহারা দিচ্ছে। এখনও একজন রক্ষী সামনে ব'সে আছে, দাঁড়াও, আগে ওকে শেষ করি!" এই ব'লেই গাটুলা তার বর্শা নিক্ষেপ করতে উদ্যত হ'ল।

বিমল তাকে বাধা দিয়ে বললে, "সর্দার, অকারণ নরহত্যা কোরো

না। লোকটা তো দেখছি ব'সে-বসেই ঘুমে ঢুলছে, ওর ব্যবস্থা করতে আমার দেরী লাগবে না।"

পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে গা মিলিয়ে বিমল নিঃশব্দে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল, তারপর বাঘের মতন লাফ মেরে গুহার রক্ষীর উপর গিয়ে পড়ল এবং দেখতে দেখতে তার মুখে কাপড় গুঁজে, হাত-পা বেঁধে ফেলে, তারপর তাকে তুলে আড়ালে সরিয়ে রেখে এল।

গুহার মুখ থেকেই দেখা গেল, ভিতরে ঘুট্‌-ঘুট্‌ করছে অন্ধকার ও থম্‌-থম্‌ করছে নিস্তব্ধতা!

এই সেই রত্ন-গুহা! যার সন্ধানে ঘরমুখো বাঙালীর ছেলে পদে-পদে বিপদকে আলিঙ্গন ক'রে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছে! এই সেই রত্ন-গুহা! যার মৃত্যু-ভরা অন্ধকার বুকের নিচে জ্বলছে সাত-রাজার ধন হীরা-মাণিক। এই সেই রত্ন-গুহা! খানিকক্ষণ আগেও যার কাছে এসে দাঁড়াবার সম্ভাবনা পর্যন্ত ছিল না, তারই দ্বার আজ অরক্ষিত অবস্থায় সাম্‌নে খোলা রয়েছে!

—"ভগবান্‌ আমাদের রক্ষা করুন" ব'লে গাটুলা-সর্দার সেই জমাট অন্ধকারের গর্ভে সর্বপ্রথম প্রবেশ করলে।

তারপরে পরে পরে ঢুকল বিমল, কুমার, রামহরি ও মাণিকবাবু। তাদের প্রত্যেকের বাঁ-হাতে 'টর্চ' ও ডানহাতে রিভলভার। বাঘাও অবশ্য তাদের সঙ্গ ছাড়লে না।

গুহার মুখে পথ এত সরু যে, একজনের বেশি লোক পাশাপাশি যেতে পারে না। বিমল বুঝলে, এখানে একজন লোক দাঁড়ালে বাইরের অসংখ্য লোকের সঙ্গে একলাই যুঝতে পারে।

হঠাৎ তারা খুব চওড়া জায়গায় এসে হাজির হ'ল। উপরে 'টর্চে'র আলো ফেলে তারা দেখলে, ছাদ যে কত দূরে চ'লে গেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই! তারপর 'টর্চে'র আলো সামনে—নিচের দিকে ফেলেই সকলে আঁৎকে ও চমকে উঠল!

সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি অগণ্য লোক! তাদের পরনে

যোদ্ধার বেশ,—কোমরে তরবারি, একহাতে ঢাল, আর একহাতে চক্‌-চকে বর্শা!

সাম্‌নে, বাঁয়ে, ডাইনে—যেদিকেই আলো পড়ে, সেই দিকেই যোদ্ধার পর যোদ্ধা, সংখ্যায় তারা কত হাজার, তা বুঝে ওঠা সম্ভব নয়!

এত লোক এখানে গায়ে গায়ে মিশে দাঁড়িয়ে আছে, তবু একটি টুঁ শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। তাদের প্রত্যেকের মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে, চোখে পলকও নেই, কোন ভাবও নেই এবং দেহও একেবারে পাথরের মূর্তির মত স্থির ও নিশ্চল। উর্ধ্বে হস্ত তুলে, ডান-পা বাড়িয়ে প্রত্যেকেই একসঙ্গে বর্শা নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে—কিন্তু কারুর হাত একটুও কাঁপছে না, বর্শার ডগাটুকু পর্যন্ত নড়ছে না!

সে এক বিভীষিকাময় অস্বাভাবিক দৃশ্য! তার সাম্‌নে দাঁড়ালে অতি বড় সাহসীর বুকও ভয়ে নেতিয়ে পড়বে!

উনিশ

রত্ন-গুহার জাগরণ

'টর্চে'র আলো নিবিয়ে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে প্রায় দম বন্ধ ক'রে অনেকক্ষণ তারা অপেক্ষা করলে,—কিন্তু গুহার ভিতরে কোনরকম শব্দ শোনা গেল না।

তারা প্রতিমুহূর্তে আশা করছিল, শত শত তীক্ষ্ণ বর্শা বা তরবারির তীব্র আঘাত, কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও কেউ তাদের আক্রমণ করলে না!

চারিদিক এত নিঃশব্দ যে, কেউ সন্দেহই করতে পারবে না, রণ-সাজে সজ্জিত হাজার হাজার যোদ্ধা এই বিরাট গুহার মধ্যে শত্রু-সংহারের জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে! অস্বাভাবিক সেই নিঃশব্দতা!

সে অনিশ্চয়তা সহ্য করতে না পেরে বিমল আবার 'টর্চ' জ্বেলে তার আলো চতুর্দিকে নিক্ষেপ করলে।

আশ্চর্য, আশ্চর্য! শত্রুরা কেউ এক পদও অগ্রসর বা পশ্চাৎপদ হয়নি, তাদের মুখের ভাব ও দেহের ভঙ্গিও একটুও বদলায়নি—ঠিক তেমনি ক'রেই বর্শা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চল প্রস্তরমূর্তির মত।

এও কি সম্ভব! অবাক্ ও হতভম্ব হয়ে সকলে পরস্পারের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

বিমল রিভলভারটা বাগিয়ে ধ'রে দু'পা এগিয়ে গেল,—শত্রুদের জনপ্রাণীর দেহে তবু এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

তবে?......তবে কি এরা মানুষ নয়। তবে কি সত্যিই এরা যখ... রত্ন-গুহার প্রেত-রক্ষী, গাটুলা সর্দারের মুখে যাদের কথা তারা শুনেছিল?

হঠাৎ গাটুলা সর্দার ব'লে উঠল, "হয়েছে! এতক্ষণে মনে পড়েছে। ওরে আমার পোড়া মন, বুড়ো হয়ে তুই সব ভুলে যাস্?"

—"কি মনে পড়েছে, সর্দার?"

—"এদেশের এক অদ্ভুত রীতি আছে। গুহার বাইরে যে-সব রক্ষী-সৈন্য পাহারা দেয়, বেঁচে থাকতে তারা এই গুহার ভেতরে ঢুকতে পায় না। কিন্তু তাদের মৃত্যু হ'লে পর তাদের দেহকে গুহার ভেতরে নিয়ে আসা হয়। তারপর প্রাচীন মিশরে যে উপায়ে 'মমি' তৈরী করা হ'ত, তেমনি কোন উপায়ে তাদের চিরদিনের জন্যে রক্ষা করা হয়।...এ রীতির কথা অনেকদিন আগেই শুনেছিলুম, কিন্তু এতক্ষণ সে-কথা আমার মনে পড়েনি। ওরে আমার পোড়া মন, হ্যাঁক্ থুঃ, তোর গলায় দড়ি, গলায় দড়ি!"

মাণিকবাবু এতক্ষণ আতঙ্কে দুই চোখ মুদে, অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে ভেবে মনে মনে ইষ্টদেবতার নাম জপছিলেন; এখন গাটুলার কথা শুনে সহসা চোখ খুলে বললেন, "তাহ'লে সামনে যাদের দেখছি, তারা জ্যান্ত মানুষ নয়,—'মমি'?"

রামহরির দুই চোখ তখনো কপালে উঠেই আছে। সে বললে,

"মামী ? জ্যান্ত মানুষ নয়, মামী। ওরে বাবা, মামী আবার কোন্-দেশী ভূত গো ?"

মাণিকবাবু সগর্বে বললেন, "আহা, মামী নয়, মামী নয়,—'মমি'! বাঘ-সিঙ্গীর দেহকে 'জিইয়ে' বৈঠকখানায় সাজিয়ে রাখা হয় দেখেছ তো ? 'মমি'ও তেমনি মরা-মানুষের 'জিয়ানো' দেহ! তোমার কিছু ভয় নেই রামহরি, তুমি শান্ত হও! আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমি কি একটুও ভয় পেয়েছি ?"

রামহরি বললে, ভয় ? 'ভয় আমি আর কারুকে করি না, ভয় করি খালি ভূতকে! খোকাবাবু জানে, আমার এই বুড়ো হাড়ে এখনো ভেল্কি খেলাতে পারি,—দু-চারটে জোয়ান পাটাকে এখনো কুপোকাৎ করবার জোর আমার আছে। কিন্তু ভূতের কাছে তো আর গায়ের জোর খাটে না, কাজেই সেইখানেই আমি বেজায় কাবু!"

কুমার বললে, "ও-সব বাজে কথা যেতে দাও! এ গুহা তো দেখছি, প্রকাণ্ড ব্যাপার, এর কোথায় কি আছে তা বুঝে ওঠা কঠিন। এখন আমাদের কর্তব্য কি ?"

গাটুলা বললে, "আগেই বলেছি, গুহার ভেতরের কথা আমিও কিছুই জানি না! তবে শুনেছি, এ গুহা নাকি অনন্ত গুহা, এর শেষ নেই! এর মধ্যে নাকি মন্দির আছে, ঘরবাড়ী আছে, রত্নভাণ্ডার আছে, পথ-বিপথ আছে, আর এখানে বাস করে যারা তারা মানুষ না যক্ষ না রক্ষ, তাও আমি বলতে পারি না। গুহায় ঢুকেই তো এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলুম —মৃত যোদ্ধার বিভীষিকা! এমন আরো কত বিভীষিকা যে এইবারে সিংহদমন গাটুলা সর্দারকে ভয় দেখাবে তা কে বলতে পারে ?"

বিমল বললে, "তাইতো, এবারে কোন্ দিকে যাব,—এ ভীষণ আঁধার-পুরীতে পথের সন্ধান দেবে কে ? হায় হায়, এই সময়ে ম্যাপ-খানা যদি কাছে থাকত!"

বিমলের মুখের কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই বাহির থেকে গুহা মুখের গলিপথে অনেকগুলো 'টর্চে'র আলো এসে পড়ল!

গাটুলা বললে, "নিশ্চয় আমাদের শত্রুরা এইবারে আসছে—"

—"শত্রুরা ?"

—"হাঁ, যারা ম্যাপ চুরি করেছে তারা! এখন আমরা লুকোই কোথায় ?"

বিমল টপ্ ক'রে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "এস, আমরা ঐ মরা যোদ্ধাদের দলে ঢুকে গা ঢাকা দিয়ে থাকিগে!"

সকলে তাড়াতাড়ি সেই মৃত যোদ্ধাদের দলে গিয়ে ভিড়ে পড়ল এবং তাদের আড়ালে লুকিয়ে থেকে শত্রুদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

অল্পক্ষণ পরেই বাহির থেকে যে-লোকগুলো ভিতরে এসে ঢুকল, আন্দাজে বোঝা গেল, সংখ্যায় তারা চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের কম হবে না। তাদের দলে দশ-বারোটা 'টর্চ' আছে, কিন্তু তাদের আলো পড়ছে সাম্‌নের দিকে, কাজেই কারুর মুখ দেখা যাচ্ছে না।

কুমার চুপি চুপি বললে, "ও-দলে খোঁজ নিলে নিশ্চয়ই মাণিকবাবুর গুণধর কাকা মাখনবাবুকে, তাঁর বন্ধু ঘটোৎকচকে, আর সেই রামু-রাস্কেলকে দেখতে পাওয়া যাবে!"

বিমল বললে, "হ্যাঁ, আমারও সেই বিশ্বাস!"

শত্রুদল ভিতরে ঢুকেই সেই সহস্র সহস্র আক্রমণোদ্যত যোদ্ধার মূর্তি দেখে প্রথমে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল—মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে; তার-পরেই বামদিকে মোড় ফিরে সকলে মিলে এগিয়ে চলল।

বিমল বললে, "দেখ্‌ছ, ওরা এ মূর্তিগুলোকে দেখে ভয় পেলে না? নিশ্চয়ই ওরা আগে থাকতে সব সন্ধান নিয়ে এসেছে। তারপর দেখ, সকলের আগে 'টর্চ' হাতে ক'রে একটা লোক যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস, ও লোকটাই হচ্ছে দলের সর্দার মাখনবাবু। ওর কাছেই ম্যাপ আছে, তাই সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!...দেব নাকি গুলি ক'রে ওর মাথার খুলি উড়িয়ে?"

কুমার বললে, "না না, ওরা দলে খুব ভারি, একজনকে মেরে লাভ

।ক? তার চেয়ে চল, তফাতে থেকে আমরাও ওদের পিছনে পিছনে যাই, তাহ'লে আর আমাদের ভাবনা থাকবে না, ওরাই আমাদের পথ-প্রদর্শকের কাজ করবে।"

বিমল কুমারের পিঠ চাপড়ে বললে, "তুমি ঠিক বলেছ। সর্দারের মত কি?"

গাটুলাও কুমারের প্রস্তাবে সায় দিলে।

মাণিকবাবু বললেন, "বাপ্ রে ঘটোৎকচ যদি দেখতে পায়?"

বিমল বললে, "তাহ'লে আপনি এইখানে ব'সে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করুন।"

মাণিকবাবু বললেন, "একলা? ও বাবা, বলেন কি? তার চেয়ে আপনাদের সঙ্গে যাওয়াই ভালো। আর আমি কারুকে ভয় করব না—এবার আমিও মরিয়া হয়ে উঠব। প্রাণ যখন যাবেই, তখন আর ভয় পেয়ে লাভ কি? চলুন, কোথায় যাবেন চলুন।"

সকলে অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রবর্তী দলের 'টর্চে'র আলো লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হ'ল।

প্রায় দশ মিনিট এইভাবে অগ্রসর হবার পর দেখা গেল, শত্রুদলের 'টর্চে'র আলো একে একে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে!

গাটুলা বললে, "বোধ হচ্ছে ওরা যেন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।"

শত্রুদের আলোর চিহ্ন যখন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, বিমল তখন নিজের 'টর্চে'র আলো মাটির উপরে ফেলে আবার এগুতে লাগল।

খানিক এগিয়েই দেখা গেল, পাহাড়ের গায়ে খোদা সুদীর্ঘ এক সিঁড়ির সার প্রায় চারতলা নিচে নেমে গেছে। কিন্তু সেখানে শত্রুদের কোন সাড়াশব্দই নেই!

ধীরে ধীরে অন্ধকারেই তারা সিঁড়ি ধ'রে নিচে নামতে লাগল, সিঁড়ির নিচে গিয়েও শত্রুদের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। চারিদিকে বিদ্যুতের মত 'টর্চে'র আলোক-রেখাকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে বিমল দেখলে, তারা প্রকাণ্ড এক লম্বা-চওড়া উঠানের উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

উঠানের পরেই দালান ও সারবন্দী ঘর ও মাঝে মাঝে এক-একটা পথ। কিন্তু শত্রুরা কোন্ পথে গেছে?

তারা হতাশ ভাবে সেইখানেই মিনিট পনেরো দাঁড়িয়ে রইল—চুপি চুপি অনেক পরামর্শের পরও স্থির করতে পারলে না, তারা কোন্ দিকে যাবে এবং শত্রুরা কোন্ দিকে গেছে।

আচম্বিতে সেই বিরাট রত্ন-গুহার নিদ্রা-স্তব্ধতা ভেঙে গেল!

প্রথমেই শোনা গেল আট-দশটা বন্দুকের অগ্নি-উদগারের শব্দ এবং তারপরেই হঠাৎ শত শত সিংহের প্রাণ-চমকানো গম্ভীর গর্জন! সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য ঘণ্টার ধ্বনি, অগণ্য মানুষের চীৎকার ও আর্তনাদ! সারা গুহা থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল—অন্ধকারের ভিতরেই প্রাঙ্গণের চারিদিককার দরজা খোলার শব্দ হ'তে লাগল,—এদিকে ওদিকে সেদিকে দলে-দলে মানুষের—না কাদের পদশব্দ শোনা যেতে লাগল!

গাটুলা সর্দার ব'লে উঠল—"আর নয়, যদি বাঁচতে চাও তো পালাও! গুহায় যখেরা জেগে উঠেছে; ঐ শোন, শত শত সিংহ চীৎকার করতে করতে এদিকে এগিয়ে আসছে, যারা ভেতরে গেছে তারা আর ফিরবে না—আমরাও ভেতরে থাকলে আর বাইরের আলো দেখতে পাব না,... এস, এস, পালিয়ে এস!"

গাটুলার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে আবার উপরে উঠল এবং মাঝে মাঝে—আলো জ্বেলে যে-পথ দিয়ে এসেছে সেই পথ ধ'রে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট্‌তে লাগল...খানিক পরেই বুঝতে পারলে, অনেক তফাতে তাদের পিছনেও আরো কারা বেগে ছুটে আসছে! তারা কারা?

শত শত সিংহের গর্জন, হাজার হাজার মানুষের কোলাহল, অসংখ্য ঘণ্টাধ্বনি সেই রহস্যময় রত্নময় রত্ন-গুহাকে তখনো তোলপাড় ক'রে তুলছে—কিন্তু বন্দুকের শব্দ ও বহুকণ্ঠের আর্তনাদ আর শোনা যাচ্ছে না।

এই তো গুহার মুখ। তারপরেই বাহিরের মুক্ত আকাশ! কিন্তু চাঁদের আলো তখন নিবে গেছে এবং শেষ-রাতের পাতলা অন্ধকারের ভিতরে আসন্ন ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস ব'য়ে যাচ্ছে!
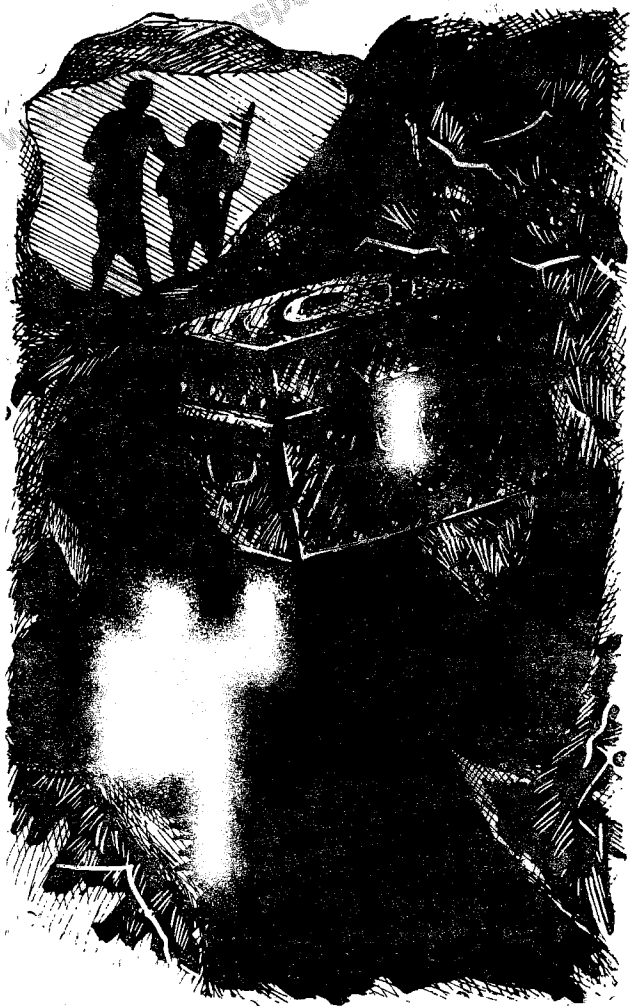
বিমল বললে, "ঐ বড় পাথরখানার আড়ালে সবাই লুকিয়ে পড়ি এস। পিছনের পায়ের শব্দ খুব কাছেই এসে পড়েছে!"

তারা পাথরখানার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতে গুহার ভিতর থেকে পর-পর তিনটি মূর্তি বেরিয়ে এল, ঝড়ের মত। বাইরে এসে তারা এক মুহূর্তও থামল না—সোজা গিয়ে পাহাড় থেকে নামবার পথ ধরলে।।

পাতলা অন্ধকারে ভালো ক'রে বোঝা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু সর্বশেষে যে পাহাড় থেকে নামবার পথ ধরলে, তার চেহারার অস্বাভাবিকতা সকলেরই চোখে প'ড়ে গেল। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া তার দেহ, গায়ের রং তার যেন অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে এবং তার সর্বাঙ্গে এক-টুকরো কাপড়ও নেই। সেই অদ্ভুত মূর্তির কাঁধের উপরে বড় বাক্সের মত কি একটা যেন রয়েছে।

বিমল বললে, "কুমার! কুমার! ঐ দেখ ঘটোৎকচ যাচ্ছে! কাঁধে ও কী নিয়ে যাচ্ছে?—গুপ্তধন?—কুমার, কুমার! আজ ঘটোৎকচের একদিন কি আমারই একদিন!"—বলতে বলতে বিমল একলাফে পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল!

বিশ

পাপের ফল

বিমল পাহাড় থেকে নামবার উপক্রম করতেই গাটুলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দুই হাতে তার দুই কাঁধ চেপে ধ'রে বললে, "না বাবু, এখনও রত্ন-গুহার সীমানা আমরা ছাড়াইনি, এখানে গোলমাল করা আর যেচে গলায় ফাঁসি দেওয়া—একই কথা।"

বিমল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে উত্তপ্ত স্বরে বললে, "না সর্দার! তুমি

আমাকে ছেড়ে দাও! তুমি জানো না, ঐ ঘটোৎকচ কতবার আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে! ও যেন আলেয়া, ওকে দেখা যায়, ধরা যায় না। ও যে কি, মানুষ, না জন্তু, না প্রেত—তাও আমরা জানি না! আজ ওকে আমি ধরবই ধরব,—সকল রহস্য ভেদ করব।"

হঠাৎ নিচ থেকে একাধিক কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ জেগে উঠল!

কুমার ও রামহরি চম্‌কে একসঙ্গে বলে উঠল, "ও কী—ও কী!"

খানিকটা নেমেই দেখে, ভীষণ ব্যাপার! রক্তগঙ্গার মাঝখানে দু'টো দেহ প'ড়ে রয়েছে, একটা দেহ একেবারে স্থির এবং একটা দেহ তখনো ছট্‌ফট্ করছে।

যে ছট্‌ফট্ করছিল তাকে দেখেই মাণিকবাবু কাতরস্বরে ব'লে উঠলেন, "অ্যাঁ, ছোটকাকা! ছোটকাকা!"

আহত লোকটির দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখে গাটুলা বললে, "হু, চিনতে পেরেছি! এ যে দেখছি সুরেনবাবু হুজুরের ভাই মাখনবাবু!"

মাখনবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে অতি-কষ্টে বললেন, "আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না,—রক্তে আমার দুই চক্ষু বন্ধ হয়ে গেছে! কিন্তু আমি বুঝতে পারছি তোমরা কে! তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, তার ফলে নিজেও মরতে বসেছি,—তোমরা আমাকে ক্ষমা কর!"

মাখনবাবুকে জড়িয়ে ধ'রে মাণিকবাবু বললেন, "আপনার এ দশা কে করলে, ছোটকাকা?"

—"ঘটোৎকচ! আমাকে আর রামুকে সে ছোরা মেরেছে।"

—"ছোরা মেরেছে! কেন?"

—"গুপ্তধন সে একলাই ভোগ করতে চায়।"

বিমল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "গুপ্তধন! আপনারা কি গুপ্তধন পেয়েছেন?"

—"পেয়েছি, কিন্তু গুহায় যা আছে, তার তুলনায় যা পেয়েছি তা যৎসামান্য! সে গুহায় যা আছে, কুবেরের ভাণ্ডারেও বোধহয় তা নেই! কিন্তু সে হচ্ছে ভূতুড়ে-গুহা! আমার সঙ্গীরা প্রায় সবাই মারা পড়েছে!

একটা বাক্স নিয়ে কোন গতিকে আমি, রামু আর ঘটোৎকচ প্রাণ নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়েছি বটে, কিন্তু এখন রামুও মরেছে—আমারও মরতে দেরী নেই। ঘটোৎকচ! বিশ্বাসঘাতক ঘটোৎকচ! রত্নের বাক্স নিয়ে আমাদের মেরে সে পালিয়েছে! উঃ, সে বাক্সে যা আছে, তা দিয়েও একটা রাজ্য কেনা যায়! কিন্তু সে পাপের ফল আমার ভোগে এল না —আমাকেই নরকে যেতে হচ্ছে! উঃ, উঃ! গেলুম—গেলুম! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—মাণিক—মাণিক—" বলতে বলতে মাখনবাবু ধনুকের মত বেঁকে গেলেন,—তারপরেই মাটিতে সিধে হয়ে আছড়ে প'ড়ে একেবারে স্থির হয়ে রইলেন!

রামহরি মাখনবাবুর বুকে হাত দিয়ে বললে, "সব শেষ হয়ে গেছে।"

এই পাষণ্ড ও পাপিষ্ঠ গুরুজনের মৃত্যুতেও মাণিকবাবুর দু-চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল।

বিমল মাথায় করাঘাত ক'রে বললে, "হায়রে অদৃষ্ট! এবারেও ঘটোৎকচ আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালাল! এতক্ষণে সে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে, আর তাকে ধরতে পারব না।"

কুমার এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বললে, "কিন্তু, সর্দার? গাটুলা সর্দার কোথায় গেল?"

বিমল ব'লে উঠল, "হুঁশিয়ার গাটুলা সর্দার! নিশ্চয় সে ঘটোৎকচের পিছু নিয়েছে, চল চল, দৌড়ে চল!"

মাণিকবাবু করুণ স্বরে বললেন, "কিন্তু আমার কাকার মৃতদেহ? তার সৎকারের কি হবে?"

বিমল দ্রুতপদে পাহাড় থেকে নামতে নামতে বললে, "শয়তানের মড়ার সৎকার করবে শেয়াল-কুকুরেরা! চ'লে আসুন!"

একুশ

ঘটোৎকচ-রহস্য

পাহাড় থেকে নেমেই দেখা গেল, আর-এক ভয়ানক দৃশ্য !

তখন ভোরের আলো এসে উষার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে এবং বনের গাছে গাছে পাখীদের গানের আসর বসেছে।

কিন্তু এমন সুন্দর প্রভাতকেও বিশ্রী ক'রে দিলে সাম্‌নের সেই বীভৎস দৃশ্য !

ভূমিতলে চিৎ হয়ে প'ড়ে প্রাণপণে যুঝছে গাটুলা সর্দার এবং তার বুকের উপরে হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে বিপুলদেহ দানবের মত প্রকাণ্ড একটা গরিলা।

কুমার চেঁচিয়ে উঠল,—"গরিলা, গরিলা ! সর্দারকে গরিলায় আক্রমণ করেছে—গুলি কর !"

চীৎকার শুনেই গরিলাটা গাটুলাকে ছেড়ে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল এবং সাম্‌নেই বিমলকে দেখে ভীষণ এক চীৎকার ক'রে মহাবিক্রমে তাকে আক্রমণ করলে !

এখন, যাঁরা "যখের ধন" প'ড়েছেন তাঁরাই জানেন বিমলের শারীরিক ক্ষমতার কথা। সে কুস্তি, যুযুৎসু ও 'বক্সিং'য়ে সুদক্ষ,—সে অসুরের মত বলবান্। যদিও সে জানত গরিলার গায়ের অমানুষিক শক্তির সামনে পৃথিবীর কোন মানুষই দাঁড়াতে পারে না, তবুও সে কিছু-মাত্র ভয় পেলে না। কারণ, ভয় তার ধাতে নেই।

এই বৃহৎ গরিলাটার অতর্কিত আক্রমণে বিমল প্রথমেই মাটির উপরে ঠিক্‌রে প'ড়ে গেল; কিন্তু শত্রু তাকে দ্বিতীয়বার ধরবার আগেই বিমল ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে গরিলার মুখের উপরে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিয়ে সাঁৎ করে একপাশে স'রে গেল।

কিন্তু ঘুষি খেয়েও গরিলাটা একটু দমল না, দু-হাত বাড়িয়ে বিমলকে জড়িয়ে ধরতে উদ্যত হ'ল। এবারে বিমল যুযুৎসুর এক প্যাঁচ কষ্‌লে এবং চোখের নিমেষে যেন কোন্ মন্ত্রশক্তিতেই গরিলাটার সেই বিরাট দেহ, গোড়া-কাটা-কলাগাছের মত ভূমিসাৎ হ'ল।

আহত গাটুলা সর্দার রক্তাক্ত দেহে মাটির উপরে দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে বললে, "শাবাশ বাবুজী! বহুৎ আচ্ছা, মরদ-কা-বাচ্চা!"

কুমার রিভলভার তুলে গরিলাটাকে গুলি করতে উদ্যত হ'ল।

বিমল বললে, "এখন মেরো না কুমার! আগে দেখা যাক্ মানুষ জেতে, না, গরিলা জেতে? এ এক অদ্ভুত লড়াই!"

ভূপতিত গরিলাটা মাটির উপরে শুয়ে শুয়েই বিদ্যুতের মতন সড়াৎ ক'রে খানিকটা স'রে গিয়ে হঠাৎ বিমলের পা দু'টো জড়িয়ে ধরলে,—সঙ্গে সঙ্গে বিমলকে ধরাশায়ী হ'তে হ'ল। তারপরে শুরু হ'ল এক বিষম ঝটাপটি,— কখনো বিমল উপরে আর গরিলা নিচে, কখনো বিমল নিচে আর গরিলা উপরে, কখনো দু'জনেই জড়াজড়ি ক'রে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়—এবং ওরই মধ্যে ঘুষি, চড়, কিল, লাথি কিছুই বাদ গেল না।

সকলে অবাক্ ও স্তম্ভিত হয়ে সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখতে লাগল, তখন গরিলাটাকে আর গুলি করবারও উপায় ছিল না—কারণ, সে গুলি গরিলার গায়ে না লেগে বিমলেরই গায়ে লাগবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। কেবল বাঘা ঘেউ ঘেউ ক'রে বক্‌তে বক্‌তে ছুটে গিয়ে গরিলাটাকে কাম্‌ড়ে দিতে লাগল!

সবাই কি করবে তাই ভাবছে, এমন সময়ে বিমল হঠাৎ কি কৌশলে সেই মস্ত বড় গরিলার দেহটা পিঠের উপরে নিয়ে 'স্প্রিং-টেপা' পুতুলের মত টপ্ করে দাঁড়িয়ে উঠল এবং কারুর চোখে পলক পড়বার আগেই গরিলাটাকে ছুড়ে প্রায় সাত হাত তফাতে ফেলে দিলে!

গাটুলা চেঁচিয়ে উঠল, "বাহবা বাবুজী, বাহবা বাবুজী, বাহবা বাবুজী!"

মাটির উপরে দু'হাত ছড়িয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ে গরিলাটা আর

নড়ল না। বাঘার ঘন ঘন কামড়েও তার সাড় হ'ল না, সবাই বুঝলে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে।

বিমল অবসন্নের মত মাটির উপরে ব'সে পড়ল—তার মুখ ও গা দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে। রামহরি তাড়াতাড়ি তার সেবায় লেগে গেল। কুমার বললে, "সর্দার, এ গরিলাটা কোত্থেকে তোমাকে আক্রমণ করলে?"

বিমল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "গরিলা তো সর্দারকে আক্রমণ করেনি, সর্দারই গরিলাকে আক্রমণ করেছিল।"

গাটুলা সবিস্ময়ে বললে, "তুমি কি করে জানলে বাবু?"

বিমল বললে, "কারণ, আমি গোড়া থেকেই সন্দেহ করছি, ঘটোৎকচ হচ্ছে একটা পোষা গরিলা। ঐ দেখ, গুপ্তধনের বাক্স—যা নিয়ে ঘটোৎকচ পালাচ্ছিল।"

কুমার বললে, "কিন্তু আমি তো শুনেছি গরিলা পোষ মানে না।"

বিমল বললে, "আমিও তাই জানতুম। এখন দেখছি সে-কথা ঠিক না।"

কুমার খুঁৎ খুঁৎ করতে করতে বললে, "বিমলের এক আছাড়ে গরিলার মত বলবান বুনো জন্তু কখনো মরতে পারে? আর হাজারই পোষ মানুক গরিলা জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়, ধনরত্নের লোভে গরিলা কি মানুষ খুন করে?" বলতে বলতে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গরিলার মৃতদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সচকিত বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মৃতদেহের পানে তাকিয়েই সে চেঁচিয়ে উঠল, শীগ্‌গির এস। তোমরা সবাই দেখে যাও!"

সকলে কৌতূহলী হয়ে ছুটে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলে, গরিলার কাঁধের উপর থেকে গরিলার মুখের চামড়া স'রে গিয়েছে এবং ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে যে কালো কুৎসিত মরা মানুষের মুখখানা,—মাংসহীন মড়ার মাথার দাঁতগুলো যেমন বেরিয়ে থাকে, তারও দু'-পাটি দাঁত তেম্‌নিভাবে ছর্‌কুটে বাইরে বেরিয়ে আছে—কারণ, তার উপরের

ও নিচের তুই ঠোঁটই না জানি কবে কোন্ দুর্ঘটনায় কেমন ক'রে উড়ে গিয়েছে।

বিমল বললে, "অ্যাঃ—কি আশ্চর্য! এ যে দেখছি জাহাজের সেই মড়া-দেঁতো ঢ্যাঙা কাফ্রিটার মুখ!"

মাণিকবাবু বললেন, "ও বাবা, এই ব্যাটাই তাহ'লে গরিলার চামড়া মুড়ি দিয়ে ঘটোৎকচ সেজে এতদিন আমাদের ভয় দেখিয়ে আসছে!"

বাক্সের ডালা খুলে দেখা গেল, তার ভিতরটা রাশি রাশি হীরা চুণী পান্না ও মুক্তার জেল্লায় ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করছে—এত মূল্যবান্ ঐশ্বর্য তারা কেউ কোনদিন একসঙ্গে দেখবার কল্পনাও করেনি!

বিমল বললে, "কিন্তু মাখনবাবুর মুখে শুনেছ তো, গুহায় যা আছে তার তুলনায় এ ঐশ্বর্য যৎসামান্য মাত্র! আমরা শুধু হাতে ফিরছি না বটে, কিন্তু সে গুহার কোন গুপ্তকথাই জানা হ'ল না! সেই ঘুমন্ত গুহার অন্ধকার থেকে অমন হাজার হাজার কণ্ঠের চীৎকার জাগল কোত্থেকে, কেনই-বা শত শত সিংহ গর্জন করছিল আর অত ঘণ্টা বাজ্‌ছিল, আর কেনই বা মাখনবাবু ভয় পেয়ে পালিয়ে এলেন, আর কেনই বা সে গুহাকে ভূতুড়ে-গুহা বললেন, সে-সব কিছুরই তো কিনারা করা হ'ল না!"

রামহরি বললে, "থাক্ থাক্, যা জেনেছ তাই-ই যথেষ্ট, আর বেশি কিছু জানতে হবে না। এখন প্রাণ নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চল!"

বিমল হেসে বললে, "না রামহরি, এ যাত্রায় আর বেশি কিছু জানা চলবে না—গুহার যখেরা এখন সজাগ হয়ে আছে। কিন্তু এক বৎসর পরে হোক্, আর তু'-বৎসর পরেই হোক্, এই গুহার রহস্যভেদ করবার জন্যে আবার আমরা নিশ্চয়ই আসব,—কি বল কুমার?

কুমার বললে, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!"

মাণিকবাবু বললেন, "ও বাবা, বলেন কি! এই আমি নাক মল্‌ছি, কান মল্‌ছি—এ জীবনে এ-মুখো আর কখনো হব না! দয়া ক'রে আর আমাকে ডাকবেন না, কারণ, ডাকলেও আর আমার সাড়া পাবেন না।"

গাটুলা বললে, "বাবুজী! আবার যদি আপনারা এখানে আসেন আর সিংহদমন গাটুলা সর্দারকে যম যদি চুরি ক'রে না নিয়ে যায়, তাহ'লে ঠিক তাকে আপনাদের সঙ্গে দেখতে পাবেন। আমি সাহসীর গোলাম!"

আচম্বিতে সকলের কান গেল আর একদিকে।

হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্ হুম্! যেন চার-পাঁচশো ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে তালে তালে পা ফেলে কারা এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে! ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্! সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যেন কাঁপতে লাগল—ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্! পৃথিবীর বুকের উপরে পড়ছে হাজার হাজার সৈনিকের পা।

গাটুলা সর্দার দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আর এখানে নয়! রত্ন-গুহার রক্ষীরা ফিরে আসছে।"

●

নৃমুণ্ড শিকারী

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুন্দর-সন্ন্যাসী

দুনিয়ায় শুভ-ঘটনা বেশি ঘটে না।

আজকের পৃথিবীতে বড় বড় ঘটনার ফর্দের দিকে তাকালে ভয়ে চমকে উঠতে হয়।

জাপান তার জ্ঞাতি-ভাই চীনের বিরাট দেহ কেটে টুকরো টুকরো করবার চেষ্টায় আছে। ইতালি আবিসিনিয়াকে খুন করে আবার ফ্রান্সের গলা টেপবার মতলব আঁটছে; জার্মানি প্রায় সারা য়ুরোপের বুকের ওপর দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে বিরাট এক জগন্নাথের রথের মতো এবং সমগ্র ইংলণ্ডের আকাশে করছে প্রচণ্ড মৃত্যু-বৃষ্টি!

অথচ ভেবে দেখো। যে সব দেশে ঐ সব অশুভ হানাহানি চলছে সেখানকার উপাস্য হচ্ছেন শান্তি ও প্রেমের ঠাকুর খ্রীষ্ট ও বুদ্ধদেব!

কিন্তু ও সব তো হচ্ছে মহা মহা ঘটনা। ভাবলেও মাথা ঘুরে যায়। ওদেরই সঙ্গে দুনিয়ায় ওসবের তুলনায় ঢের ছোট অথচ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত অশুভকর এতো ঘটনা নিত্যই ঘটে যার হিসেব রাখা অসম্ভব; বলতে গেলে বলতে হয়, অশুভ ঘটনার তরঙ্গের পর তরঙ্গে নাকানি-চোবানি খেতে খেতে মানুষ বেঁচে আছে কায়ক্লেশে কোনো রকমে।

এতো কথা মনে হচ্ছে কেন, জানো? সম্প্রতি কলকাতায় আর তার আশেপাশে এমন কাণ্ড নিত্যই ঘটছে যা কেবল অশুভ বা ভীষণ নয়, বীভৎসও বটে।

এ-অঞ্চলে নৃমুণ্ড-শিকারীর আবির্ভাব হয়েছে।

প্রথম ঘটনা ঘটে জগন্নাথ ঘাটের কাছে। একজন মাড়োয়ারী শেঠ

রাতে গঙ্গাস্নানে বেরিয়েছিলো। সকালবেলায় তার মুণ্ডহীন দেহ পাওয়া গেলো পথের ওপরে।

পরদিন সকালে টালার কাছে খালের ধারে আবিষ্কৃত হলো এক পাহারাওয়ালার মৃতদেহ, তারও মুণ্ড পাওয়া গেলো না।

তৃতীয় ঘটনা ঘটে খিদিরপুর ডকের কাছে। রাতের গুমোটে এক কুলি খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। কে বা কারা এসে বেচারার মুণ্ড কেটে নিয়ে যায়।

এমনি ভয়াবহ ঘটনা ঘটলো উপরি উপরি পনেরো বার। কখনো কাশীপুরে—কখনো খিদিরপুরে, কখনো ব্যারাকপুরে, কখনো কালীঘাটে, কখনো হাওড়া-শিবপুর-শালিখায় এবং কখনো কলকাতার প্রান্তবর্তী জায়গায় পাওয়া যেতে লাগলো মুণ্ড-কাটা দেহের পর দেহ।

আতঙ্কে নগরবাসীরা স্তম্ভিত। পুলিশের দলবল পাগলের মতো শহরময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলো—কিন্তু বৃথা। নরবলি বন্ধ হলো না।

রাত ন-টার পর শহরের পথে আর জনপ্রাণীকে দেখা যায় না। থিয়েটার-বায়স্কোপ-এর রাত্রের অভিনয় বন্ধ হয়ে গেলো। একদিন সকালে চাঁদপাল ঘাটের কাছে এক মাতাল ইংরেজ নাবিকের স্কন্ধকাটা মৃতদেহ পাবার পর থেকে চৌরঙ্গিতেও মহা বিভীষিকার সঞ্চার হলো।

কেল্লা থেকে গোরা ফৌজ আনিয়ে পথে পথে পাহারা বসানো হলো। তখন নরবলি হয় শহরের বাইরে অন্য কোনো জায়গায়। ফৌজ আর কতোদূর পাহারা দেবে?

এমন চুপি চুপি খুনীরা কাজ সেরে চম্পট দেয় যে, কাক-পক্ষীও টের পায় না। এতোগুলো খুন হলো—কিন্তু খুনীদের দেখা তো দূরের কথা! টুঁ-শব্দও কারোর কানে ওঠেনি। খুনীরা যেন ইন্দ্রজাল জানে, তারা যেন মৃত্যুর মতো নিঃশব্দ ও অদৃশ্য।

কাগজওয়ালারা পুলিশের অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলো। টাউন-হলে মস্তবড়ো আন্দোলন-সভা বসিয়ে

নগরবাসীরা প্রশ্ন তুললো—আমরা ট্যাক্স দিয়ে পুলিশ পুষছি কেন? আমাদের মাথাগুলো ঢুকলো হাঁড়িকাঠে আর পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবে, বলে? মুশ্‌কিলে পড়ে গভর্নমেণ্ট, ঘোষণা করলেন, যে এই নৃশংস হত্যাকারীদের সন্ধান দিতে পারবে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

কিন্তু পুরস্কার ঘোষণা করা এক আর হত্যাকারীকে ধরা এক। হত্যার সংখ্যার সঙ্গে পুরস্কারের টাকার সংখ্যাই কেবল বাড়তে লাগলো।

পাথুরেঘাটার মেয়ো হাসপাতালের কাছে এক দিন একসঙ্গে ছুটো লোকের মুণ্ডহীন দেহ পাওয়া গেলো। পুলিশ-তদন্তে প্রকাশ পেলো তারা ছ'জনেই ছ'টি গুণ্ডা। তাদেরও ব্যবসা দাঙ্গা-হাঙ্গামা রাহাজানি খুনখারাপি। খুব সম্ভব, পুরস্কারের লোভেই রাত্রে খুনী ধরতে পথে বেরিয়েছিলো।

ব্রিটিশ ভারতের সর্বপ্রধান নগর কলকাতার বুকের ওপর যে এমন অসম্ভব সব ঘটনা ঘটতে পারে, এটা কেউ ছঃস্বপ্নেও মনে আনতে পারে নি। বিলাতের পার্লামেণ্টেও এইসব ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন উঠলো। ভারত-গভর্নমেণ্ট থেকে কলকাতা পুলিশের ওপরে এলো জোর হুমকি।

কিন্তু বেচারা পুলিশ করবে কি? হত্যাকারীরা এমন সুচতুর ও সাবধানী যে ঘটনাস্থলের কোথাও সামান্য একটা সূত্র রেখে যায় না। আর এইসব অদ্ভুত হত্যার উদ্দেশ্যই বা কি! কোথাও নিহত ব্যক্তিদের ট্যাঁক্ বা পকেট থেকে একটা পয়সাও চুরি যায় নি। এ খুনীর দল জাত মানে না, উচ্চ-নীচ, বৃদ্ধ-জোয়ান, গরীব-ধনী, সাহেব বা বাঙালি বা মাড়োয়ারি বা মুসলমান কিছুই বিচার করে না—যেন তেন প্রকারে সে কেবল কাটা মুণ্ড হস্তগত করতে চায়। মানুষের মাথা তো পাঁঠার মুড়ি নয়, এতো মুণ্ড নিয়ে খুনীরা করে কি? আর একটা রহস্যও লক্ষ্য করবার মতো! যারা মারা পড়েছে, সবাই পুরুষ। খুনীরা নারী হত্যা করে নি।

ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে গরমাগরম ধমক খেয়ে ইন্‌স্পেক্টর সুন্দর-

বাবু আর কোনো উপায় না দেখে শখের গোয়েন্দা জয়ন্তের কাছে ধর্না দিয়ে পড়লেন।

চৌকির কোণে বসে পা নাচাতে নাচাতে জয়ন্ত বাজাচ্ছে বাঁশের বাঁশি, আর তার সঙ্গে তবলার সঙ্গৎ করছে মাণিক।

সুন্দরবাবু একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—হুম্। আমার চাকরি যায়-যায়। আর তোমরা করছো আনন্দ। মজায় আছো।

জয়ন্ত বাঁশি থামিয়ে বললো—আনন্দ তো করছি না সুন্দরবাবু, চিন্তা করছি।

সুন্দরবাবু বললেন—চিন্তা করছি বললেই হলো—স্বচক্ষে দেখছি প্যাঁ প্যাঁ করে বাঁশি বাজাচ্ছো, স্বকর্ণে শুনছি বাঁশির পোঁ পোঁ আওয়াজ—এর নাম তোমার চিন্তা করা?

—আমি যে বাঁশি বাজাতে বাজাতেই চিন্তা করি, সুন্দরবাবু।

-চিন্তা করো, না ছাই করো। বাঁশি বাজিয়ে চিন্তা। যতো সব অনাসৃষ্টি। দুশ্চিন্তায় পড়েছি বটে আমি, তোমার আবার কিসের চিন্তা হে?

জয়ন্ত হেসে বললো—গভর্নমেণ্টের দশ হাজার টাকার পুরস্কার পনেরো হাজারে উঠেছে। এর পরেও একটু চিন্তা করবো না?

—হুম্। তাহলে এই ভূতুড়ে খুন-খারাপিগুলো গিয়ে তোমারও টনক নাড়িয়েছে?

—টনক না নড়লে উপায় কি? নইলে আপনাকে সাহায্য করবো কেমন করে? আপনি যে সাত ঘাটের জল খেয়ে আমার কাছেই সাহায্য চাইতে আসবেন, এটা তো জানা কথা। কাজেই আগে থাকতেই কাজ সেরে রাখছি।

সুন্দরবাবু মুখ ভার করে বললেন—আমাকে সাহায্য করবে, না কচুপোড়া করবে। এবারে সে-গুড়ে বালি। এ সব খুনের কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—মানে না পাওয়া যাক্, দুটো সূত্র আমি খুঁজে পেয়েছি।

সুন্দরবাবু ভুঁড়ির ওপরে দুই হাত রেখে মস্ত এক লাফ মেরে

সবিস্ময়ে বললেন—ছুটো সূত্র খুঁজে পেয়েছো! কোথায়?

—সেই গুণ্ডা ছু'জনের লাশ আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে এসেছি। আমার মতে খুনীদের দলে এমন একজন লোক আছে, গায়ের জোরে সে পৃথিবীতে সবচেয়ে বলবান্ লোককেও টিপে মেরে ফেলতে পারে। আর একজন লোক আছে, যে খুব শৌখিন। সে যদি বাঙালিই হয় তবে তার নাম ইন্দুভূষণ বসু বা বাঁড়ুজ্যে হলেও অবাক হবো না। সে উচ্চ শ্রেণীর দামি এসেন্স ব্যবহার করে, দোক্তা দিয়ে পান খায়।

ছু'চোখ বিস্ফারিত করে সুন্দরবাবু বলে—তাহলে তুমি খুনীদের চেনো?

—না অনুমানে বলছি। গুণ্ডাদের দেহ ছুটো দেখেছেন? হত্যাকারীর আলিঙ্গনে বা হাতের চাপে তাদের দেহের হাড়গুলো নানাস্থানে ভেঙে গেছে—তারা কোনো আশ্চর্য শত্রুর কবলে পড়েছিলো। তার পাল্লায় পড়লে আমিও বাঁচতাম না, অথচ আমার শক্তির নমুনা আপনার অজানা নেই। মৃতদেহ ছুটো গঙ্গার ধারের রাস্তার ওপর পড়েছিলো। আমি রাস্তা ছেড়ে গঙ্গার গর্ভে নেমে এই রুমালখানা দৈবগতিকে কুড়িয়ে পেয়েছি। দেখছেন, রুমালখানা রক্তমাখা? হত্যাকারী হাতের রক্ত মুছে রুমালখানা গঙ্গাজলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। কিন্তু রুমাল যে জলে না পড়ে ডাঙায় গিয়ে পড়লো, অন্ধকারে অতোটা তার নজরে আসে নি। রুমালের এককোণে তিনটে ইংরেজী হরফে তোলা রয়েছে—**I. B. B.**। ওতে আন্দাজ করতে পারি, রুমালের মালিকের নাম—যদি সে বাঙালি হয়, ইন্দুভূষণ বসু বা বাড়ুজ্যে বা অন্য কিছু! রুমালে রীতিমতো দামি এসেন্স আর দোক্তার গন্ধ পাওয়া গেছে—দোক্তা দেওয়া পান খেয়ে সে মুখ মুছেছিলো।

সুন্দরবাবু সানন্দে বলে উঠলেন—রুমালের আর এককোণে ধোপার মার্কাও রয়েছে। জয় ভগবান, হুম্।

জয়ন্ত বললো—সেইজন্যেই তো রুমালখানা আপনার হাতে দিলাম। খোঁজ নিয়ে দেখুন কোন্ থানার এলাকায় কোন্ ধোপা ঐ মার্কা, কার জামা-কাপড়ে ব্যবহার করে।

সুন্দরবাবু বেজায় ফুর্তির সঙ্গে বললেন—আঃ বাঁচলাম! এতদিনে একটা সূত্রের মতো সূত্র পাওয়া গেলো! বিলীতি পার্লামেন্টের এক সভ্য নাকি বলেছেন, কলকাতা পুলিশে অনেক অকেজো লোকের ভিড় হয়েছে। লজ্জায় আমাদের মুখ দেখাবার যো নেই।

মাণিক এতোক্ষণ পরে বললো—বিলীতি পুলিশের বাহাদুরিই আমরা দেখি, কিন্তু তারাও 'জ্যাক্-দি-রিপারে'র কি করতে পেরেছিলো?

সুন্দরবাবু বললেন—জ্যাক্-দি-রিপার কে?

—একজন অজানা হত্যাকারী। নারীদের হত্যা করে অকারণেই সে তাদের দেহ ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে ফেলে রেখে যেতো! সেইজন্যে তাকে Ripper অর্থাৎ ছেদনকারী উপাধি দেওয়া হয়েছিলো। লণ্ডন শহরে বিলীতি পুলিশের বুকের ওপর বসে রাত্রের পর রাত্রে সে নারীর পর নারী হত্যা করেছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। পুলিশ তাকে পোল্যাণ্ড থেকে আগত এক ইহুদি বলে সন্দেহ করে, তার চেহারারও বর্ণনা পায়, এমন কি বিলীতি পুলিশের বড়োকর্তার সামনে সে নিজে সশরীরে এসে দেখাও দেয়। তবু তাকে বন্দী করা সম্ভব হয়নি। সুন্দরবাবু, এসব উপন্যাসের বাজে কথা নয়, একেবারে সত্যি কথা।

জয়ন্ত বললো—মাণিক, জ্যাক্-দি-রিপারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তুমি উপকার করলে। জ্যাক্-দি-রিপারের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এখানকার এই সব হত্যাকাণ্ডের এক বিষয়ে যথেষ্ট মিল আছে। জ্যাকের মতো এ হত্যাকারীও অকারণেই নরহত্যা করছে। এ টাকাকড়ি নেয় না, খালি মুণ্ড কেটে নিয়ে পালায়। এমন মুণ্ড চুরি অর্থহীন। বিলীতি পুলিশের মতে, জ্যাক্ ছিলো বাতিকগ্রস্ত উন্মত্ত। এও তাই নাকি?

সুন্দরবাবু বললেন, পাগলে কখনো এমন চালাকের মতো পুলিশ আর সারা শহরের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ হাসিল করতে পারে?

—বাতিকগ্রস্ত পাগলদের আপনি চেনেন না, সুন্দরবাবু। কেবল বিশেষ বাতিক ছাড়া তাদের মধ্যে উন্মাদ-রোগের আর কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না।

সুন্দরবাবু বললেন—দাঁড়াও না, আগে ধোপাকে খুঁজে বের করি, তারপর তার বাতিক ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।

জয়ন্ত বললো—ধোপা সম্বন্ধে অতো বেশি নিশ্চিন্ত হবেন না সুন্দর-বাবু! কারণ হত্যাকারী যদি কলকাতার লোক না হয়, তবে? ধোপার খবর তাহলে পাবেন কেমন করে? তারচেয়ে তাড়াতাড়ি তাকে ধরবার জন্যে আর-এক চেষ্টা করা যেতে পারে।

—কি চেষ্টা? যা বলো, আমি রাজি আছি।

—রাজি আছেন? তাহলে ছদ্মবেশ পরে দু'-এক রাত বাগবাজারের খাল যেখানে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে, সেইখানে বসে থাকতে পারেন?

—কেন?

—দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থল হচ্ছে গঙ্গা বা খালের কাছাকাছি জায়গায়। আমার বিশ্বাস, হত্যাকারীরা শেষ রাতে নৌকোয় চড়ে রোঁদে বেরোয়। তারপর মনের মতো শিকারের সন্ধান পেলেই নরবলি দিয়ে আবার নৌকোয় চড়ে পালায়। আপনি থাকলে বাইরে প্রকাশ্যভাবে আজ আমরা দলবল নিয়ে কাছেই লুকিয়ে থাকবো। আপনার মাথার লোভে হত্যাকারীরা যদি এগিয়ে আসে—

সুন্দরবাবু বাধা দিয়ে বললেন—ধন্যবাদ, এ প্রস্তাবে আমার বিলক্ষণ আপত্তি আছে। আমার মুণ্ডটা যদি হঠাৎ খোয়া যায়, তাহলে খালি ধড়টা নিয়ে আমি কি করবো? হুম্! এ হচ্ছে মারাত্মক প্রস্তাব!

জয়ন্ত বললো—আপনার ভয় পাবার কোনো কারণই নেই! আমরা বন্দুক নিয়ে আপনার মূল্যবান টাক-মাথার ওপরে কড়া পাহারা দেবো।

অনেকবার না-না করে সুন্দরবাবু শেষটা রাজি হলেন।

—বেশ, তাই হবে। আমি পোর্ট-পুলিশের লোককেও একখানা মোটর বোট নিয়ে কাছাকাছি কোথাও হাজির থাকতে বলবো।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললো—সর্বনাশ, ও কথা মনেও আনবেন না! হত্যাকারীরা কি এতোই বোকা যে, পোর্ট-পুলিশের বোট চিনতে পারবে না? তারা নিশ্চয়ই অন্ধ নয়! বেশি লোকেরও দরকার নেই,

আমি আর মাণিকই আপনার মাথা বাঁচাবার পক্ষেই যথেষ্ট। বেশি লোক থাকলেই গোলমাল হবে।

রাত সাড়ে তিনটের সময়ে সুন্দরবাবু প্রাণটি হাতে করে গুটি গুটি খাল ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে এসে হাজির হলেন।

তাঁর মাথায় জটাজুট, মুখে লম্বা গোঁফ-দাড়ি, পরণে গৈরিক বস্ত্র, হাতে কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম।

খালের মুখে রেলওয়ে ব্রিজ, তার কোলেই গঙ্গার ধারে একটুখানি বাঁধানো জায়গা। সেইখানে বসে পড়ে সুন্দরবাবু চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন, জয়ন্ত ও মাণিক কোথায় লুকিয়ে আছে।

বোঝা গেলো না। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। এতোটা পথ হেঁটে আসবার সময়েও সুন্দরবাবুর সঙ্গে অন্যলোক তো দূরের কথা, একটা পাহারাওয়ালারও দেখা হয়নি। সারা শহর যেন ভয়ে দম বন্ধ করে বোবা হয়ে আছে!

কলকাতা শহর যে গোরস্থানের মতো এতো নিস্তব্ধ হয়ে থাকতে পারে, এ-কথা ধারণা করা যায় না। আগে আগে শেষ রাতে যারা প্রাতঃস্নান করতে আসতো, আজকাল তারাও দরজায় খিল লাগিয়ে ঘরের ভেতরে বসে থাকে।

নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে করলেন সুন্দরবাবু জয়ন্ত আর মাণিক যদি কাছাকাছি না থাকে? যদি তারা ঠিক সময় আসতে না পারে? তাহলেই তো খাঁড়ার এক কোপে তাঁর মুণ্ড উড়ে যাবে।

আকাশে চাঁদ নেই, শেষ রাতে গ্যাসের আলোগুলোও নিভে গেলো। গঙ্গার বুকে দূরে মাঝে মাঝে নৌকোর দাঁড় ফেলার শব্দ হয়, আর সুন্দরবাবু চমকে ওঠেন, আর ভাবেন—ঐ রে, এলো বুঝি রে!

সুন্দরবাবু ঘেমে নেয়ে উঠলেন। জপ করবার ভঙ্গিতে আড়ষ্ট হয়ে তিনি বসে রইলেন এবং মনে মনে সত্য সত্যই দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে সকাল হয়ে এলো। সুন্দরবাবু হাঁপ ছেড়ে 'হুম্' বলে উঠে দাঁড়ালেন। হত্যাকারীরা এলো না বলে তাঁর মনে এক তিলও দুঃখ হলো না।

কিন্তু নাছোড়বান্দা জয়ন্তের তাড়নায় তাঁকে পর দিনও সন্ন্যাসীর এই বিপজ্জনক অবস্থায় অভিনয় করতে হলো।

সে রাতেও চাঁদের ছুটি। গ্যাসের আলো নিভে গেলো। সুন্দরবাবুর বুক টিপ্ টিপ্, ঘর্মাক্ত কলেবর।

চোখ কপালে তুলে তিনি প্রার্থনা করলেন, ও-মা দুর্গে, দুর্গতি-নাশিনী। কাল-রাত পুইয়ে দাও মা, এর পর চাকরি গেলেও আর আমি এ মুখো হচ্ছি না। ও-মা, কখন ভোর হবে মা, কখন কাক-চড়াই ডাকবে, কখন ধাঙড়েরা রাস্তা ঝাঁট দিতে বেরোবে!

কাছেই কোথাও তিন-চারটে কুকুর যেন কি দেখে আতঙ্কে কেঁউ-কেঁউ করে কেঁদে উঠলো। সুন্দরবাবুর সন্দিগ্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টি অন্ধকারের চারিদিকে ডুবে ডুবে যাকে দেখা যায় না সেই ভয়ঙ্করকেই খুঁজে খুঁজে ফিরতে লাগলো।

হঠাৎ তাঁর গায়ে কাঁটা দিলো—গঙ্গার একটানা কুলু কুলু শব্দের সঙ্গে আর একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন! খালের জলে নৌকো চলার শব্দ। সুন্দরবাবুর মনে হলো, সে যেন মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি!

শব্দ থামলো। সব চুপচাপ। তারপর লোহার সাঁকোর রেলিঙের ওপর থেকে যেন বিষম ভারি কি একটা লাফিয়ে পড়লো।

সুন্দরবাবু কাঁপতে কাঁপতে মাথাটি একটু ফিরিয়ে ভয়ে ভয়ে আড়-চোখে তাকালেন। অন্ধকার ভেদ করে বৃহৎ আর ছায়ার মতো কি একটা মূর্তি গুঁড়ি মেরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে! দুটো প্রদীপ্ত চক্ষু, হিংস্র পশুর দৃষ্টি। এগুলো কি চক্‌চকিয়ে উঠছে? দাঁত! মানুষের মতোই বটে, কিন্তু তাকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। মানুষের আকার।

অমানুষিক মূর্তি আরো কাছে এলো। সুন্দরবাবুর নাকে ঢুকলো একটা বোঁট্‌কা দুর্গন্ধ।

এখনো জয়ন্ত আর মাণিকের সাড়া নেই। তাঁর মুণ্ড কচাং করে কাটা না গেলে কি তাদের হুঁস হবে না? তারা যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকে ...নাঃ, আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা চলে না—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। মূর্তিটাকে আর এগোতে দেওয়া উচিত নয়। সুন্দরবাবু রিভলভার বার করে খট্ করে ঘোড়া টিপে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—জয়ন্ত! মাণিক! আমাকে বাঁচাও।

রিভলভারের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই মহা আক্রোশে ও যন্ত্রণায় কে যেন বিকট এক গর্জন করে উঠলো। সুন্দরবাবুর সন্দেহ হলো, সে গর্জন মানুষের নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোমাঞ্চকর উপহার

বাগবাজারের খাল যেখানে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে সেখানে যে রেল-পথের সাঁকো আছে, কলকাতায় সেটি একটি দ্রষ্টব্য ব্যাপার। সাঁকোটি হচ্ছে দোতলা। সেটি এমন কায়দায় তৈরী যে, যখন তলা দিয়ে বড়ো বড়ো নৌকো আনাগোনা করতে চায়, তখন সাঁকোর সমস্ত একতলার অংশটি রেললাইন সুদ্ধ শূন্যে অনেকটা ওপরে উঠে যায়।

এই সাঁকোর কাছে একখানা খালি মালগাড়ি দাঁড়িয়েছিলো। তারই ভেতরে লুকিয়ে ছিলো জয়ন্ত আর মাণিক। সেইখান থেকেই তারা সুন্দরবাবুর ব্যাকুল চিৎকার শুনতে পেলো।

তখন একেবারে শেষ রাত; কিম্বা সে সময়টাকে উষার আসন্ন জন্ম-মুহূর্তও বলা যায়। যদিও তখনো আলো ফোটেনি কিন্তু রাত-আঁধারি পাতলা হয়ে আসছে ক্রমশঃ।

জয়ন্ত মাণিক চোখের নিমেষে গাড়ির বাইরে লাফিয়ে পড়লো।

আর তার পরেই তাদের মনে হলো, সাঁকোর পাশের লোহার মই বেয়ে একটা প্রকাণ্ড মূর্তি প্রতি পদক্ষেপে মহাশব্দ সৃষ্টি করে খুব তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে যাচ্ছে। অতো বৃহৎ মূর্তির অতখানি তৎপরতা বিস্ময়কর বলেই মনে হয়।

ওদিক থেকে সুন্দরবাবু রিভলভারে আরো তিন-চার বার অগ্নিবৃষ্টি করলেন।

জয়ন্ত ও মাণিক যখন সাঁকোর কাছে এসে পড়লো, সুন্দরবাবু হাঁউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, জয়ন্ত ভাই! আমাতে আর আমি নেই। মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি।

কিন্তু তারা কেউ তাঁর কাঁদুনি শোনবার জন্যে ফিরে তাকিয়ে দাঁড়ালো না, তীব্র বেগে ছুটে এসেই লোহার মই বেয়ে সাঁকোর দোতলায় উঠতে লাগলো!

সুন্দরবাবু আবার একলা। ভয়ে তাঁর চোখের সামনে ফুটলো হাজার হাজার সর্ষে ফুল এবং তাঁর কানে ঢুকলো আর একটা আওয়াজ। এক-খানা নৌকো জলে ছপাং ছপাং শব্দ তুলে খালের এপার ছেড়ে ওপারে চলে যাচ্ছে।

গঙ্গার ধারে সারি সারি নৌকো বাঁধা ছিলো। তার ভেতরে যে সব মাঝি-মাল্লা ঘুমোচ্ছিলো, সুন্দরবাবুর বিকট চিৎকারে ও রিভলভারের শব্দে তাদের ঘুম গেলো ভেঙে—তারাও বাইরে বেরিয়ে এসে মহা হৈ-চৈ বাধিয়ে তুললো। তাদের গোলমাল শুনে সুন্দরবাবু কতকটা ধাতস্থ হলেন—অন্ধকারের ভয়াবহ নির্জনতা ও বুক-চাপা স্তব্ধতার কবল থেকে নিস্তার পেয়ে তিনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

সেই হাতির মতো ভারি অদ্ভুত জীবটা সাঁকোর দোতলায় উঠে ধূম-ধাড়াক্কা লাগিয়ে দিয়েছিল, এখন সে সব গেছে থেমে থুমে। জয়ন্ত ও মাণিকেরও সাড়া-শব্দ নেই। ব্যাপার কি? তাদের দেহের সঙ্গে মুণ্ডের সম্পর্ক এখনো বজায় আছে তো?—মনে এই দুর্ভাবনার উদয় হতেই সুন্দরবাবুর কান্না পেলো। কিন্তু তবু তাঁর এমন ভরসা হলো না যে,

সাঁকোর ওপরে উঠে ব্যাপার কী, উঁকি মেরে দেখে আসেন।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই পূর্ব-আকাশে যখন উষার প্রথম আলোর ঝর্ণা খুলে গেলো, গাছে গাছে পাখিরা যখন প্রভাত-সূর্যের উদ্দেশ্যে বন্দনা-গীত রচনা করতে লাগলো, তখন দেখা গেলো—জয়ন্ত ও মাণিক সাঁকোর রেলপথের ওপর দিয়ে আবার ফিরে আসছে।

সুন্দরবাবু বললেন—হুম! তোমরা উঠলে সাঁকোর দোতলায়, নেমে পড়লে কখন হে?

জয়ন্ত বলল—অনেকক্ষণ। সেই মূর্তিটাকে ধরবার জন্যে আমরা সাঁকোর ওদিককার সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়েছিলাম।

—তারপর?

—তারপর আবার কি! আপনি অসময়ে রিভলভার ছুঁড়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমরা তাকে ধরবো কেমন করে?

—হুম! অসময়েই রিভলভার ছুঁড়েছি বটে! স্বচক্ষে দেখলাম, পাঁচ-ছ' হাত তফাতে একটা কিম্ভুতকিমাকার রাক্ষস! তার চোখ দুটো করছে দপ্ দপ্ আর দাঁতগুলো করছে চক্ চক্! আর তার গায়ে কী বোঁট্‌কা গন্ধ রে বাবা! রিভলভার ছুঁড়তে আর এক সেকেণ্ড দেরি করলে তোমরা কি আমার মাথাটা আর কাঁধের ওপরে খুঁজে পেতে?

—রিভলভার ছুঁড়ে তাকে যদি বধ করতে পারতেন, তা হলেও একটা কথা ছিলো!

—কি করবো ভাই, টিপ্ যে ঠিক হলো না, আমার হাত যে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছিলো। আমি তো তবু রিভলভার ছুঁড়ে তাকে ভয় দেখিয়েছি. কিন্তু তাকে দেখলে নিশ্চয়ই তোমাদের দাঁত কপাটি লেগে যেতো!···কিন্তু সে পালালো কোন্ দিকে?

—খালের ওপারে গুদামের পর গুদাম, তারই অলিগলির ভেতরে বোধহয় সে লুকিয়ে আছে। অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেলো না, কিছুই দেখা গেলো না, কিন্তু আমরা আরো তিন-চারজন লোকের জুতো পরা পায়ের শব্দ পেয়েছি। যেন তারাও দৌড়ে পালাচ্ছিলো!

— হুম্! গলা-কাটারা নিশ্চয়ই দল বেঁধে এসেছিলো, সেই কিম্ভুত-কিমাকারের আবির্ভাবের আগে আর পরে খালের মুখে আমি নৌকোর শব্দ শুনেছি। নৌকোয় চড়ে তারা এসেছিল, আবার পালিয়ে গিয়েছে।

জয়ন্ত বলল—সে-কথা আমরাও জানি। আমরা যখন সাঁকোর দোতলায়, নৌকোখানা তখন খালের ওপারে গিয়ে লাগলো। তারপরেই শুনলাম দুড়দাড় করে পায়ের শব্দ। কিন্তু নিচে নেমে নৌকোর মধ্যে জন-প্রাণীদের দেখতে পেলাম না।

মাণিক বলল—কিন্তু নৌকোর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে এই রাম-দা-খানা। তাড়াতাড়িতে তারা ভুলে গেছে। সে একখানা বড়ো চক্চকে রাম-দা তুলে দেখালো।

সুন্দরবাবু শিউরে উঠে বললেন—বাপ্ রে, ঐ রাম-দাটা এনেছিলো তাহলে আমার গলাতেই বসাতে?

মাণিক বললো—রাম-দার বাঁটের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওখানে একটি 'S' হরফ খোদা আছে।

সুন্দরবাবু সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে দেখে বললেন—তাই তো হে, তাই তো!......কিন্তু জয়ন্ত, সেই রুমালের কোণে ছিলো I. B. B. এই তিনটে অক্ষর!

জয়ন্ত বললো—হয়তো এটা হচ্ছে দলের আর কোনো লোকের নামের আদ্যাক্ষর।

—সে-নৌকোখানা আর একবার ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার।

—নৌকোখানা একজন পাহারাওয়ালার জিম্মায় রেখে এসেছি। কিন্তু সেখানা পরীক্ষা করে নতুন কিছু জানা যাবে বলে মনে হয় না। তার গায়ের নম্বর পর্যন্ত তুলে ফেলা হয়েছে। হয় সেখানা চোরাই নৌকো, নয় রাতের অন্ধকার ছাড়া তাকে চালানো হয় না। কিন্তু সুন্দরবাবু, যদিও আজকে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো তবু আমরা অন্ধকার হাতড়ে গোটা কতক দরকারি সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছি। প্রথমতঃ দলের একজনের আদ্যাক্ষর হচ্ছে 'I', আর একজনের

'S' ; দ্বিতীয়তঃ আপনার কথা যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে, ওদের দলে একজন অদ্ভুত চেহারার অতিকায় লোক আছে, আর সে-ই সর্ব-প্রথমে চুপি চুপি এসে আক্রমণ করে; তৃতীয়তঃ তারা মানুষের মুণ্ড কেটে নেয় রাম-দার কোপ মেরে, কারণ এর বাঁটের ধারে শুকনো রক্তের দাগ লেগে রয়েছে; চতুর্থতঃ এরা বলি দেবার মানুষ খুঁজে বেড়ায় শেষ রাতে গঙ্গার ধারে ধারে নৌকোয় চড়ে। উপরন্তু, ধোপার একটা মার্কাও পাওয়া গেছে। এতোগুলো সূত্র এতো সহজে পাওয়া ভাগ্যের কথা, ওর একটা না একটা নিশ্চয়ই আমাদের কাজে লেগে যাবে।

সুন্দরবাবু বললেন—তোমার কথা যদি সত্যি হয়, ঐ হতচ্ছাড়া গলা-কাটার দল নৌকোয় চড়েই আনাগোনা করে থাকে, তাহলে এ-মামলা নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে মরি কেন? এসবের তদন্ত করুক পোর্ট-পুলিশ, আমাদের পক্ষে মানে মানে সরে দাঁড়ানোই ভালো।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললো—তা আর হয় না সুন্দরবাবু। মামলাটা হাতে যখন নিয়েছি, আমাদের কৌতূহল যখন জেগে উঠেছে, তখন আপনি সরে পড়লেও আমরা আর ছাড়বোনা। পোর্ট-পুলিশের সঙ্গেই কাজ করবো।

সুন্দরবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন—ঐ তো তোমাদের রোগ—একগুঁয়েমির জন্যই একদিন তোমরা পটল তুলবে! বেশ! আমিও তোমাদের সঙ্গেই থাকবো না হয়, কিন্তু তোমাদের কাছে এই মিনতি, আমাকে আর কখনো সন্ন্যাসী সাজতে বলো না। ছিপ ধরে মৎস্য-শিকার করবে তোমরা আর মাথাটা হবে তোমাদের শখের টোপ—এ মারাত্মক ব্যবস্থাটা তেমন যুৎসই বলে মনে হচ্ছে না।

মাণিক বললো—সুন্দরবাবু, এতোদিন আমি ভাবতাম যে, আপনি নিজের দেহের মধ্যে টাক-পড়া দুঃখিত মাথাটার চেয়ে হৃষ্টপুষ্ট ভুঁড়িটিকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন! কিন্তু আজ দেখছি আপনি মাথার জন্যেও মাথা ঘামান।

সুন্দরবাবু মুখ খিঁচিয়ে বললেন—মাণিকের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা

শুনলে হাড় যেন জ্বলে যায়। চলো জয়ন্ত, এখন বাসার দিকে ফেরা যাক্।

তখন সুন্দরবাবু, জয়ন্ত ও মাণিকের চারিদিকে কৌতূহলী ও উত্তেজিত জনতার সৃষ্টি হয়েছিলো এবং তারা সবাই বিশেষ আগ্রহে ঠেলাঠেলি করে সব কথা শোনবার চেষ্টা করছিলো। আকাশে তখন সূর্য দেখা দিয়েছে অন্ধকারের সব রহস্য চোখের সুমুখ থেকে বিলুপ্ত হয়ে। দু'-তিনজন পাহারাওয়ালাও এতোক্ষণ পরে নিরাপদ গুপ্তস্থান থেকে অকুতোভয়ে আত্মপ্রকাশ করে বুক ফুলিয়ে লাঠি হাতে ভিড় তাড়াতে তাড়াতে নিজেদের জীবন্ত অস্তিত্বের প্রমাণ না দিয়ে পারলো না।

সুন্দরবাবু তাদের দেখেই খাপ্পা হয়ে বললেন—ওরে ডাল রুটি চোট্টা হনুমান পাঁড়ে আর জম্বুবান চোবের বাচ্চারা। এতোক্ষণ কোন্ গর্তে ঢুকে হিল্লী-দিল্লী ফতে করছিলে, যাদু? গরিব-নিরীহদের গলাধাক্কা দিয়ে এখন তো খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছো। কিন্তু একটু আগে আমি যখন স্কন্ধ কাটা হবার ভয়ে চেঁচিয়ে পাড়া ফাটাচ্ছিলাম, তখন তোমরা কানে তুলো গুঁজে কোথায় ছিলে, বাপধন? রোসো, সব রাস্কেলের নামে রিপোর্ট করছি।

সকলে গঙ্গার ধার ছেড়ে খালের পাশ দিয়ে বাড়িমুখো হলো।

জয়ন্ত কড়া নাড়ামাত্র বেয়ারা এসে ভেতর থেকে দরজাগুলো খুলে দিলো। তারপর বললো—একটা হিন্দুস্থানী লোক এসে আপনাকে খুঁজছিলো।

জয়ন্ত একটু আশ্চর্য হয়ে বললো—এতো সকালে কে সে?

—জানি না হুজুর। একটা কাঠের বাক্স হাতে দিয়ে বললো, তার বাবু নাকি সেটা হুজুরকে ভেট দিয়েছেন। বলেই সে তাড়াতাড়ি চলে গেল। বাক্সটা আমি বৈঠকখানার টেবিলের ওপরে রেখে দিয়েছি।

জয়ন্ত আরো বেশি বিস্মিত হয়ে বলল—দুনিয়ায় মাণিক ছাড়া এমন বন্ধু কে আছেন, কাক-চিল ডাকতে না ডাকতেই আমাকে ভেট পাঠাবার জন্যে যিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন? চল তো, বৈঠকখানায় ঢুকে আগে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যাক।

সকলে বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখল, মাঝখানের বড়ো টেবিলটার ওপরে বসানো রয়েছে একটা কাঠের প্যাকিং বাক্স। তার চারদিকেই পেরেক আঁটা। একদিকের পেরেকগুলো খুলতে খুলতে জয়ন্ত বলল, উপহারের কিঞ্চিত নূতনত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে। বাক্সটা বেশ ভারি।

একটু পরেই ডালাটা খুলে গেল। বাক্সের ভেতর দিকে দৃষ্টিপাত করে জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললো—চমৎকার উপহার! সুন্দরবাবু, এরকম উপহার পেলে আপনি বোধ হয় খুবই খুশি হতেন?

সুন্দরবাবু বললেন—উপহার লাভের ভাগ্য আমার নেই। আমার বরাত চিরদিনই খারাপ। দেখি, তুমি কি পেলে? কিন্তু এগিয়ে গিয়ে বাক্সের ভেতরে একবার মাত্র উঁকি মেরেই তিনি যেন বিষম ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এসে বিকট স্বরে বলে উঠলেন—হুম্ হুম্, হুম্ হুম্!

মাণিকও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বাক্সের ভেতরে তাকিয়ে সভয়ে দেখলো, তার চোখের পানে আকৃষ্ট চোখে চেয়ে আছে একটা রক্তহীন রোমাঞ্চকর কাটামুণ্ড। সে মুণ্ড ভারতীয়ের নয়, ইংরেজের।

জয়ন্ত কঠোর রবে অট্টহাস্য করে উঠলো—হে অজানা বন্ধু, তোমাকে ধন্যবাদ! এ-উপহারের কথা জীবনে আমি ভুলবো না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কেল্লা মার দিয়া

এ কী ভয়ানক ভেট্!

সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে আরো পিছিয়ে পড়ে একখানা চেয়ারের ওপরে তাঁর প্রায়-অবশ বিপুল দেহখানি স্থাপন করলেন। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—ফ্যান্ খুলে দাও, ফ্যান্ খুলে দাও। হুম্! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

মাণিক বিজলি-পাখা চালিয়ে দিলো। জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাক্সের ভেতরটা আরো ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলো।

নৃমুণ্ড-শিকারীরা যে একজন ইংরেজ খালাসিকেও বলি দিয়েছে, খবরের কাগজে সে কথাটাও প্রকাশ পেয়েছে যথাসময়ে। জয়ন্ত বুঝলো, এ হচ্ছে সেই খালাসিটারই কাটামুণ্ড। কোনো ধারালো অস্ত্রের এক-কোপে বেচারার মুণ্ডটাকে দেহ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ দেখে হঠাৎ কাটামুণ্ডের মাথার সোনালি চুলের ভেতর একবার হাত বুলিয়ে নিলো।

তারপর একটু বিস্মিত স্বরে বললো—দেখছি, মুণ্ডটাকে স্পিরিটে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিলো। চুলগুলো এখনো ভিজে রয়েছে, বাক্সের ভেতর থেকেও স্পিরিটের গন্ধ বেরোচ্ছে।

মাণিক বললো—তার মানে ?

—মুণ্ডটাকে বোধ হয় জিইয়ে রাখবার চেষ্টা হয়েছিলো।

দুই চোখ পাকিয়ে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন—ও বাবা, সে কি? বরফ-টরফ দিয়ে লোকে মাছ-মাংসই টাট্কা রাখে জানি, খাবে বলে। স্পিরিটের মধ্যে ফেলে এরা কাঁচা মড়ার মাথা টাট্কা রাখতে চেয়েছে কেন ? এরা মানুষের মুড়ো খায় নাকি ?

মাণিক বললো—হতে পারে। আর সেইজন্যেই হয়তো আপনার মুড়োর ওপরে ওদের লোভ পড়েছিলো।

সুন্দরবাবু রেগে টং হয়ে বললেন—তুমি কি বলতে চাও, মাণিক ?

—আমি বলতে চাই, আপনার মুড়োটাও পেলে ওরা হয়তো পচতে দিতো না, স্পিরিটে ভিজিয়ে টাট্কা রাখতো। তারপর কোনো শুভ-দিনে হয়তো সুন্দরবাবুর মুড়ো দিয়ে সুন্দর ডাল রেঁধে ফেলতো। তবে দুঃখের কথা এই যে, সে মুড়োর ডাল খাবার জন্যে কেউ আমাদের নিমন্ত্রণ করতো না।

সুন্দরবাবু এতো ক্রুদ্ধ হলেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটা শব্দ পর্যন্ত বেরোলো না।

জয়ন্ত বললো—মাণিক, ঠাট্টা-ঠুট্টি রেখে এখন কাজের কথা শোনো। ....এই কাটা-মুণ্ডটা আমাদের কাছে কেন পাঠানো হয়েছে?

মাণিক বললো—নিশ্চয়ই আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে। খুনীরা আমাদের চেনে আর ভয় করে, তাই তারা বলতে চায়, আমরা যদি ওদের পথ থেকে সরে না দাঁড়াই, তাহলে আমাদেরও ঐ দশা হবে।

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললো—বোধ হয় তোমার আন্দাজ ভুল নয়! কিন্তু এখন কতকগুলো কথা ভেবে দেখো। আমরা যে এই মামলা হাতে নেবো, কালকের আগে আমরাই তা জানতাম না। সুতরাং এটা বোঝা শক্ত নয় যে, খুনীরা আমাদের খোঁজ পেয়েছে পরে। কিন্তু পরে—কখন? কাল রাতে আমরা যে তাদের ধরবার জন্যে কোনো ফাঁদ পেতেছি, সে-কথা নিশ্চয়ই তারা জানতো না, কারণ জানলে তারা ফাঁদে পা দিতো না। সেটা জোর করেই বলা যায়। আর কাল রাতের ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারেও তারা আমাদের চিনতে পারে নি। তাহলে তারা কখন আমাদের আবিষ্কার করেছে?

মাণিক একটু ভেবে বললো—খুব সম্ভব আজ সকালে।—বেশ, তোমার এই অনুমান ধরেই অগ্রসর হওয়া যাক। ভোর হবার পর আমরা গঙ্গার ধারে অপেক্ষা করেছিলাম আধ ঘণ্টার বেশি নয়। তারপর সেখান থেকে বাসায় ফিরতে আমাদের সময় লেগেছে বড় জোর পনেরো মিনিট।

সুন্দরবাবু অধীর স্বরে বললেন—তোমাদের জ্বালায় আর পারি না, জয়ন্ত! এই কি আধঘণ্টা আর পনেরো মিনিটের হিসেব রাখবার সময়?

জয়ন্ত বললো—সুন্দরবাবু, আপনি এখন আমাদের কথায় কান পাতবেন না—তার বদলে চা, টোস্ট্ আর এগ-পোচ নিয়ে ব্যস্ত থাকুন!

সুন্দরবাবু বললেন—ঐ কাটা-মুণ্ডর সামনে এসে আমি খাবার খাবো? হুম্, থুঃ থুঃ।

—তাহলে চুপ করে বসে থাকুন, কারণ এখন খুনীদের আড্ডা আবিষ্কারের চেষ্টা করছি।

সুন্দরবাবু অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন—ছাই করছো।

সে-টিপ্পনি কানে না তুলে জয়ন্ত বললো—শোনো মাণিক, দেখা যাচ্ছে, সকাল হবার পর আমরা বাড়ির বাইরে ছিলাম মোট পঁয়তাল্লিশ মিনিট মাত্র। তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐটুকু সময়ের মধ্যেই কেউ আমাদের দেখেই ছুটে বাসায় গিয়ে, 'স্পিরিটে' চোবানো মড়ার মাথা তুলে নিয়ে—প্যাকিং বাক্সে পুরে, তাড়াতাড়ি আমাদের আগেই এখানে রেখে পালিয়ে গেছে।

মাণিক উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলো—শাবাশ্‌ জয়ন্ত, শাবাশ্‌। তুমি তো বলতে চাও, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে যে লোক এতগুলো কাজ করেছে, সে নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ি থেকে দূরে বাস করে না!

—ঠিক তাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার আড্ডা গঙ্গা কি খালের ধার থেকে খুব কাছেই। দেখছো মাণিক, আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র কতোটা ছোট্ট হয়ে পড়লো? সুন্দরবাবু, আপনি কি বলেন?

সুন্দরবাবু বললেন—হুম্‌, কিছুই না। তোমার বুদ্ধির দৌড় দেখে হতভম্ব হয়েছি! এতো সহজে এতো বড় আবিষ্কার। আশ্চর্য!

জয়ন্ত রুপোর নস্যদানি বার করে নস্য নিতে নিতে বললো—এখন কথা হচ্ছে, খাল আর গঙ্গার আশে-পাশে বড় কম রাস্তা আর বাড়ি নেই। কোন্‌ রাস্তায় আর কোন্‌ বাড়িতে গেলে আমরা খুনীদের আড্ডা খুঁজে বার করতে পারবো?

সুন্দরবাবু আবার হতাশ হয়ে পড়ে বললেন—হুম্‌, ওটা কিন্তু খুঁজে বার করা অসম্ভব

জয়ন্ত 'প্যাকিং' বাক্সের দিকে অল্পক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইলো। তারপর চুল ধরে মুণ্ডটাকে টেনে তুলে বললো—প্যাক করার সময়ে মুণ্ডটার চারপাশে দেখছি কতকগুলো খবরের কাগজ পুরে দেওয়া হয়েছে। মাণিক, কাগজগুলো বের করে ফেলো তো!

মাণিক, কাগজগুলো টেনে নিয়ে বললো—তিনদিনের তিনখানা স্টেট্‌স্‌ম্যান।

জয়ন্ত মুণ্ডটাকে আবার বাক্সের ভেতরে রেখে বললো—হুঁ। অতএব

ধরে নেওয়া যেতে পারে, খুনীদের দলের কেউ নিয়মিতভাবে 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পড়ে। তাহলে আমরা কোনও মূর্খ, সাধারণ অপরাধীর পাল্লায় পড়িনি —তার পেটে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ইংরেজি বিদ্যা আছে! হয়তো সে 'স্টেট্‌স্‌ম্যানে'র বাঁধা গ্রাহক।—বলতে বলতে সে দ্রুতপদে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেলো।

সুন্দরবাবু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন—জয়ন্ত অমন ছুটে পাগলের মতো হঠাৎ কোথায় গেলো হে?

মাণিক বললো—বোধ হয় আপনার জন্যে চা আর খাবার আনতে।

সুন্দরবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন—যে হাতে সে ঐ কাটা-মুণ্ড ছুঁয়েছে, সেই হাতে আমার খাবার আনবে? আমি কখনো খাবো না।

—খাবেন না কি, খেতেই হবে!

—খেতেই হবে? ইস, জোর নাকি? ওর ছোঁয়া খাবার যদি খাই, তাহলে আমি তো অনায়াসেই মড়ার মাংসও খেতে পারি! হুম্‌, জয়ন্তকে মানা করে দাও, আমার এখনি গা বমি-বমি করছে। হুম্‌, ওয়াক্‌—ওয়াক্‌!

মাণিক বহু কষ্টে সুন্দরবাবুকে শান্ত করে বললো—ভয় নেই সুন্দরবাবু, আজ আর আপনাকে খেতে অনুরোধ করবো না, আপনার গা বমি-বমি থামিয়ে ফেলুন।

—তা যেন থামালাম, কিন্তু আজ আমি এখুনি বিদায় হতে চাই।

—না না না, আর একটু বসুন। জয়ন্ত আগে ফিরে আসুক।

মিনিট পনেরো পরে ঘন ঘন নস্য নিতে নিতে জয়ন্ত ফিরে এসে বললো—আমি 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' অফিসের এক বিশেষ বন্ধুকে ফোন করতে গিয়েছিলাম।

—কেন?

—আমি জানি এ-অঞ্চলের খুব কম বাঙালিই স্টেট্‌স্‌ম্যান-এর বাঁধা গ্রাহক। সুতরাং গঙ্গা আর খালের সঙ্গমস্থলে কাছাকাছি রাস্তাগুলোর মধ্যে 'স্টেট্‌স্‌ম্যানের' কোন্‌ কোন্‌ নিয়মিত গ্রাহক আছেন, ফোনে সেই

খবরটাই জানবার চেষ্টা করছিলাম।

—কি জানতে পারলে?

—জনকয়েক গ্রাহকের নাম আর ঠিকানা জানতে পেরেছি।

—তারপর?

একজনের কিছু সন্ধান নিতে হবে। তাঁর নাম সত্যচরণ চৌধুরী, তিনি ১৫নং বিষ্ণুবাবু লেনে থাকেন। বিষ্ণুবাবু লেন থেকে গঙ্গার ধারে যেতে বা আমার বাড়িতে মিনিট কয়েকের বেশি লাগে না।

সুন্দরবাবু বললেন—কিন্তু এই তুচ্ছ কারণে কারুর ওপর সন্দেহ করা ঠিক নয়।

—সুন্দরবাবু, আপনি কি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন যে, রাম-দার ওপরে S হরফ খোদা আছে। কে বলতে পারে, ওটা সত্যচরণ চৌধুরীর নামের আদ্যাক্ষর নয়?

সুন্দরবাবু লাফ মেরে বলে উঠলেন—ঠিক! হুম্!

জয়ন্ত বললো—সেই রক্তাক্ত রুমালের কোণে ছিলো **I.B.B.** এই তিনটে অক্ষর। সুন্দরবাবু, আপনি এখন S-কে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে থানায় গিয়ে খবর নিন, রুমালে ধোপার মার্কার কোনো কিনারা হলো কিনা।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলায় জয়ন্তের ফোন টুং টুং করে বেজে উঠলো।

—মাণিকের তবলার সঙ্গতের সঙ্গে জয়ন্ত তখন তার নিয়মিত সাধনায় নিযুক্ত ছিলো। তাড়াতাড়ি বাঁশি ফেলে ফোন ধরলো।

—হ্যালো!

—হুম্।

—কি ব্যাপার, সুন্দরবাবু?

—বিষম ব্যাপার! ধোপার খোঁজ পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলেরই ধোপা। তার সঙ্গে গিয়ে যার রুমাল তাকে গ্রেপ্তার করেছি। তার নাম ইন্দুভূষণ ব্যানার্জি। মার্চেন্ট অফিসে কেরাণীগিরি করে।

—তাঁর বাড়ির ঠিকানা কি?

—১৫-এ, বিষ্ণুবাবুর লেন। তোমার সত্যচরণ চৌধুরীর বাড়ির গায়েই তার বাড়ি।

—কিন্তু আপনি কি সত্য চৌধুরীর বাড়িতেও কোন খোঁজ নিয়েছেন?

—না, বলোতো এক্ষুণি নিই।

—আপনাকে সে-সব কিছুই করতে হবে না। খোঁজ যা নেবার আমিই নিয়েছি। আপনি বরং ইন্দুভূষণকে নিয়ে আমার এখানে আসুন।

—হুম্, এখনি যাচ্ছি। জয়ন্ত, আমার প্রাণটা ভারি খুশি হয়ে উঠেছে—কেল্লা মার দিয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জীবন্ত ও সবাক বস্তা

ফোনের রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে জয়ন্ত যেন আপনমনেই বললো, ১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে থাকে সত্যচরণ চৌধুরী, আর ১৫-এ নম্বরে থাকে ইন্দুভূষণ ব্যানার্জি। আশ্চর্য!—সে ফোনে এইমাত্র যা শুনলো, মাণিকের কাছে সব খুলে বললো।

মাণিক উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠলো—বলো কি জয়ন্ত, বলো কি! রাম-দার ওপরে খোদা ছিলো **S** অক্ষর আর রুমালে ছিলো **I. B. B.** এই তিন অক্ষর। দুই ঘটনাস্থল থেকে আমরা এই দু'টি সূত্র পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও এ সূত্র দু'টির কোনোই দাম ছিলো না। কলকাতায় কতো হাজার লোকের নামের সঙ্গে ঐ **S** আর **I. B. B.** অক্ষরগুলি মিলে যায়, কে তার হিসেব রাখে? দৈবক্রমে কতো সহজে আসল লোকদের ঠিকানা আবিষ্কার করে ফেললাম। জয়ন্ত, ভাগ্যদেবী আমাদের সহায়, নইলে এটা সম্ভবপর হতো না।

জয়ন্ত বললো—গোয়েন্দারা যতো বুদ্ধিমানই হোক্, ভাগ্যদেবীর অনুগ্রহ তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত দরকার। আবার, অপরাধীদের ওপর চালাকিও তাদের অনেক কাজে আসে। ধরো, এই নৃমুণ্ড-শিকারীদের কথা। কাটা-মুণ্ড ভেট পাঠিয়ে ওরা যদি আমাদের মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা না করতো, তাহলে বিষ্ণুবাবুর লেনের সত্যচরণ চৌধুরীর ওপরে আমাদের কোনো সন্দেহই হতো না। ওরা তিন-তিনটে মারাত্মক ভুল করেছে। প্রথম, রক্তাক্ত রুমালখানা ঘটনাস্থলের কাছে ফেলে গেছে। দ্বিতীয়, রাম-দাখানাও নৌকো থেকে তুলে নিয়ে যায় নি। তৃতীয়, উপরি উপরি তিন দিনের 'স্টেট্স্‌ম্যান' প্যাকিং বাক্সে রেখে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তাদের দলের কেউ ঐ কাগজখানার নিয়মিত পাঠক। হ্যাঁ, ওদের চার নম্বরের ভুলের কথাও বলি। ওরা আজ সকালেই অতো শীগ্‌গির আমাদের ভয় না দেখালেই ভালো করতো। ঘণ্টাকয়েক অপেক্ষা করার পর মুণ্ডটা পাঠালে আমরা তো কিছুতেই ধরতে পারতাম না যে, খুনীরা আমাদের বাড়ির এতো কাছে থাকে।

মাণিক বললো—তুমি তো আজ বিকেলে বাইরে বেরিয়েছিলে। কোথায় গিয়েছিলে কিছুই তো বললে না?

—গিয়েছিলাম বিষ্ণুবাবুর লেনে সত্য চৌধুরীর খবর নিতে। কিন্তু বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। বিষ্ণুবাবুর লেনের ১৫ নম্বর বাড়ির সামনেই এক মুদিখানা আছে। মুদির সঙ্গে ভাব করে জানলাম, সত্য চৌধুরী হচ্ছে নাকি বিহার অঞ্চলের এক জমিদার! কলকাতার ও-বাড়িখানা সে গেলো বছরে কিনেছে। মাঝে মাঝে ওখানে থাকে, মাঝে মাঝে দেশে যায়। বয়স হবে চল্লিশ। ভীষণ শক্তি, এ বছরে এমন ঘটা করে কালিপূজো করেছে যে, তেমন ঘটা এখানকার কেউ কখনো দেখেনি। দারুণ লম্বা-চওড়া আর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চেহারা—তাকে দেখলে শৌখীন জমিদার বলে মনে হয় না—মনে হয়, সেকালকার কাপালিক বলে। গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা! প্রতি অমাবস্যায় রক্তবস্ত্র পরে কালী-পূজোয় বসে। পাড়ার কারোর সঙ্গে মেলামেশা করে না, তবে তার

লোকের অভাব নেই। অনেক চাকর, দারোয়ান আর কর্মচারি সেখানে বাস করে।

মাণিক বললো—১৫-এ নম্বরের বাড়ি থেকে সুন্দরবাবু যে ইন্দু বাঁড়ুজ্যেকে ধরেছেন, সেও নিশ্চয়ই তাহলে ঐ সত্য চৌধুরীরই চ্যালা ?

—তাই তো হওয়া উচিত। নইলে ইন্দুর নাম লেখা রক্তাক্ত রুমাল ঘটনাস্থলে পাওয়া যেতো না। সত্য চৌধুরীর বাড়ির পাশেই আছে হাত তিনেক চওড়া সরু গলি। তার পরই ছোটো ছোটো তিনখানা বাড়ি। তাদের নম্বর হচ্ছে ১৫-এ, ১৫-বি, ১৫-সি। সে বাড়িগুলি দেখলে মনে হয়, একখানা বাড়িকেই যেন তিন অংশে ভাগ করা হয়েছে। এর বেশি আর কিছু আমি লক্ষ্য করিনি।...ব্যস, আর কোনো কথা নয়। ঐ শোনো, সুন্দরবাবুর 'হুম্' বলে হুহুঙ্কার।...(উচ্চকণ্ঠে) আসুন সুন্দর-বাবু, আসামীকে নিয়ে ওপরে আসুন!

সিঁড়িতে দুমদাম পায়ের শব্দ। তারপর প্রথমেই আবির্ভূত হলেন বিজয়ী বীরের মতো স্ফীত বক্ষে, দীপ্ত চক্ষে, গর্বিত ভঙ্গিতে সুন্দরবাবু! তারপর দু'জন পাহারাওয়ালার মাঝখানে দেখা গেলো হাতকড়ি পরা ও কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় আসামীকে।

সুন্দরবাবু সদম্ভে বললেন—হুম্! এই নাও ভায়া তোমার মুণ্ড-শিকারী ইন্দু বাঁড়ুজ্যেকে। দেখছো তো, কতো চট্‌পট্ কাজ হাসিল করে ফেললাম ? হেঁ হেঁ বাবা, তোমাদের মতো শখের গোয়েন্দার সঙ্গে এই আমাদের তফাৎ।

কিন্তু জয়ন্ত ও মাণিক তখন সুন্দরবাবুর মুখ-শাবাশি শুনছিলো না। তারা নিষ্পলক নেত্রে বোবা বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলো আসামী ইন্দু বাঁড়ুজ্যের দিকে।

এই কি এতগুলো হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়কের মূর্তি ? তার অতিশয় রোগা লিক্‌লিকে দেহখানা সামনের দিকে বেঁকে পড়েছে কুমড়োর ফালির মতো—একটা ঠেলা মারলেই সে-দেহ যেন মাটিতে পড়ে ঠুন্‌কো কাঁচের পেয়ালার মতো ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। মুখখানা ভয়ে মড়ার

মতো সাদা, চোখ দুটো তাড়া খাওয়া খরগোসের মতো বিস্ফারিত এবং হাত-পাগুলো কাঁপছে থর থর করে।

জয়ন্ত ও মাণিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে ইন্দু ধপাস করে মাটির ওপরে বসে পড়লো এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

কলকাতার বুকের ওপরে বেপরোয়ার মতো যারা এমন ভয়াবহ খুনের পর খুন করতে পারে, তাদের কেউ কখনো এমন কাপুরুষ হয়।

সুন্দরবাবু হুমকি দিয়ে বলে উঠলেন—থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে! আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না। যখন আমার মুণ্ডটা কচ্ করে কেটে ফেলতে এসেছিলে তখন নিজের প্রাণের মায়া হয়নি চাঁদ?

জয়ন্ত দু'পা এগিয়ে গিয়ে নরম স্বরে বললো—তোমার নাম কি?

অশ্রুকাতর কণ্ঠে আসামী বললো—শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুন্দরবাবু বললেন—হুম, শ্রীইন্দুভূষণ, না ছাই। বিশ্রী ইন্দুভূষণ।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করলো—তুমি কি করো?

—টমসন-মরিসনের অফিসে চাকরি করি।

—কতো টাকা মাইনে পাও?

—ষাট টাকা।

—১৫-এ বিষ্ণুবাবুর লেনে তোমার সঙ্গে আর কে কে থাকে?

—আমার স্ত্রী, এক ছেলে আর এক মেয়ে। ওখানে আমাদের অনেক কালের বাস। আমরা তিন ভাই পাশাপাশি তিনখানা বাড়িতে থাকি, আগে ও বাড়িগুলো এক ছিলো, এখন ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।

—সত্য চৌধুরীর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?

—খুব অল্প। তিনি জমিদার মানুষ, আমাদের মতন গরীব লোককে মোটেই কেয়ার করেন না। আমাদের বাড়িগুলো তিনি কিনে নিতে চান আমরা রাজি নই। এই সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একবার আমার কথাবার্তা হয়েছিলো।

—আচ্ছা ইন্দু, তুমি জানো তো কিছুদিন আগে গঙ্গার ধারে ডবল খুন হয়েছিলো আর সেইখানেই তোমার একখানা রক্তমাখা রুমাল কুড়িয়ে

পাওয়া গেছে?

ইন্দু আবার কাঁদতে লাগলো।

—কাঁদছো কেন? ও রুমাল কি তোমার নয়?

ইন্দু সে-কথার জবাব না দিয়ে এবার হাঁউ-মাউ করে কেঁদে উঠে বললো—ইনস্পেক্টরবাবু, আমি নির্দোষ। আমার কথা বিশ্বাস করুন।

জয়ন্ত মিষ্টি স্বরে বললো—ইন্দু কেঁদো না। যা জিগ্যেস করি ঠিক ঠিক জবাব দাও। তুমি নির্দোষ হলে তোমার কোনো ভয় নেই।

চোখের জল মুছতে মুছতে ইন্দু বললো—কি জিগ্যেস করবেন, করুন। আমি মিথ্যে বলবো না।

সুন্দরবাবু বললেন—ইস, উনি মিথ্যা বলবেন না, ধর্মপুত্তুর।

মাণিক টিপ্পনি কাটলো—সুন্দরবাবু, আপনার উপমায় ভুল হলো। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও একবার মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—হুম্! বলেছিলেন—বেশ করেছিলেন।—তাহলে ইন্দুও আজ একবার মিথ্যা বলতে পারে।

—ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ইন্দুর তুলনা হয় না। যুধিষ্ঠির কোনো দিন মুণ্ড শিকার করেননি—হুম্!

জয়ন্ত বললো—ইন্দু, ভালো করে মনে করে দেখো। কোনোদিন তোমার রুমাল হারিয়েছে?

ইন্দু খানিকক্ষণ চুপ করে ভাবলো। তারপর তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—হ্যাঁ মশাই, মনে পড়েছে।

—কি?

—হপ্তাখানেক আগে আমার ঘর থেকে একখানা রুমাল আশ্চর্য উপায়ে অদৃশ্য হয়েছিল।

—আশ্চর্য উপায়ে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেদিন আমার ময়লা জামা কাপড় ছাড়বার কথা। আমার স্ত্রী ফর্সা জামা কাপড় আলনায় ঝুলিয়ে রাখলেন আর একখানা রুমাল পাট করে রাখলেন টেবিলের ওপরে। অফিস যাবার সময়ে খেয়ে

দেয়ে উপরে উঠে আমি কিন্তু রুমালখানা আর খুঁজে পেলাম না। স্ত্রী বললেন, বোধহয় জোর হাওয়ায় কোনগতিকে সেখানা উড়ে গেছে। অগত্যা সেই কথাই আমাকে মানতে হলো।

—যে টেবিলের ওপর রুমালটা রেখেছিলো, তার সামনে—অর্থাৎ খুব কাছেই একটা জানালা ছিলো তো ?

—কী আশ্চর্য, ঠিক বলেছেন ! টেবিলের গায়েই জানলা আছে।

—জানলার বাইরে কি আছে ?

—একটা খুব সরু গলি।

—তারপর ?

—সত্যবাবুর বাড়ির বারান্দা।

—সেই বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে আমি কি তোমার জানলার ভেতর দিয়ে টেবিলের ওপরে হাত দিতে পারি ?

ইন্দু বিস্মিত স্বরে বললো—তা পারেন। কিন্তু আপনার কথার অর্থ কি ?

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে পকেট থেকে নস্যদানি বার করলো।

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন—জয়ন্ত, তুমি কি আমার মামলাটা ফাঁসিয়ে দেবার চেষ্টায় আছো ? তুমি কি বলতে চাও, পাশের বাড়ি থেকে অন্য কেউ রুমালখানা চুরি করেছে ? কেন ? ভারি তো দামি জিনিস ! আমি ইন্দুর একটা কথাও বিশ্বাস করি না।

ইন্দু কাতর স্বরে বললো—আমি সত্যি কথাই বলছি ইনস্পেক্টর-বাবু। আমার স্ত্রীকে জিগ্যেস করে দেখতে পারেন।

সুন্দরবাবু বললেন—নিশ্চয়ই জিগ্যেস করবো। তোমার ঘর, টেবিল আর জানলাও দেখবো।···এই সেপাই ! বদ্‌মাইসটাকে ধরে নিয়ে চল্‌! আমি এখনি ওদের বাড়িতে যাবো। আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা ? দেখাচ্ছি মজাটা !

জয়ন্ত বললো—চলুন সুন্দরবাবু, আমরাও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। আমি সত্য চৌধুরীর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই।

সুন্দরবাবু মুখ ভার করে বললেন—তুমি যা খুশি করতে পারো, কিন্তু দয়া করে আমাকে আর সাহায্য করতে এসো না। হুম্, তুমি সাহায্য না করলেও আমার চলবে।

সুন্দরবাবু আসামী প্রভৃতিকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

মাণিক বললো—জয়ন্ত, তুমি কি মনে করো যে, ইন্দুর রুমাল সত্য চৌধুরী বা অন্য কেউ চুরি করেছে?

—হতে পারে!

—কিন্তু কেন?

—পুলিশকে বিপথে চালনা করবার জন্যে! কিন্তু ও কথা এখন থাক। এসো, আগে একটু চা খেয়ে চাঙা হয়ে নি, তারপর সত্য চৌধুরীর বাড়ির দিকে যাত্রা করবো!

চা পান করে মিনিট পনেরো পরে জয়ন্ত ও মাণিক যখন বাড়ি থেকে বেরোলো, রাত তখন দশটা হবে।

একে তো এ-অঞ্চলের পথ-ঘাটগুলো এ সময়ে নির্জন হয়ে পড়ে, তার ওপর আগেই বলা হয়েছে, নৃমুণ্ড-শিকারীদের উৎপাতে গঙ্গার আশেপাশের রাস্তায় রাত্রে আজকাল লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় বেরিয়ে জয়ন্ত ও মাণিক জনপ্রাণীকে দেখতে পেলো না। নিঝুম স্তব্ধতার মধ্যে পথের ওপরে শব্দ সৃষ্টি করতে লাগলো কেবল তাদের দু'জনের পায়ের জুতোগুলো।

এদিক থেকে বিষ্ণুবাবুর গলিতে ঢোকবার আগেই মাঝে পড়ে ছোটোখাটো একটা মাঠ। তারই ধার দিয়ে যেতে হঠাৎ তাদের কানে জাগলো অদ্ভুত একটা শব্দ। কে যেন হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ রবে আর্তনাদ বা গর্জন করছে।

জয়ন্ত ও মাণিক সচমকে এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগলো। আকাশে ক্ষীণ চাঁদের রেখা মাত্র, গ্যাসের আলোও স্পষ্ট নয়।

মাণিক ভ্রূ-সঙ্কুচিত করে দেখে বললো—মাঠের ওপরে বস্তার মতো ওগুলো কি পড়ে রয়েছে?

জয়ন্ত বললো—খালি পড়ে রয়েছে নয়, বস্তাগুলো ছট্‌ফট্‌ করছে।

তারা এক দৌড়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলো।

অমনি একটা বস্তা আবার বলে উঠলো, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।

বড় বড় তিনটে চটের থলে, মুখগুলো বাঁধা।

থলেগুলোর বাঁধন কাটতেই বেরিয়ে পড়লো সুন্দরবাবু ও দুই পাহারাওলার মূর্তি! প্রত্যেকেরই হাত-পা-মুখ বাঁধা।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে তাড়াতাড়ি সুন্দরবাবুর মুখ ও হাত-পা মুক্ত করে দিয়ে বললো—কী ভয়ানক। এ কি কাণ্ড!

সুন্দরবাবু করুণ স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—ঐ তেমাথার মোড়ে আসতেই গলির ভেতর থেকে কারা বেরিয়ে এসে আমাদের হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেললো, তারপর থলের ভেতরে পুরে আমাদের মাঠে টেনে নিয়ে গিয়ে রেখে সরে পড়লো!

—তাদের দেখতে পান নি?

—কি করে দেখবো ভাই? দেখো না, ওখানকার গ্যাস বাতি দুটো নিবিয়ে রেখেছে! ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার।

—ইন্দু? ইন্দু কোথায় গেলো?

—হুম্‌, লম্বা দিয়েছে। পাপী কখনো সত্যি কথা কয়? তুমি সেই শয়তানের কথায় ভুললে বলেই তো আমার এই দুর্দশা! নইলে আজ রাত্রে আমি কি আর এ-মুখো হতাম? তারই দলবল এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হয়েছে! হায় হায়, হাতে পেয়েও হারালাম!

জয়ন্ত অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, মানুষ চেনা কি এতোই শক্ত? তার চোখেও ইন্দু ধুলো দিলো!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহা-ভয়ঙ্কর

মাণিক বিস্মিত কণ্ঠে বললো—সেই তালপাতার সেপাই ইন্দু! বাঁখারির মতো লিক্‌লিকে হাত-পা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, ছিঁচকে চোরের চেয়েও ভীতু—সে খালি নৃমুণ্ড-শিকারীই নয়। সুন্দর-বাবুর মতো জাঁদরেল পুলিশ অফিসারকেও কুপোকাৎ করে লম্বাও দিতে পারে। অবাক কাণ্ড!

সুন্দরবাবু বললেন—ভুল মাণিক, ভুল। সেই পাজি-ছুঁচোটা মোটে ভীতুই নয়, আমাদের সামনে ভয়ের অভিনয় করছিলো। তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েই তো আমার এই দুর্দশা।

মাণিক বললো—তবু চরম দুর্দশার হাত থেকে আপনি আজও বেঁচে গেছেন।

—তার মানে?

—আপনাদের বস্তায় না পুরে, তারা যে আপনাদের মুণ্ডগুলো কচাকচ্ কেটে নিয়ে বাড়ি চলে যায় নি, এইটুকুই রক্ষা!

মুণ্ড কাটার কথা মনে করিয়ে দিতেই সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—হুম্। চলো, বাসার দিকে ফেরা যাক্।

জয়ন্ত বললো—না, এখন ১৫-এ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে যাবো।

—কেন, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আসামী আজ আর কখনো নিজের বাড়িতে ফেরে? এতোক্ষণে সে হয়তো কলকাতা ছেড়ে চম্পট দিয়েছে!

—তবু আমি যাবো। এসো মাণিক!

—আমি বাবা আজ ও-মুখো হচ্ছি না। **হুম্, এই রাতের অন্ধকারে**

আবার কোনো নতুন বিপদ ঘটতে পারে। আমি কাল সকালে তদন্তে বেরোবো।

জয়ন্ত ও মাণিক আর দাঁড়ালো না, হন্ হন্ করে বিষ্ণুবাবুর গলির দিকে এগোতে লাগলো।

জয়ন্ত যেতে যেতে বললো—মাণিক, খুব সাবধান। এ গলিটা সাপের মতো ক্রমাগত পাক খেয়ে এঁকে বেঁকে গেছে, প্রতি মোড়েই অতর্কিতে আমাদের ওপরে আক্রমণ হতে পারে। রিভলভার তৈরি রাখো।

এক জায়গায় পেছনে যেন দ্রুত পদশব্দ শোনা গেলো, কিন্তু কারুকে দেখা গেলো না। আর এক জায়গায় রোয়াকের ওপর কাপড় মুড়ি দিয়ে কে একটা লোক নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলো ; খানিকটা এগিয়ে যাবার পর জয়ন্ত হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখলো, সে লোকটা উঠে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

জয়ন্ত অট্টহাস্য করে বললো—ঘুমিয়ে পড়ো ভায়া, আবার ঘুমিয়ে পড়ো। নইলে, বলো আমরাই তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে আসি। লোকটা রোয়াকের থেকে নেমে পড়েই চোঁ-চাঁ দৌড় মারলো। পথে আর কোনো ঘটনা ঘটলো না। তারা বিষ্ণুবাবুর লেনে ১৫-এ নম্বর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই শুনতে পেলো, ভেতর থেকে মেয়ে-গলায় কাতর কান্না।

জয়ন্ত বললো—নিশ্চয়ই ইন্দু বাঁড়ুজ্যের বৌ। স্বামীর জন্য কাঁদছেন।

মাণিক বললো—বোঝা যাচ্ছে, ইন্দু তাহলে বাড়িতে ফেরেনি আর তার পালানোর খবর এখনো এখানে এসে পৌঁছোয়নি।

জয়ন্ত ফিরে দেখলো, তার পূর্বপরিচিত মুদি তখন ঝাঁপ তুলে সে রাতের মতো দোকান বন্ধ করবার চেষ্টায় আছে। সে মুদির কাছে গিয়ে বললো—কি হে বাপু, ঐ বাড়ির ইন্দুর কোনো খবর রাখো ?

—ইন্দুবাবু ? হ্যাঁ, তিনি তো আমার খদ্দের। আহা, অমন নিরীহ ভদ্রলোক আর দেখিনি। কিন্তু কেন জানিনা, আজ পুলিশ এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে।

—এখনো ছাড়েনি ?

—পুলিশ কি সহজে ছাড়ে বাবু? জানেন না, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! শুনছেন না, তাঁর ইস্ত্রী তাই কাঁদছেন!

—সত্য চৌধুরী এখন বাড়িতে আছেন কি?

—জমিদারবাবু? না, হঠাৎ কি জরুরি তার পেয়ে সন্ধ্যের গাড়িতেই তিনি দেশে চলে গেছেন। বাড়িতে আছে খালি এক বুড়ো দারোয়ান। যাই মশাই, রাত হলো। নমস্কার।

মুদি চলে গেলো। জয়ন্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে সত্য চৌধুরীর বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলো।

বাড়িখানা বেশ বড়োসড়ো। তেতলা। কিন্তু তার সমস্ত জানলা বন্ধ। দারোয়ান তখন বোধহয় ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। কারণ বাড়ির কোথাও একটা আলোর চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

মাণিক বললো—সত্য চৌধুরী লোকজন নিয়ে হঠাৎ সরে পড়লো কেন? সে কি আন্দাজে বুঝে নিয়েছে, আমরা তার ওপরে সন্দেহ করেছি?

কিন্তু জয়ন্ত সে-কথার জবাব না দিয়ে বললো—দেখো মাণিক, সত্য চৌধুরীর বাড়ির পাশের ঐ হাত তিনেক চওড়া অন্ধকার কানা-গলিটা। গলির এ পাশেই ইন্দুর বাড়ি।

মাণিক বললো—ও গলিতে দেখবার কি আছে?

—কিছুই নেই, অন্ধকার ছাড়া। আমরা এইবারে ঐ গলির ভেতরে ঢুকবো।

—কি আশ্চর্য, কেন হে?

—সঙ্গে এলেই দেখতে পাবে।

জয়ন্তের সঙ্গে সঙ্গে গলির মধ্যে ঢুকে মাণিক টর্চের আলো জ্বেলে দেখে, সে পথে আবর্জনার অভাব একটুও নেই। মরা পচা ইঁদুরের আশপাশ দিয়ে জ্যান্ত ইঁদুররা আনাগোনা করছে।

সত্য চৌধুরীর বাড়ির নিচের তলায় দেয়াল ঘেঁষে খানিকটা অগ্রসর হয়ে জয়ন্ত হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললো—মাণিক, আজ আমরা সত্য

চৌধুরীর বাড়ির ভেতরে বেড়াতে যাবো।

—কি করে?

—গায়ের জোরে। এই দেখো, এখানকার একটা জানলা খোলা আছে। তুমি জানো তো, এরকম লোহার রেলিং আমার কাছে মোমের মতো নরম! বলতে বলতে সে দুই হাতে একটা রেলিং চেপে ধরে টানা-টানি করতেই সেটা বিশ্রী ভাবে দুমড়ে খুলে বেরিয়ে এলো। তারপর আরেকটা রেলিঙেরও হলো সেই অবস্থা।

মাণিক এর আগেই জয়ন্তের আসুরিক শক্তির আরো অনেক প্রমাণ পেয়েছে, সুতরাং কিছুমাত্র অবাক হলো না। সে খালি বললো—চোরের মতো এ বাড়িতে ঢুকে তুমি কি করতে চাও?

—দেখতে চাই, নতুন কোনো সূত্র মেলে কিনা। সত্য চৌধুরী তার দলবল নিয়ে কোথায় গেছে জানিনা, বাড়িতে খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে মাত্র একজন বুড়ো দারোয়ান। লুকিয়ে খানা-তল্লাসীর এমন সুযোগ আর মিলবে না। বলতে বলতে জয়ন্ত জানলা দিয়ে গলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। মাণিকও করলো তার অনুসরণ।

টর্চের আলো ফেলে দেখা গেলো, সেটা হচ্ছে খুব সম্ভব দারোয়ানের রান্নাঘর। গোটা চারেক উনুন ও এখানে সেখানে খানকয়েক পেতলের বাসন ছড়িয়ে রয়েছে। ঘরের দরজা খোলাই ছিলো। ঘর থেকে বেরিয়ে দু'জনে গিয়ে পড়লো দালানে। তারপরেই উঠোন। এবং তারই এক কোণে খাটিয়ার ওপর লম্বা হয়ে পড়ে আছে দারোয়ানের ঘুমন্ত মূর্তি।

বাড়ির ভেতরে কোথাও আলো নেই, অন্য কোনো শব্দও নেই।

দু'জনে পা টিপে টিপে এগিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি খুঁজে পেলো। কাঠের বাহারি সিঁড়ি। তার আশেপাশের দেওয়ালে কতকগুলো ছোটো বড়ো বাঁধানো ফটো টাঙানো। টর্চের সাহায্যে ফটোগুলো দেখতে দেখতে জয়ন্ত চুপি চুপি বললো—মাণিক, ভালো করে এই ছবিখানা দেখো।

ব্যাঘ্র চর্মের আসনের ওপরে বসে আছে বিরাটবক্ষ, বিপুলবপু, এক

সুদীর্ঘ পুরুষ—পরণে মাত্র একটি কপ্‌নি। মাথায় লম্বা চুল, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় মস্ত মস্ত রুদ্রাক্ষের মালা। ফটোতেও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, তার গায়ের রং মোষের মতো কালো। স্কন্ধের, বুকের ও পেটের দুই পাশের ডুমো ডুমো স্ফীত মাংসপেশীগুলো দেখলেও ধরা যায়, দেহের বল বিক্রমে সে সিংহের মতো। মুখের প্রকাণ্ড গোঁফ জোড়া ফুলে ফেঁপে গালপাট্টার মতো হয়ে দুই কানের কাছে গিয়ে ঠেকেছে। কিন্তু কী কুৎসিত তার চোখ দুটো। অতোবড়ো মুখে অতো ছোটো অথচ অদ্ভুত চোখ আর দেখা যায় না, দেখলেই মনে পড়ে হিপোপটেমাসের চোখকে। সেই ক্ষুদে চোখের তীব্র দৃষ্টি যেন দুই ক্ষুরধার বিদ্যুৎ ছুরিকার মতো কেটে বসে হৃদপিণ্ডের মধ্যে। তার মুখে আর এক দ্রষ্টব্য হচ্ছে, বাঘের দাঁতের মতন নিষ্ঠুর ও হিংস্র একটা মাত্র দাঁত—ওষ্ঠাধর ভেদ করে যা প্রায় চিবুকের দিকে এগিয়ে এসেছে। এ রকম আশ্চর্য দাঁতও মানুষের মুখে দেখা যায় না।

মাণিক শিউরে উঠে বললো—জয়, এটা ফটো না হলে বলতাম, এ ছবি হচ্ছে চিত্রকরের আঁকা মনগড়া ছবি! মাথাতেও এ লোকটা বোধ-হয় তোমার মতো অস্বাভাবিক লম্বা।

জয়ন্ত ছবির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো—মনের ক্যামেরায় এ মূর্তি আমি তুলে রাখলাম, জীবনে আর ভুলবো না।

—কিন্তু কে ঐ ভয়ানক লোকটা? যোগী সাধকের বেশে ছবি তুলিয়েছে বটে, কিন্তু এ-ব্যক্তি কি করে সাধনা করে?

—মুদির মুখে যার বর্ণনা শুনেছি, এ বোধহয় সেই মহাপুরুষ—অর্থাৎ সত্যচরণ চৌধুরী!

শুনেই মাণিক আগ্রহ ভরে ওপরে আরো ঝুঁকে পড়লো, কিন্তু জয়ন্ত হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

দোতলার দালানে উঠে তারা প্রথম যে ঘরখানা পেলো, তার দরজায় তালা বন্ধ। পাশের ঘরখানা খোলা বটে, কিন্তু সে ঘরে খান দুয়েক খাট ও খান দুয়েক চেয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই। তার পাশের ঘরখানা হল-

ঘরের মতো বড়, এবং সে ঘরে অনেক আসবাবপত্রও রয়েছে।

কোথাও মার্বেলের বড় গোল টেবিল, কোথাও সাধারণ লেখাপড়া করার টেবিল, কোথাও সোফা, কৌচ, ইজিচেয়ার, কোথাও বড় বড় আলমারি। এই সাজানো-গোছানো ঘরখানি দেখলেই বোঝা যায়, এখানে যে থাকে সে খুব গোছানো লোক।

একটা টেবিলের তলায় রয়েছে এক থাক খবরের কাগজ। জয়ন্ত প্রথমেই সেইখানে গিয়ে হেঁট হয়ে দেখে বললো—এগুলো দেখছি পুরোনো 'স্টেট্‌স্‌ম্যান'—ফেলে না দিয়ে এক জায়গায় গুছিয়ে রাখা হয়েছে। হঠাৎ দুই চোখ তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সেইখানে বসে পড়ে সে একখানা করে কাগজ তুলে তারিখ দেখতে দেখতে যেন আপন মনেই আবার বললো—হুঁ, গেল দেড় মাসের সব কাগজই এখানে রয়েছে, কেবল এপ্রিল মাসের ২৩, ২৪ আর ২৫ তারিখের কাগজ নেই। কিন্তু ঠিক ঐ তিন তিনখানা কাগজ আজ সকালেই আমি উপহার পেয়েছি কাটা মুণ্ডর সঙ্গে।

মাণিক চমকে উঠে বললো—জয়, জয়। তুমি কি বলছো!

জয়ন্ত হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে রুপোর নস্যদানি বার করে একটিপ নস্য নিয়ে বললো—মাণিক আমাদের এখানে আসা সার্থক হলো। সাধারণ পুলিশ-ডিটেক্‌টিভের মস্ত কি দোষ, জানো? তারা কেবল বড় বড় প্রমাণ খুঁজতেই ব্যস্ত, ছোট ছোটো প্রমাণ তাদের চোখেই পড়ে না। সুন্দরবাবু এখানে এলে ঐ খবরের কাগজগুলোর দিকে ফিরেও তাকাতেন না, অথচ ওর মধ্যে আজ আবিষ্কার করা গেল কতো বড়ো দরকারি সূত্র। এই বাড়িতে যারা থাকে, আজ সকালে তারা এই ঘরে বসেই একটা কাটা-মুণ্ডকে তিনখানা খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে, প্যাকিং বাক্সে পুরে আমাদের কাছে রাক্ষুসে ভেট পাঠিয়েছে। এই প্রমাণ হয়তো আদালতে গ্রাহ্য হবে না, কিন্তু এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, আমরা এখন নৃমুণ্ড-শিকারীদের বাড়িতেই অযাচিত অতিথিরূপে প্রবেশ করেছি। কি বলো মাণিক? আমার অনুমান কি তোমার মনে লাগছে?

মাণিক অভিভূত কণ্ঠে বললো—জয়ন্ত! তোমার প্রতিভাকে আমি নমস্কার করি! মাত্র একদিনের চেষ্টায় তুমি আজ যতগুলো আবিষ্কার করলে, তা শার্লক হোম্‌সেরও গর্বের বিষয়।

জয়ন্ত বললো—দুর্গম অরণ্যে পথহারা ক্ষুধার্ত পথিক দেখতে পেলো দূরে একটা কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার রেখা আকাশে উড়ে যাচ্ছে। দেখেই তার খুব আনন্দ হলো, কারণ দূরে কোথাও হয়তো আগুন জ্বেলে রান্না হচ্ছে তারই প্রমাণ ঐ ধোঁয়ার রেখা! কিন্তু ক্ষুধার্ত পথিকের সে আনন্দ স্বল্পজীবী হয়, যদি না সে পথ খুঁজে আগুনের কাছে যেতে পারে! সমস্ত প্রমাণেরই ঐরকম মূল্য। আমাদের হাতে অনেকগুলো প্রমাণ ছিল—যেমন, রুমাল, রাম-দা, 'স্টেট্‌স্‌ম্যানের' তিনটি কপি, কাটামুণ্ড প্রভৃতি। কিন্তু এসব প্রমাণই ঐ ধোঁয়ার মতো ব্যর্থ হবে, যদি না এদের উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করতে পারি। গোয়েন্দার কাজ কেবল প্রমাণ আবিষ্কার করা নয়, সে-সব প্রমাণ হাতে-নাতে কাজে লাগাতে না পারলে তার কর্তব্য পালন করা হয় না। কিন্তু আমি—বলতে বলতে সে হঠাৎ থেমে পড়লো।

জয়ন্তের কথা শুনতে শুনতে মাণিক তার টর্চের আলোটা বুলিয়ে ঘরের চারিদিকে ভালো করে দেখে নিচ্ছিল। এখন টর্চের আলোক রেখার মধ্যে এসে পড়েছে মস্ত বড়ো একটা কাঁচের জার তার ভেতরে টল্ টল্ করছে সাদা জলের মতো কোনো পদার্থ। জয়ন্ত একলাফে সেইখানে গিয়ে পড়ে বললো—মাণিক, আলোটা ভালো করে ধরো তো!

কাঁচের জারটা লম্বায় দেড় হাত ও চওড়ায় এক হাত। এবং খালি একটা জারই নয়, চারটে তাকে আরো চারটে একই রকম জার সাজানো রয়েছে। সব জারেরই মধ্যে রয়েছে সাদা জলের মতো কি!

একটা জারের কাঁচের ঢাকনা খুলে আঘ্রাণ নিয়ে জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললো—হুঁ। জারের ভেতরে রয়েছে স্পিরিট! আমরা যে কাটামুণ্ডটা বকশিস্ পেয়েছি তাও যে স্পিরিটে ভেজানো ছিলো, সে প্রমাণও পাওয়া গেছে। এই জারগুলোর যে কোনোটার মধ্যেই সেই কাটা মুণ্ডটার ঠাঁই

হতে পারে।

আচম্বিতে একতলায় দড়াম করে একটা দরজা খোলার শব্দ শুনে তারা দু'জনেই দারুণ চমকে উঠলো। জয়ন্ত তীরের বেগে ঘর ছেড়ে দালানে বেরিয়ে পড়ে প্রায়ান্ধকার উঠোনের দিকে দৃষ্টিপাত করেই বলে উঠলো—মাণিক, দুম্‌দাম্ করে ও কী ছুটে যাচ্ছে? আমি ভূত মানি না, কিন্তু ওটা মানুষের মূর্তিও নয়।

ততোক্ষণে মাণিকও দালানের ধারে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছে। সেও আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, জয় জয়! অন্ধকারে সবই আবছায়ার মতো দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে, ও-মূর্তি হচ্ছে মহা-ভয়ঙ্কর!

—মাণিক! মূর্তিটা যে সিঁড়ির দিকে গেলো! ঐ শোনো, সিঁড়ির ওপরে যেন মত্তহস্তীর পদশব্দ! মূর্তি আমাদেরই আক্রমণ করতে আসছে!

—উঠোনের ওপর দিয়ে অনেকগুলো মানুষও ছুটে আসছে। জয়ন্ত, আমরা ফাঁদে পড়েছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শত্রুপুরে

জয়ন্ত দাঁতে দাঁত চেপে বললো—হ্যাঁ মাণিক, ফাঁদে পড়েছি বটে! কিন্তু এখনো পালাবার উপায় আছে।—বলেই সে সিঁড়ির দরজার দিকে বেগে ছুটে গেলো এবং পর মুহূর্তেই দরজার পাল্লা দু'খানা টেনে বন্ধ করে শিকল লাগিয়ে দিলো।

—মাণিক, টর্চটা জ্বালো।

টর্চের আলোয় দেখা গেলো দালানের কোণেই তেতলায় ওঠবার সিঁড়ি।

—মাণিক, তেতলায় চলো।

দু'জনে দ্রুতপদে তেতলার বারান্দায় গিয়ে উঠলো। সেখানেও সিঁড়ির মুখে আর একটা দরজা ছিল এবং সে-দরজাও বন্ধ করে দিলো।

বারান্দায় পাশাপাশি দু'খানা ঘর। একটা ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগানো, আর একটা ঘরের দরজা খোলা।

জয়ন্ত বারান্দার এদিক থেকে ওদিকে ছুটে গিয়ে আবার ফিরে এসে বললো—কী মুশকিল ! এখান থেকে ছাদে ওঠবারও সিঁড়ি নেই, নামবার পথও বন্ধ।

মাণিক হতাশ ভাবে ঘাড় নেড়ে বললো—না জয়ন্ত। ঐ শোনো, আমাদের বন্ধুরা নামবার পথ খুলে দেবার চেষ্টা করছে।

দোতলার সিঁড়ির দরজায় বিষম জোরে ঘন ঘন আঘাতের শব্দ শোনা গেল।

জয়ন্ত চিন্তিতভাবে বললো—সিঁড়ির দরজা ভেঙে যারা ওপরে উঠতে চায়, তাদের সঙ্গে আছে সেই মূর্তিটাও।

মাণিক বললো—একটু আগেই ছবিতে আমরা বোধ হয় সত্য চৌধুরীকে দেখেছি। মনে হলো, সেও তোমার মতন হয়তো প্রায় সাত ফুট লম্বা। তার সেই মোষের মতন কালো বীভৎস মূর্তিকেই আমরা উঠোন দিয়ে ছুটতে দেখেছি। অন্ধকারে তাকে আরো ভয়ানক দেখাচ্ছিলো।

জয়ন্ত বললো—না মাণিক, না। যদিও স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পাইনি, তবু জোর করে বলতে পারি, সে মূর্তির মধ্যে একটুও মনুষ্যত্ব ছিলো না। মানুষ তেমন ভাবে ছোটে না। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শুনেছি, মানুষের পায়ের শব্দও অতো ভারি হয় না।

—কী আশ্চর্য, তবে ওটা কী ?

—তোমার প্রশ্নের জবাব এখুনি পাবে। শুনছো না, দোতলার সিঁড়ির দরজা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো ? ওরা ওপরে আসছে। কিন্তু আমরা এখন কি করবো ?

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দু'জনেই তখন খোলা ঘরটার ভেতরে ঢুকে পড়লো। জয়ন্ত ভেতর থেকে সে-ঘরের দরজাও বন্ধ করে দিলো।

মাণিক টর্চ জ্বেলে দেখলো, সে-ঘরে চারটে জানালা আছে—তুটো বারান্দার দিকে এবং তুটো রাস্তার দিকে।

রাস্তার দিকে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত দেখলো, নিঝুম রাতের শূন্যপথ যেন খাঁ খাঁ করছে। কোথাও জন-প্রাণীর সাড়া নেই।

জয়ন্ত চিৎকার করে ডাকলো, পুলিশ, পুলিশ, পুলিশ— !

কিন্তু সে-অঞ্চলে পুলিশের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হলো না।

মাণিক বললো—আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো ভায়া, বিত্যুতের চক্‌মকি জ্বালিয়ে ঘন মেঘ ছুটে আসছে।

—তার মানে এখনি ঝড় উঠবে, বৃষ্টি আসবে।

—পথে এর মধ্যেই পুলিশের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। একটু পরে হাজার চেঁচালেও কেউ আমাদের সাড়া পাবে না।

—তাহলে এসো, সময় থাকতে আমরা তু'জনে মিলে চেঁচাই।

জয়ন্ত ও মাণিক একসঙ্গে চিৎকার শুরু করলো, পুলিশ ! পুলিশ ! খুন ! খুন !!

আকাশকে তখন দেখাচ্ছে অদ্ভুত। আধখানা আকাশ অজস্র তারকায় ভরা—যেন চুম্‌কি বসানো কালো সাড়ি। বাকি আধখানা আকাশ অদৃশ্য হয়েছে অন্ধকারের চেয়ে কালো মেঘদলের জঠরে, কিন্তু সেখানেও থেকে থেকে জ্বল্ জ্বল্ করে উঠছে বিত্যুতের চক্‌মকি। যেন সেগুলো হচ্ছে অন্ধ মেঘের অগ্নিদন্ত। ঐ সব দাঁত দিয়েই সে সাদা আকাশকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলছে।

খানিক তফাতে গঙ্গাকে দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। চঞ্চল বিজলী মুহূর্তে মুহূর্তে নিচে নেমে জলের দোলায় তুলে রূপে গঙ্গা আলো করেই চকিতে আবার পালিয়ে যাচ্ছে সকৌতুকে। বিজলী সকলেরই কাছে যায়, কিন্তু কারুকে ধরা দিতে ভালোবাসে না। কিন্তু এ-সব দেখবার বা ভাববার অবসর তখন জয়ন্ত ও মাণিকের ছিল না। তাদের মাথার ওপরে তখন নৃশংস আনন্দে জেগে উঠেছে নৃমুণ্ড-শিকারীর ক্ষমাহীন খড়্গ—আসন্ন ঝড়কে বুকে করে যেন সেই মহাবিপদেরই পূর্বাভাস দিতে ধেয়ে

এসেছে আকাশের কাজল কালো পুঞ্জমেঘ !

তাদের সমস্ত চিৎকার ব্যর্থ হলো। কোনো পাহারাওলার সাড়া মিললো না। নৃমুণ্ড-শিকারীদের ভয়ে গঙ্গার কাছে রাতে কোনো পাহারা-ওলাই থাকে না। হয়তো কোনো কোনো গৃহস্থ ঘুম থেকে সচমকে জেগে উঠে তাদের চিৎকার শুনতে পেয়েছিলো, কিন্তু তারাও জানে নৃমুণ্ড-শিকারীদের কাহিনী ! পরের মাথা বাঁচাবার জন্যে নিজের মাথা দেবার আগ্রহ কারোর হলো না।

মাণিক হাল ছেড়ে দিয়ে বললো—যাঃ, এ কলকাতা শহরে সবাই কাপুরুষ, কেউ সাড়া দেবে না !

জয়ন্ত বললো—তেতলার সিঁড়ির দরজায় কি রকম ধাক্কা পড়ছে, শুনছো তো ? ও-দরজাও ভেঙে পড়লো বলে।

মাণিক বললো—ওদের দলে কতো লোক আছে, কিছুই যে বুঝতে পারছি না !

—বোঝবার চেষ্টা করেও লাভ নেই। হয়তো পাঁচ-সাত জন, হয়তো দশ-পনেরো জন। ওরা বিশ-পঁচিশ জন হলেও আমি মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু আমি খালি ভাবছি একজনের কথা। কে সে, তা জানি না—কিন্তু আমার মন বলছে, সে ভয়ঙ্কর ! তাকে দেখতে কেমন তাও জানি না, কিন্তু আমার মন বলছে, চতুষ্পদ না হলেও সে মানুষ নয়। কেন সে মানুষের সঙ্গে থাকে, কেন সে আমাদের আক্রমণ করতে চায়, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। মাণিক, আমি হতভম্ব হয়ে গেছি।

হঠাৎ বাড়ি কাঁপিয়ে হুড়মুড়-হুড়মুড় করে একটা শব্দ হলো।

মাণিক বললো—ঐ যাঃ ! তেতলার সিঁড়ির দরজাও ভেঙে পড়লো !

জয়ন্ত কঠিনভাবে হাস্য করে বললো—এবারে এই ঘরের দরজার পালা।

—কিন্তু তারপর ?

বাইরের বারান্দায় ধুপ্ ধুপ্ করে অনেকগুলো পায়ের শব্দ হলো—তার মধ্যে একজনের পায়ের শব্দ বিষম ভারী। প্রত্যেক পদক্ষেপে

তেতলার মেঝে থর থর করে কাঁপছে।

তারপরেই দরজার ওপরে পড়লো দড়াম করে এক জোর ধাক্কা। প্রথম ধাক্কাতেই দরজাটা ভেঙে পড়ে আর কি।

জয়ন্ত এক লাফে বারান্দার একটা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর ডান হাতে রিভলভার বার করে হঠাৎ জানালার একটা পাল্লা খুলে উপরি উপরি চারবার গুলি বৃষ্টি করেই পেছনে সরে এলো।

অন্ধকারে কারুর দিকেই সে লক্ষ্য স্থির করতে পারে নি বটে, কিন্তু আচম্বিতে আর্তনাদ শুনেই বুঝে নিলো যে, তার রিভলভারের একটা গুলী অন্তত যথাস্থানে গিয়ে হাজির হয়েছে।

তারপরেই আবার ধুপ্‌ধাপ্‌ করে অনেকগুলো অতি-ব্যস্ত পায়ের শব্দ শোনা গেলো। তারা বুঝলো, শত্রুরা প্রাণের ভয়ে বারান্দার ওপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্ত তাদের শুনিয়ে খুব চেঁচিয়ে বললো—মাণিক, তুমিও রিভলভার তৈরি রাখো। বারান্দায় যে আসবে তাকেই আমরা কুকুরের মতো গুলী করে মারবো। সহজে আমরা প্রাণ দেবো না।

আচম্বিতে কড়্ কড়্ কড়্ কড়্ রবে বজ্র ভীষণ গর্জন করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হলো ঝটিকার ভৈরব হুহুঙ্কার। গঙ্গার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে তরঙ্গে পাগলামির মাতন জাগিয়ে, টলোমলো গাছে গাছে ব্যাকুল ক্রন্দন ফুটিয়ে, বাড়ির জানালায় প্রচণ্ড করতাল বাজিয়ে দুরন্ত ঝড় প্রবল ধুলোভরা নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ও বজ্রভরা বিদ্যুৎ ছুঁড়তে ছুঁড়তে শহরের ওপর ভেঙে পড়লো বিপুল বিক্রমে।

জয়ন্ত বললো—বাইরে থেকে সাহায্য পাবার যেটুকু আশা ছিল, তাও গেলো। এ গোলমালে সিংহ গর্জন করলেও কেউ শুনতে পাবে না।

মাণিক কিছু না বলে টর্চ জ্বেলে ঘরের চারিদিকে আরও একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই চাপা গলায় বলে উঠলো—জয়! জয়! টেলিফোন।

জয়ন্তের প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো। হ্যাঁ তাই তো, ঘরের এক কোণে টেবিলের ওপর একটা টেলিফোন রয়েছে যে।

সে আগে আরেকবার জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মারলো, কিন্তু বিদ্যুতালোকেও সেখানে শত্রুদের কারুকে দেখা গেলো না। তবে তারা যে আনাচে কানাচে কোথায়ও লুকিয়ে আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। পাছে তারা ভরসা করে আবার কাছে আসে, তাই তাদের ভয় দেখাবার জন্যে জয়ন্ত আর একবার রিভলভার ছুঁড়লো। তারপর ছুটে টেলি-ফোনের কাছে গিয়েই রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললো—বড়োবাজার-টু, ও, থ্রি, ওয়ান। ইয়েস, প্লীজ।

—হ্যালো, থানা? সুন্দরবাবু কোথায়? ঘুমোচ্ছেন? এখনি তাঁকে জাগিয়ে দিন। আমার নাম? হ্যাঁ, জরুরি দরকার। ১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে এসে আমরা বন্দী হয়েছি। হ্যাঁ, সেই কাটামুণ্ডুর মামলায়। আমরা তেতলার একটা ঘরের ভেতরে আছি। ওর দরজা ভাঙবার চেষ্টা করছে। পুলিশের আসতে দেরি হলেই আমরা মারা পড়বো। আসতে কতো দেরি হবে? আন্দাজ আধঘণ্টা হয়তো আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবো, কারণ আমাদের কাছে দু'-দুটো রিভালভার আছে। কিন্তু কিসে কি হয় বলা যায় না, ওরা দলে বেশ ভারি। আরো তাড়াতাড়ি আসবার চেষ্টা করুন। হ্যাঁ, ১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনের সত্য চৌধুরীর বাড়ি। একেবারে তেতলায়—

জয়ন্তের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ঘরের ভেতরে গ্রুম করে বেজায় একটা শব্দ হলো। তার পরেই বিষম উগ্র একটা দুর্গন্ধ।

জয়ন্তের হাত থেকে রিসিভারটা সশব্দে পড়ে গেলো মেঝেয়, রাস্তার ধারের জানলার কাছে সরে গিয়ে ফাঁকে মুখ রেখে রুদ্ধস্বরে সে বললো—মাণিক, শীগ্‌গির এদিকের জানলার ধারে এসো। বারান্দার জানলা দিয়ে ওরা বিষাক্ত গ্যাস বোমা ছুঁড়েছে।

কিন্তু গ্যাসের ঝাঁঝে মাণিকের মাথা তখন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে, কারণ বোমাটা ফেটেছে তারই কাছে। টলতে টলতে কয়েক পা এগিয়ে এসেই সে অবশ হয়ে মাটিতে বসে পড়লো।

জয়ন্তও জানলার ধারে গিয়ে রক্ষা পেলো না, বিষম যন্ত্রণায় তাকেও মেঝের ওপরে প্রথমে বসে, তারপর শুয়ে পড়তে হলো। সেই আচ্ছন্ন অবস্থায় তারা শুনলো, ঘরের বন্ধ দরজা প্রচণ্ড ধাক্কায় ধড়াস করে খুলে গেলো।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভূত, রাক্ষস না দানব?

এমন ঝড় বাদলের রাতে সুন্দরবাবু তাঁর বিছানায় কুঁকড়ে-সুঁকড়ে ঘুমোচ্ছিলেন বেশ আরামেই ; হঠাৎ জরুরি ডাক শুনেই তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করে নিচে নেমে এলেন মহা খাপ্পা হয়ে।

থানার সাব-ইনস্পেক্টর মনোহরকে য়ুনিফর্ম পরে প্রস্তুত দেখে তিনি আরো গরম হয়ে গেলেন। মুখ খিঁচিয়ে বললেন, হুম্ এই একটা রাত আমাকে না ডাকলে কি চলতো না? ভগবান কি তোমার মগজে এক-ফোঁটা বুদ্ধি দান করেন নি? বলি, আর কতো কাল আমার বুদ্ধি ভাঙিয়ে খাবে বাপু? এতোরাতে এমন দুর্যোগে কি আবার জরুরি মামলা এলো?

—আজ্ঞে, জয়ন্তবাবু ফোন করেছিলেন, আমরা এখনি সেপাই নিয়ে সেখানে না গেলে নাকি মারা পড়বেন।

শুনেই বিপুল বিস্ময়ের ধাক্কায় সুন্দরবাবুর সমস্ত রাগ আর বিরক্তি কোথায় ভেসে গেলো, সচমকে বললেন—য়্যাঁ, বলো কি? হুম্, তাও কি হয়?...আর হবে নাই বা কেন? ছোকরারা যা গোঁয়ার, যেচে বিপদকে ডেকে নিয়ে আসে।

—স্যর, আমরা তাহলে কি করবো? শুনছি আসামীরা দলে বেশ ভারি।

—এখন আর ভাববার সময় নেই, সেপাইদের শীগ্‌গির তৈরী হতে বলো, হুম্, আমি চোখের নিমেষে পোশাক পরে আসছি।—সুন্দরবাবু ঘর থেকে যেই যাবার উপক্রম করলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই টেলিফোন যন্ত্রে আবার ঘন ঘন সঙ্গীতের সৃষ্টি হলো।

—আঃ, কে আবার রিং করে? ···হ্যালো! হ্যাঁ, আমি সুন্দরবাবু। আপনি কে? হুম্, কি বললেন? জয়ন্ত? কী আশ্চর্য! তুমি এখন কোথায়? নিজের বাড়িতে? হুম্, আসামীরা তোমাদের রিভলভারের ভয়ে পালিয়ে গেছে? ১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে আমাদের আর যেতে হবে না? হুম্, তোমরা কাল সকালে এসে সব কথা খুলে বলবে! বহুৎ আচ্ছা, হুম্ হুম্! কি বলছো? আমি এতো বেশি 'হুম্' বলছি কেন? তা কি তুমি জানো না? হুম্! ···আচ্ছা, আজ আর আমরা যাবো না। আচ্ছা, সুন্দরবাবু রিসিভারটা রেখে দিলেন।

সাব-ইনস্পেক্টর মনোহর বললো—তাহলে স্যর আমাদের আর যেতে হবে না?

—হুম্! যেতে হবে না কি রকম? আলবৎ যেতে হবে···এক্ষুণি যেতে হবে···আরো তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

—আজ্ঞে, ঐ যে শুনলাম, জয়ন্তবাবুরা বাড়িতে ফিরেছেন, আর আসামীরা পালিয়েছে—

—ও সব ধাপ্পা! আমাকে এতো হুম্ বলতে শুনে জয়ন্ত কখনো আশ্চর্য হয়? যে আমাকে চেনে, সে-ই জানে, কেন আমি হুম্ বলি? ···ওহে মনোহর, সেপাইদের সাজতে বলো, আমরা এখনি পনেরো নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে যাবো। অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না, বুঝছো না। ফোনে এতোক্ষণ জয়ন্ত কথা কইছিলো না! পাছে আমরা এখনি দল বেঁধে ঘটনাস্থলে গিয়ে পড়ি, সেই ভয়ে আসামীদেরই কেউ জয়ন্তের নামে আমাদের সেখানে যেতে মানা করেছে! হুম্, পুলিশের কাজে আমার কালো চুল সাদা হয়ে গেলো আর আমাকেই ঠকাবার চেষ্টা? আমি কি গাড়োল? আমি কি মনোহর?

মনোহর দুঃখিত স্বরে বললো—আজ্ঞে স্যর, আপনার মতে কি গাড়োল বলতে আমাকেই বোঝায় ?

—হুম্, তা নয়তো কি ? তুমি হলে এখনি ঠকে যেতে।

—আজ্ঞে।

—আবার 'আজ্ঞে' বলে। যাও, সুপিরিয়র অফিসারের সঙ্গে তর্ক করো না, নিজের কাজে যাও। আর সময় নেই। আমি চট্ করে পোশাক পরে আসি।

কলকাতার নির্জন পথে পথে পাগলা ঝোড়ো হাওয়া তখন গোঁ গোঁ করে ছুটে বেড়াচ্ছে, হুড়্ হুড়্ হুড়্ হুড়্ করে জল ঢালতে ঢালতে। কালো মেঘ তখনো ঘন ঘন আগুন-দাঁত খিঁচিয়ে গঙ্গার বুক যেন চিরে ফালা ফালা করে দিয়েই হুঙ্কার ছাড়ছে আর হুঙ্কার ছাড়ছে।

১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেন। আকাশের অন্ধকারের সঙ্গে মিলে গেছে গলির অন্ধকার, কারণ পথের গ্যাসের আলোগুলো কারা নিভিয়ে দিয়েছে।

সুন্দরবাবু ত্রস্ত স্বরে বললেন—হুম্, গতিক সুবিধের নয়, মনোহর।

—আজ্ঞে, কেন স্যর ?

—গ্যাসের আলো নেভানো। আজ সন্ধ্যায় ঐ কায়দাতেই ওরা আমায় ফাঁদে ফেলেছিলো। অন্ধকারের ভেতর শত্রুরা লুকিয়ে আছে।

—বড়োই মুশকিল, স্যর! তাড়াতাড়িতে টর্চ আনা হয়নি।

—রিভলভার বার করো! সেপাইদের লাঠি বাগিয়ে ধরতে বলো। ঐ দেখো, ১৫ নম্বর বাড়ির তেতলায় একটা আলো জ্বলছে। কাদের সব ছায়াও দেখা যাচ্ছে। ওরা ভেবেছে, আজ রাত্রে আমরা আসবো না, জয়ন্ত আর মাণিককে খুন করে ধীরে-সুস্থে ওরা সবাই সরে পড়তে পারবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর। জয়ন্তবাবু ফোন করবার পরেই আসামীরা যখন ফোন করেছে তখন বুঝতে হবে যে, তাঁরা শত্রুদের খপ্পরে পড়েছেন। আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়।…ঐ দেখুন স্যর, বাড়ির নিচে,

অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে, কারা যেন নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ তেতলার আলোও নিভে গেলো—মনে হলো যেন বিশ্বব্যাপী অন্ধকার হাঁ করে আলোটাকে গিলে ফেললো।

সুন্দরবাবু চিৎকার করে বললেন—ওরা টের পেয়েছে আমরা এসেছি, সবাই দৌড়ে বাড়ির ওপরে গিয়ে পড়ো। সদর দরজা যদি বন্ধ থাকে লাথি মেরে ভেঙে ফেলো। যাকে পাবে তাকেই গ্রেপ্তার করো। যে বাধা দেবে তাকেই আমরা গুলী করে মেরে ফেলবো, হুম্।

তখন ঝড় বিদায় নিয়েছে, কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে ঝম্ ঝম্ করে। আঁধারের মধ্যে পথের ওপর বেজে উঠলো পাহারাওয়ালাদের ভারী জুতোর শব্দ। সুন্দরবাবু শত্রুদের ভয় দেখাবার জন্যে আকাশের দিকে রিভলভার তুলে একবার আওয়াজ করলেন। তারপরেই তাঁর মনে হলো শত্রুরা দস্তুরমতো ভয় পেয়েছে। কারণ বাড়ির নিচে যারা নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছিলো, তাদের আর দেখা বা সাড়া পাওয়া গেলো না।

সদর দরজা খোলা।

সুন্দরবাবু বললেন—মনোহর, দু'জন সেপাইকে এখানে পাহারায় রেখে বাড়ির ভেতরে দল বেঁধে ঢুকে পড়ো। বাড়ির ভেতরে ঢুকে সকলেরই চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেলো। অন্ধকার সেখানে পুঞ্জীভূত। সে অন্ধকার এমন নিরেট, মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে মানুষের দেহ যেন চুরমার হয়ে যাবে। সেখানকার স্তব্ধতাও বিস্ময়কর।

মনোহর বললো—আজ্ঞে স্যর, এখানে বোধ হয় জনপ্রাণী নেই। আসামীরা লম্বা দিয়েছে।

—লম্বা দিলেই হলো। এইমাত্র তেতলায় আলো জ্বলতে দেখেছি। এরি মধ্যে যাবে কোথায়? চলো তেতলায়। জয়ন্ত তো ফোনে আমাদের তেতলায়ই যেতে বলেছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর। কিন্তু তেতলায় যাবো কোনদিক দিয়ে? অন্ধকারে তো কোনো দিকই দেখা যাচ্ছে না।

—হুম্, মনোহর। অকাট্য প্রমাণ পেলাম, তুমি একটি আস্ত

গাড়োল। কোন্ আক্কেলে আলোর ব্যবস্থা করলে না, বলো দেখি? বলি, সিগারেট-টিগারেট খাও, পকেটে দেশলাই আছে তো?

—আজ্ঞে না, স্যর।

—কথায় কথায় অতো আজ্ঞে আজ্ঞে করো না, ভালো লাগে না। এ কি বিদ্‌ঘুটে ঘুট্‌-ঘুটি অন্ধকার রে বাবা! সেই সঙ্গে মস্ত এক গাড়োল আমার ঘাড়ে চেপেছে—আমি এখন কাকে সামলাই?

—আজ্ঞে স্যর, অতো ব্যস্ত হবেন না। একটু ভেবে দেখা যাক। এই তো সদর দরজা। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এটা একটা লম্বা পথ বলে মনে হচ্ছে। পথের শেষে একটি উঠোন থাকাই সম্ভব। উঠোনের কোন একদিকে তেতলার সিঁড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, কি বলেন স্যর?

—আমি কিছুই বলি না, আমি খালি এগিয়ে যেতে চাই। যেদিকে হোক এগিয়ে চলো। এই সেপাইরা, এগিয়ে চলো সব।

পাহারাওয়ালারা আবার জুতো বাজিয়ে এগিয়ে চললো। তিন-চার সেকেণ্ড পরেই সুন্দরবাবু বললেন, এই সেপাইরা, দাঁড়াও।

তারা দাঁড়িয়ে পড়লো।

—আজ্ঞে, ওদের দাঁড়াতে বললেন কেন, স্যর?

—হুম্, কান খাড়া করে শোনো তো মনোহর, ওপর থেকে কি একটা হুম্ হুম্ করে নিচের দিকে নেমে আসছে না?

মনোহর কান খাড়া করে শুনলো কিনা জানি না, কিন্তু চমকে উঠে বললো—আজ্ঞে হ্যাঁ, আসছে স্যর।

—কি আসছে?

—আজ্ঞে, বুঝতে পারছি না স্যর! হাতি যদি সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারতো, তাহলে ঐ ধরনেরই শব্দ হতো বটে। কিন্তু সেটা অসম্ভব। হাতি আবার কবে সিঁড়ি দিয়ে নামে স্যর?

—হুম্, হাতি কখনো সিঁড়ি দিয়ে নামে না, তবু অমন শব্দ হয় কেন? শব্দটাকে যে ভয়ানক বলে মনে হচ্ছে। শব্দটা যে একেবারে নিচে নেমে এসেছে! শব্দটা যে নিচে নেমে আমাদের দিকেই আসছে!

তারপরেই বাধলো সে এক বর্ণনাতীত কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। একটা অজানা ক্রুদ্ধ গর্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাহারাওয়ালাদের আর্তনাদ। ঝড়ের ফুৎকারে কলাগাছ পড়ার মতো ধপাধপ্ দেহ পড়ার শব্দ। কে এক অতিকায় দানব যেন পাহারাওয়ালাদের দেহগুলো শিশুর মতো তুলে চারিদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।

সুন্দরবাবু অন্ধকারে রিভলভারও ছুঁড়তে পারলেন না, পাছে সেপাইদের কারোর গায়ে গুলী লাগে। হতভম্ব হয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় ডাকলেন, অ মনোহর!

রাস্তা থেকে আওয়াজ এলো, আজ্ঞে স্যর। আমি পালিয়ে এসেছি স্যর! আপনিও পালিয়ে আসুন স্যর! ওরা আমাদের পেছনে রাক্ষস লেলিয়ে দিয়েছে, স্যর।

ভূত হোক, রাক্ষস হোক, যেই-ই হোক সেই ভয়াবহ বিপদ যে তাঁর সামনে এসে পড়েছে, সুন্দরবাবু স্পষ্টতই তা বুঝতে পারলেন। তিনি আড়ষ্টভাবে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে একেবারে যেন দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন।

আচম্বিতে সদর দরজার ফাঁকে বিদ্যুৎ চমকালো। এক পলকেই সুন্দরবাবু দেখে নিলেন, সদর দরজার আলো-ভরা ফাঁকের পটে ফুটে উঠেছে অতি ভয়ানক এক দানব মূর্তি। তিনি তার অন্ধকার মাখা মুখ-চোখ নাক কিছুই দেখতে পেলেন না, তাঁর নজরে পড়লো কেবল মূর্তির কাঁধ থেকে দু'খানা মোটা মোটা লম্বা বাহু বেরিয়ে একেবারে মাটির ওপর এসে পড়েছে।

এর পরেও আর কোনো ভদ্রলোকের জ্ঞান থাকে? তাই সুন্দরবাবুরও রইলো না। মাত্র একটি হুম্ শব্দ উচ্চারণ করে তিনি দস্তুরমতো অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুন্দরবাবুর মুদ্রাদোষ নেই

সুন্দরবাবুর যখন জ্ঞান হলো তখন তিনি চোখ মেলে দেখলেন, খালি ঘুটঘুটে অন্ধকার। অনুভব করলেন, তাঁর পিঠের তলায় রয়েছে ঠাণ্ডা ভিজে মাটি এবং মুখে-বুকে ঝরছে ঝর ঝর করে বৃষ্টির জল।

একে একে সব কথা মনে হলো। সেই ভয়াবহ বাড়ির ভেতর ঢুকে মূর্তিমান এক দুঃস্বপ্নকে দেখে তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি খোলা আকাশের তলায় মাটিতে শুয়ে ভিজছেন। তিনি যে বেঁচে আছেন এবং নৃমুণ্ড-শিকারীরা যে রাম-দা তুলে তাঁকে বিনাবাক্যব্যয়ে বলি দেয় নি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কে তাঁকে এখানে আনলো এবং এ জায়গাটা কোন্ জায়গা?

হঠাৎ তাঁর মাথার উপরে কে একখানা কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাত রাখলো।

সভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে সুন্দরবাবু শুয়ে শুয়েই হড়াৎ করে খানিকটা সরে গেলেন এবং তার পরেই চট্‌পট্ উঠে অদ্ভুত বেগে মারলেন এক লম্বা দৌড়। সঙ্গে সঙ্গে পেছনে অনেকগুলো পায়ের শব্দ! শত্রুরা ধরতে আসছে! হাতে তাদের ধারালো খাঁড়া! এ-কথা মনে হতেই সুন্দরবাবুর গতি অসম্ভব দ্রুত হয়ে উঠলো। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। জয়ন্ত ও মাণিক সবিস্ময়ে একাধিকবার লক্ষ্য করেছে, বিপদ এড়িয়ে পালাবার সময়ে সুন্দরবাবু তাঁর প্রকাণ্ড দেহের ও প্রচণ্ড ভুঁড়ির বিপুল ভার একটুও অনুভব করেন না এবং ইচ্ছা করলে তখন তিনি যেন পাঞ্জাব মেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন।

কিন্তু ছিদ্রহীন অন্ধকারে এমন দ্রুত গতির বিপদ অনেক। সুন্দরবাবু হয়তো অনুসরণকারীদের নাগালের বাইরে গেলেন, কিন্তু তারপরেই

বুঝলেন, একটা বিষম ঢালু জায়গা দিয়ে তিনি হুড়-মুড় করে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছেন! কোথায় যাচ্ছেন? সেই অবস্থাতেই তিনি শুনতে পেলেন, পেছন থেকে চিৎকার করে কে বলছে, আজ্ঞে স্যর! এতো বেশি ছুটবেন না, স্যর! সামনেই খাল।

আর খাল! সুন্দরবাবু কেবল ঝপাৎ করে খালেই প্রবেশ করলেন না, গতির বেগ সামলাতে না পেরে এগিয়েও গেলেন অগাধ জলে।

ডাঙায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারে মনোহর ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে লাগলো—এই চন্দন সিং, এই পাঁড়ে, দোবে, চৌবে, মিশির, আমাদের স্যর জলে পড়ে গেছেন, শীগ্‌গির তাঁকে টেনে তোলো।

অথৈ জলে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সুন্দরবাবু আকুল স্বরে ডাকলেন, অ মনোহর! আমি যে দু'-তিন মিনিটের বেশি জলে ভাসতে পারি না। শীগ্‌গির এসে আমায় ধরো, হুম্!

—আজ্ঞে স্যর! আমি যে একটুও সাঁতার জানি না, স্যর! এই চন্দন সিং, এই পাঁড়ে, দোবে, চৌবে, মিশির। ওরে বাবা, কি হবে গো! হায়, হায়, হায়, হায়! আজ্ঞে স্যর, আপনি কি এখনো ওপরে ভেসে আছেন? না, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন, স্যর?

সুন্দরবাবু জবাব দিতে পারলেন না, খালি বললেন, হুম্! তাঁর পা দুটো এরি মধ্যে যেন দু'মণ ভারি হয়ে তাঁকে পাতালে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু চার-পাঁচ জন সেপাই সাঁতরে গিয়ে পাতালে প্রবেশের দায় থেকে সে-যাত্রা তাঁকে উদ্ধার করলো।

ডাঙায় উঠে সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ ধরে হুম্-হুম্ শব্দে হাঁপ ছাড়তে লাগলেন। হাঁপ ছাড়ার শব্দ যখন ক্ষীণ হয়ে এলো, মনোহর ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলো, আজ্ঞে এখন কি একটু সামলেছেন স্যর?

—হুম্।

—বড্ড বেশি জল খেয়ে পেট ফুলে উঠেছে কি স্যর?

—উহুঁ, হুম্।

—অমন করে পালালেন কেন, স্যর?

—আমার মুখে কে হাত রেখেছিলো যেন!

—সে তো আমি স্যর।

—তুমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর! আমি মুখে হাত বুলিয়ে দেখছিলাম, আপনার জ্ঞান হয়েছে কিনা।

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—মনোহর, তুমি আস্ত গাড়োল! হাত দিয়ে কখনো দেখা যায়? ভগবান তবে চোখ সৃষ্টি করেছেন কেন?

—আজ্ঞে স্যর, ভগবান যে অন্ধকার সৃষ্টি করে চোখকে অন্ধও করে দেন। দেখুন না, অন্ধকারে এখনো আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু হাত-পা-মাথা দিয়ে বেশ দেখতে পাচ্ছি, ঝুপ্ ঝাপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে!

—মনোহর, সুপিরিয়র অফিসারের সঙ্গে তর্ক করো না। তুমি কেবল গাড়োলই নও, তুমি কাপুরুষ। আমাকে ভূত না রাক্ষসের মুখে ঠেলে ফেলে তুমি অনায়াসেই পিঠ্‌টান দিয়েছিলে!

—আজ্ঞে, দিয়েছিলাম স্যর! কিন্তু আপনি ভির্মি যাবার পর আবার ফিরে গিয়েছিলাম। সবাই মিলে আপনাকে ধরাধরি করে আমরাই তো বাইরে এনেছিলাম!

—কিন্তু সেই রাক্ষসটা এখন কোথায়?

—বিদ্যুতের ঝিকিমিকিতে পলকের জন্যে তাকে দেখতে পেয়েছিলাম। মনে হলো, সে তখন বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এলো।

—তাকে দেখতে কী রকম?

—একটা কালো হাতির মতো।

—হুম্, আবার আস্ত গাড়োলের মতো কথা বললে? হাতি কখনো বাড়ির ভেতর থাকে? আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মানুষের মতো তার দুটো হাত ও দুটো পা আছে।

—আজ্ঞে, তার আছে বড় বড় দাঁত, যাকে বলে বিকট দন্ত।

—তার গা দিয়ে বোঁটকা গন্ধ বেরোচ্ছিলো।

—আর তার চোখ দিয়ে বেরোচ্ছিলো আগুন।

—হুম্, তুমি আর কি কি দেখেছো, মনোহর ?

—আজ্ঞে, আর কিছুই দেখিনি স্যর ! তারপরেই বিদ্যুৎ নিভে গেলো। তারপরেই মাটির ওপরে ধুপ্ ধুপ্ করে পায়ের শব্দ হলো। শব্দটা চলে গেলো খালের দিকে।

—তারপর ?

—তারপর আর একটা নতুন শব্দ।

—নতুন শব্দ মানে ?

—আজ্ঞে স্যর, জলে ছপ্ ছপ্ করে দাঁড় ফেলার মতো শব্দ। মনে হলো, কারা যেন দাঁড় বেয়ে নৌকো চালাচ্ছে।

—সুন্দরবাবু নীরবে ভাবতে লাগলেন। নৃমুণ্ড-শিকারীদের ধরবার জন্য বাগবাজার খালের সাঁকোর ওপরে তিনিও এক কিম্ভূতকিমাকারকে দেখেছিলেন আবছায়ার মতো। এবং সেদিন তিনিও শুনেছিলেন, খালের জলে ছপ্ ছপ্ করে দাঁড় ফেলে নৌকো চালানোর শব্দ। এ সব অদ্ভুত রহস্যের অর্থ কি ? কলকাতার খালে-নদীতে আজকাল কি কোনো অমানুষিক রাক্ষস-মাঝি নৌকো নিয়ে আনাগোনা করে ? তারই রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটাবার জন্যে শহরে মানুষের পর মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। কিন্তু এ রাক্ষস খালি মুণ্ড কেটে নিয়ে যায় কেন ? সে কি মুণ্ড খেতেই শুধু ভালবাসে ? কিন্তু তার সঙ্গে যে মানুষের যোগ আছে, এরও তো প্রমাণ রয়েছে ! ভূত-রাক্ষস-দানবের সঙ্গে মানুষের মিতালি ? আশ্চর্য !

পুরাতন পুলিশ-কর্মচারীর পাকা মাথা এইখানে খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলো। সুন্দরবাবু ঘুটঘুটে রাতে খুব জোর করে হয়তো বলতে পারবেন না যে, তিনি ভূত মানেন না মোটেই ; কিন্তু ভূত-রাক্ষস-দানব মানান-সই হয় শিশুদের সেকালের রূপকথায়। তাদের শ্রদ্ধা বা স্বীকার করলে পুলিশের কাজে দিতে হয় ইস্তফা। সেকালের জীবজন্তুদের মতো যক্ষ-রক্ষ, দৈত্য-দানাও পৃথিবীতে আর বাস করে না এবং ডাইনসরের মতো ভূত প্রেতের গল্পও পড়তে বা শুনতে ভালো লাগে বলেই আজকের

দিনেও লেখকেরা আর কথকরা তাদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন অতো বেশি। আসলে ও-সবের মধ্যে কোনো পদার্থই নেই। কিন্তু! ...হুঁ 'কিন্তু' থেকে যায় তবু একটা। ওই ভৈরব অবতারটি কে? সুন্দরবাবুর চোখের সুমুখেই আবির্ভূত হয়ে সে একলাই আজ এতোগুলো পুলিশের লাঠিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে, গণ্ডা গণ্ডা ষণ্ডা চেহারার কুস্তি-লড়া পাহারা-ওয়ালাকে খেলা ঘরের পুতুলের মতন তুলে আছাড়ের পর আছাড় মেরেছে! পাহারাওয়ালাদের কেউ একটা হাত পর্যন্ত তোলবার ফাঁক পায়নি। ও শক্তি কি মানুষের?

খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুন্দরবাবু আজ যেমন তল খুঁজে পাননি, এই গভীর চিন্তার সাগরে ডুবেও তাঁর হাল হলো সেই রকম। ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথা গুলিয়ে গেলো, তিনি আর পারলেন না—উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন, হুম্!

—আজ্ঞে, স্যর?

—মনোহর, এই রাক্ষসটার চেয়েও কথায় কথায় তোমার ঐ 'আজ্ঞে স্যর' হচ্ছে বেশি ভয়ানক! হুম্, আর আমি সইতে পারছি না।

—আজ্ঞে, ওরকম একটু-আধটু কথার দোষ সকলেরই থাকে, কি করবো স্যর, উপায় নেই।

—উপায় নেই? নেই বললেই হলো? হুম্, আমিও তো মানুষ, আমার কোনো মুদ্রাদোষ আছে?...কি, চুপ করে রইলে যে বড়ো? বলো, বলো না, আমার কোনো মুদ্রাদোষ আছে? ওটি বলবার জো নেই, হুম্!

—আজ্ঞে স্যর, কিছু দোষ নেবেন না স্যর, কিন্তু কথায় কথায় আপনার ঐ 'হুম্'টা কি স্যর?

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—মনোহর, তুমি একটি আস্ত গাড়োল। বড্ড বাজে বকো।

—আজ্ঞে, আমরা এখন কি করবো স্যর?

—তোমরা সকাল না হওয়া পর্যন্ত এইখানে বসে পাহারা দাও।

—আজ্ঞে, কার ওপরে পাহারা দেবো স্যর?

—হুম্, সেই কিম্ভূতকিমাকার হয়তো তার দলবল নিয়ে এখনো বিষ্ণুবাবুর গলিতেই লুকিয়ে আছে।

—লুকিয়ে আছে, স্যর? সর্বনাশ! তাহলে তারাও তো আমাদের ওপরে পাহারা দেবে! আমার বিশ্বাস, অন্ধকারেও তারা দেখতে পায়।

—হতে পারে।

—হতে পারে? বলেন কি স্যর? যদি তারা তেড়ে আসে, স্যর?

—লাঠি চালিও।

—আজ্ঞে, লাঠি তোলবার সময় কি পাবো?

—তাহলে চম্পট দিও। হুম্, আমি এখন চললাম।

—কোথায় স্যর, কোথায়? আবার ঐ বাড়িতে?

—তুমি কেবল গাড়োলই নও, মস্ত পাগল। ও-বাড়িতে আবার পা বাড়াবো? ও-বাড়িকে আমি ঘৃণা করি। আমি এখন থানায় চললাম।

—আজ্ঞে, আপনি কি ভয় পেয়েছেন স্যর?

—ভয়! হুম্, ভয় ডর কিছুই আমার নেই। পুলিশের কি ভয় পেলে চলে হে? কিন্তু আমার শরীর আর বইছে না। আমি আজ অজ্ঞান হয়েছি···আছাড় খেয়েছি···জলে ডুবেছি। হয়তো কালই আমায় নিউ-মোনিয়া ধরবে। তার ওপরে শোকে-দুঃখে আমার মন মেজাজও নেতিয়ে পড়েছে।

—আজ্ঞে, শোক-দুঃখ আবার কেন স্যর? আপনি তো জলজ্যান্ত এখনো বেঁচে রয়েছেন।

—গাড়োল! আমার শোক-দুঃখ তুমি কি বুঝবে? জয়ন্ত আর মাণিকের জন্যে আমার প্রাণ কাঁদছে। হয়তো তারা আর বেঁচে নেই, আমি বন্ধু হয়েও তাদের উদ্ধার করতে পারলাম না। কিন্তু সে-কথা যাক, শোনো মনোহর, তোমরা রাতটা এইখানে বসে কাটাও। তারপর সকাল হলে ঐ-বাড়িখানা খানাতল্লাসি করে থানায় গিয়ে আমার কাছে রিপোর্ট দাখিল করবে।

—কিন্তু ও-বাড়িতে আমাদের যদি ঢুকতে না দেয়, স্যর?

—কে ঢুকতে দেবে না? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সকালে তোমরা খালি বাড়িতে ঢুকেই খানাতল্লাসি করবে।

—আজ্ঞে, তাহলে আর খানাতল্লাসির দরকার কি, স্যর?

—মনোহর, তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মূর্খ জীবনে আমি দেখিনি। আসামীরা পালালেও পেছনে কতো প্রমাণ রেখে যায়, জানো না? আচ্ছা, সকলে তোমরা আর এক কাজ করো। তোমরা ঐ-বাড়িখানা ঘেরাও করে, লক্ষ্মীছেলের মতো চুপটি করে বসে থেকো, তারপর আমিই আবার এসে খানাতল্লাসি শুরু করবো। এখন আমি চললাম।

সকাল বেলা মেঘেরা বিদায় নিলো না বটে, কিন্তু আকাশ ধরলো।

সুন্দরবাবু যথাসময়ে উঠে য়ুনিফর্ম পরে ওপরের ঘরে খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন। তাঁর মুখে গভীর চিন্তার আভাস।

হঠাৎ তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত স্বরে বলে উঠলেন—মনে পড়েছে, ঠিক লোকের কথা মনে পড়েছে। তাদের সাহায্য পেলেই আমি জয়ন্ত আর মাণিককে ঠিক খুঁজে বার করতে পারবো।

সুন্দরবাবু দ্রুতপদে নিচে নেমে এসে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন। নম্বর বলে সাড়া পেয়েই বললেন—হ্যালো, কে? বিমলবাবু কি? নমস্কার। কি করছেন? কুমারবাবু আর বাঘার সঙ্গে চা-পান করছেন? আচ্ছা, আপনারা দুই বন্ধুতে একবার থানায় আসতে পারেন কি? হ্যাঁ, এখনি। কি দরকার? সব কথা পরে শুনবেন। এখন খালি এইটুকু জেনে রাখুন, আমরা এক কিম্ভূতকিমাকারের হাতে পড়েছি। হ্যাঁ, মশাই, কিম্ভূতকিমাকার। তাকে ভূতও বলতে পারেন, রাক্ষসও বলতে পারেন, দানবও বলতে পারেন। আসছেন? আচ্ছা, হুম্।

নবম পরিচ্ছেদ

কে এই ভীমাবতার ?

শেষ চা-টুকু দু'চুমুকে নিঃশেষ করে কুমার বললো—সুন্দরবাবু, আবার হঠাৎ কি বিপদে পড়লেন হে ?

ড্রয়ার খুলে রিভলভারটা বার করে পকেটে ফেলে বিমল বললে—থানায় গেলেই জানা যাবে। চলো।

রাস্তায় বেরিয়ে কুমার বললো—খবরের কাগজে দেখেছি, সুন্দরবাবু এখন নৃমুণ্ড-শিকারীর মামলা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমাদের ডাক পড়েছে বোধ হয় সেইজন্যই।—খুব সম্ভব তাই। কিন্তু সুন্দরবাবুর বন্ধু ডিটেক্‌টিভ জয়ন্ত থাকতে আমাদের ডাক পড়বে কেন ? আমরা তো হচ্ছি মাত্র অ্যাড্‌ভেঞ্চারার।···আরে, আরে! বাঘা, তোকে আমরা ডাকিনি, তুই এলি কেন রে ?

বাঘা সে-প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার মনে করলো না। ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তাদের আগে যেতে লাগলো। বাঘাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে তারাও কিছু বললো না।

থানায় ঢুকতেই সুন্দরবাবু ছুটে এলেন সবেগে। তাড়াতাড়ি বিমলের হাত দুটো চেপে ধরে বলে উঠলেন—ভয়ানক কাণ্ড বিমলবাবু, ভয়ানক কাণ্ড! জয়ন্ত আর মাণিক বোধ হয় বেঁচে নেই।

বিমল প্রথমটা স্তম্ভিতের মতন চুপ করে রইলো। 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন' মামলায় জয়ন্ত ও মাণিকের সঙ্গে তাদের প্রথম পরিচয়, সে আজ বেশি-দিনের কথা নয়। কিন্তু এই অল্প দিনেই তারা পরস্পরের বন্ধুর মতন হয়ে উঠেছে। কাজেই খবরটা শুনে তার বুকের ভেতরে একটা ধাক্কা লাগলো।

কুমার বললো—কেন, তাঁদের কী হয়েছিল ?

—হুম্, তারা নৃমুণ্ড-শিকারীদের পাল্লায় পড়া মানেই তো হচ্ছে মুণ্ড উড়ে যাওয়া!

বিমল বললো—আচ্ছা, সব কথা খুলে বলুন দেখি।

সুন্দরবাবু বললেন—এখানে দাঁড়িয়ে খুলে বলবার সময় নেই। চলুন, ট্যাক্সিতে উঠে সংক্ষেপে সব বলছি। আমি আপনাদের সাহায্য চাই। এরকম রহস্যময় ব্যাপারে আপনাদের বাহাদুরি তো আমি স্বচক্ষেই দেখেছি।

ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিলো। বিমল ও কুমারের সঙ্গে বাঘাও এক-লাফে গাড়ির ভেতরে গিয়ে হাজির। দেখেই সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে গাড়ি থেকে আবার নেমে পড়বার উপক্রম করলেন।

কুমার তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে বললো—কি হলো সুন্দরবাবু, যান কোথায়?

হুম্, রাস্তায়। আপনাদের শখের নেড়ি কুকুর গাড়িতে চড়েছে। বাপ্‌রে! ওকে দেখলেই ভয় হয়।

—আমি বলছি, কোনো ভয় নেই।

—আমি বলছি, রীতিমতো ভয় আছে। আমার ওপর এখন শনির দৃষ্টি। জানেন, ঘণ্টা কয়েক আগে আমি আছাড় খেয়েছি, অজ্ঞান হয়েছি, জলে ডুবেছি! এর ওপর ধাড়ি নেড়ি কুকুরের কামড় আর সইবে না।

—কিন্তু বাঘা যে আজ গোঁ ধরেছে, আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। বাঘা, তুই ড্রাইভারের পাশের সিটে বসগে যা। এই বলে কুমার সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো।

বাঘাও অমনি অত্যন্ত সুবোধের মতো টুপ করে ছোট্ট একটি লাফ মেরে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে আসন গ্রহণ করলো। সে বুঝতে পেরে-ছিলো তাকে নিয়েই একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। একবার আড়-চোখে সুন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপর জিভ বার করে হাঁপাতে লাগলো।

সুন্দরবাবু বললেন—এতো বড়ো এতো মোটা আর এতো ভারি

নেড়ি-কুকুর জীবনে আমি আর দেখিনি।

কুমার বললো—বাঘা আমাদের দেশী কুকুর, নেড়িকুত্তা বলে ওকে তাচ্ছিল্য করবেন না সুন্দরবাবু। বরং যত্ন করলে আমাদের দেশী কুকুরও যে কতো বড়ো, আর কতো সবল হতে পারে, সেইটেই ভেবে দেখুন।

—কুকুর নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। এখন সব কথা বলি, শুনুন।

ট্যাক্সি বিষ্ণুবাবুর লেনে ঢুকে থামলো যথাস্থানে।

মনোহর বোঁ-বোঁ করে ছুটে এসে ট্যাক্সির সামনে দাঁড়িয়েই স্যালুট ঠুকে বললো—স্যর, স্যর, এসেছেন স্যর? বাঁচলাম স্যর। শেষ রাতটুকু যে দুর্ভাবনায় কেটেছে!

—হুম্, তোমার আবার দুর্ভাবনা কিসের বাপু? বিপদ দেখলেই যে লোক রেসের ঘোড়ার মত দৌড়োতে পারে তার আবার দুর্ভাবনা?

মনোহর যে কাল রাতে রাক্ষসের মুখে তাঁকে ফেলে লম্বা দৌড় মেরে পালিয়ে গিয়েছিলো, সুন্দরবাবু সে রাগ তখনো হজম করতে পারেননি।

—আজ্ঞে স্যর, দৌড়ের কথা কেন বলছেন, স্যর? আমি তো আপনার কাছে একেবারেই নাবালক। আমি দৌড়োই খালি ডাঙায়, আর আপনি যে জলে-স্থলে সমান দৌড়োতে পারেন, স্যর! খালের কথা এরি মধ্যে ভুলে গেলেন স্যর?

—আঃ, সুপিরিয়র অফিসারের সঙ্গে বাজে তর্ক করো না। কাজের কথা বলো।

—কাজের কথা আর কি বলবো, স্যর? সকলে মিলে ঐ মরা বাড়ি-খানার ওপরে পাহারা দিচ্ছি।

—মরা-বাড়ি? সে আবার কী? বাড়ি কখনো জ্যান্ত আর মরা হয়?

কুমার বললো—মনোহরবাবু বোধ হয় বলতে চান যে, ও বাড়িতে কোনো মানুষের সাড়া-শব্দ নেই।

মনোহর সোৎসাহে বললো—আজ্ঞে স্যর, ঠিকই ধরেছেন। আমি

তো ঐ কথাই বলতে চাই, স্যর। মশা-মাছি আর পিঁপড়ে ছাড়া ও-বাড়ির ভেতরে এখন আর কেউ নেই।

—সেই রাক্ষসটা আর দেখা দেয়নি ?

—আজ্ঞে, না স্যর!

—কোনোরকম তর্জন-গর্জনও করেনি ?

—টুঁ শব্দটি শুনিনি, স্যর।

—হুম্, শুনে হাঁপ ছাড়লাম। চলুন বিমলবাবু, এবারে আমরা ও-বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ি।···দুর্গা, দুর্গা।

সবাই অগ্রসর হলো। সর্বাগ্রে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো বাঘা! কিন্তু দরজা পার হয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং চারিদিকে ঘ্রাণ নিতে লাগলো।

বিমল বললো—বাঘার মনে বোধ হয় কোনো সন্দেহ হয়েছে।

সুন্দরবাবু আচমকে বললেন—কিসের সন্দেহ ?

—সে বুঝতে পেরেছে, এটা শত্রুপুরী।

—বুঝতে পেরেছে না ছাই।

হঠাৎ বাঘা গর্‌র্-গর্‌র্ করে গজরাতে লাগলো।

—ও বাবা আপনাদের কুকুর অমন করে কেন মশাই ? কামড়াবে নাকি ?

—না, বাঘা বলছে, আমি এখানে কোনো শত্রুর গায়ের গন্ধ পাচ্ছি।

—শত্রুর গায়ের গন্ধ ? বলেন কি ? শত্রু তাহলে এখনো এইখানেই আছে ? হুম্!

সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে পিছোতে লাগলেন এবং তালে তালে তাল মিলিয়ে পিছু হটতে লাগলো মনোহর।

বিমল কোনো রকমে হাসি চেপে বললো—মাভৈঃ।

—হুম্!

—আজ্ঞে স্যর, সে-মূর্তিটাকে আপনি তো দেখেন নি, তাহলে আর মাভৈঃ বলতেন না। পালিয়ে আসুন, স্যর। এখনো পালাবার সময় আছে।

কিন্তু বিমল ও কুমার একবারও পেছন ফিরে তাকালো না, দৃঢ়পদে বাঘার অনুসরণ করে বাড়ির ভেতর দিকে অগ্রসর হলো। বাঘা তখন কিসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছিলো।

মনোহর বললো—ওঁরা যে পাগলের মতো মরতে চললেন। চলুন স্যর আমরা এইবেলা লম্বা দিই।

রুমাল বার করে টাকের ঘাম মুছতে মুছতে সুন্দরবাবু বললেন—না মনোহর, সেটা ভাল দেখায় না। ডিউটি ইজ ডিউটি। কিন্তু কুকুরটা কিসের গন্ধ পেলো, বলো দেখি?

—আজ্ঞে স্যর, বিপদের গন্ধ।

—মনোহর মাঝে মাঝে তুমি এমন বিটকেল কথা কও, কোনো মানে হয় না। খানিক আগে বললে—'মরা-বাড়ি'। এখন আবার বলছো 'বিপদের গন্ধ'। বিপদের আবার গন্ধ কি হে? যাক, এখন আমার সঙ্গে চলো।

—আজ্ঞে স্যর, আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে পাহারা দিলেই ভালো হয় না?

—ও, তার মানে আবার তুমি আমাকে ফেলে পালাতে চাও? না-না, ও-সব হবে-টবে না। এবারে তোমার পালাবার পথ আমি বন্ধ করবো। এবারে তুমি আমার সামনের দিকে থাকো।

তখন বাঘার সঙ্গে বিমল ও কুমার একতলার একখানা প্রায়ান্ধকার ঘরের ভেতরে গিয়ে হাজির হয়েছে। সেখানে উপস্থিত হয়ে বাঘার গজ-রানি আরো বেড়ে গেলো। বিমল ও কুমার অনুভব করলো, সমস্ত ঘর-খানা একটা উগ্র ভয়াবহ দুর্গন্ধে ভরপুর।

কুমার বললো—এ ঘরে কে থাকতো?

বিমল আঙুল দেখিয়ে বললো—জানলার লোহার গরাদগুলো দেখছো? দু'ইঞ্চিরও বেশি মোটা!

—দরজার সামনেও কোলাপ্সিব্ল গেট।

—তার মানে, এ-ঘরে কারুকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো। বলেই

বিমল মেঝের ওপরে বসে পড়ে কি যেন তুলে নিতে লাগলো।

—কি করছো বিমল?

—চুপ! এই দেখো। এখন কারুকে কিছু বলো না। আগে ভালো করে পরীক্ষা করি।

এমন সময়ে সুন্দরবাবু দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বললেন—খবর কি?

—খবর শুভ। চলুন সুন্দরবাবু, বাইরে যাই। এসো কুমার। বিমল বললো।

সুন্দরবাবু বললেন—কাল আমরা যখন এখানে আসি, তখন তেতলার ঐ কোণের ঘরটায় আলো জ্বলছিলো। আমাদের দেখেই কারা আলো নিভিয়ে দেয়। চলুন, আগে আমরা ঐ ঘরেই যাই।

বিমল বললো—না, আগে একতলার আর দোতলার সব ঘর পরীক্ষা না করে তেতলায় ওঠা নিরাপদ নয়।

একতলা আর দোতলার অন্য সব ঘর দেখে তারা সেই সাজানো-গোছানো হল-ঘরে প্রবেশ করলো। জয়ন্ত ও মাণিক সেই হল-ঘরটাকে যে অবস্থায় দেখেছিলো এখনো তার কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু কোথাও মানুষের দেখা বা সাড়া নেই। মনোহর ঠিকই বর্ণনা দিয়েছে—মরা বাড়ি।

সুন্দরবাবু বললেন—যা ভেবেছিলাম তাই। আসামীরা পালিয়েছে। তবু চলুন, একবার তেতলাটা দেখেই যাই।

বিমল জবাব দিলো না, ঘরের লেখবার টেবিলের দিকে হেঁট-মুখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কুমারও তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তখন সুন্দরবাবুও কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলেন।

বিমল বললো—দেখো তো কুমার, ব্লটিং প্যাডের ওপরে কি যেন লেখা রয়েছে?

কুমার ভালো করে দেখে বললো—কেউ কারো ঠিকানা লিখে, খামখানা প্যাডের ওপর চেপে কালি শুকিয়ে নিয়েছে। উল্টো ছাপ পড়েছে—সব জয়গায় স্পষ্টও নয়। তবে নামের গোড়ার অক্ষরটা S,

আর উপাধি হচ্ছে চৌধুরি। আর একটা কথা যা পড়া যাচ্ছে—'ফ্রেজারগঞ্জ' বোধ হয়। বিমল বললো—আমিও ঠিক ওই টুকুই পাঠোদ্ধার করতে পেরেছি।

সুন্দরবাবু বললেন—এস্ চৌধুরী, অর্থাৎ সত্য চৌধুরী। সেই-ই এ বাড়ির মালিক, আর বোধ হয় পালের একজন গোদা। আমরা খবর পেয়েছি, সে এখন কলকাতায় নেই।

বিমল বললো—খুব সম্ভব চিঠিখানা কালই লেখা হয়েছে।

সুন্দরবাবু বললেন—কি করে জানলেন?

অক্ষরের ছাঁদগুলো দেখলেই বোঝা যায়, খুব তাড়াতাড়িতে লেখা। চেয়ে দেখুন, কলমদানিতে কালো কালির কলম নেই, সেটা পড়ে রয়েছে টেবিলের তলায়।

—তাতে কি বোঝায়?

—লোকটি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি লিখে কলমটা যথাস্থানে রাখবার সময় পায়নি। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব্যস্তভাবে উঠে গেছে। কাল এখানে যেসব কাণ্ড ঘটেছে, তার ব্যস্ততার আর উত্তেজনার কারণ বোধহয় তাই।

—হুম্, ও-সব বাজে কথা রেখে তেতলার ঘরে চলুন।

—কিন্তু তেতলার ঘরও খালি।

মনোহর বললো—স্যর! ঐ দেখুন টেলিফোন। জয়ন্তবাবু তাহলে এই ঘর থেকেই ফোনে আমাদের ডেকেছিলেন।

সুন্দরবাবু ম্রিয়মান মুখে বললেন—কিন্তু জয়ন্ত আর মাণিকের কি হলো?

বিমল বললো—জয়ন্তবাবু হচ্ছেন বিখ্যাত ব্যক্তি, খুব সম্ভব তাঁকে এখনো হত্যা করা হয়নি। বাড়ির কোনো ঘরে এক ফোঁটা রক্ত বা হত্যার কোনো চিহ্নই নেই। সম্ভবত এখনকার মতো তিনি আর মাণিকবাবু বন্দী হয়ে আছেন।

—কিন্তু কি করে তাঁদের উদ্ধার করবো? কোথায় গেলে তাঁদের পাবো?

বিমল খানিকক্ষণ চিন্তিত মুখে নীরব হয়ে রইলো। তারপর যেন নিজের মনেই বললো—একটি মাত্র সূত্র পেয়েছি, কিন্তু সেটা কি কোনো কাজে লাগবে ?

— হুম্, আমি তো সূত্র-ফুত্র কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ! সব অন্ধকার।

—আপনার মুখে শুনলাম, সত্য চৌধুরী আসামীদের দলের একজন প্রধান ব্যক্তি, আর সে এখন কলকাতায় নেই। ধরুন, সে আছে ফ্রেজার-গঞ্জে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, আসামীরা জয়ন্তবাবুদের বন্দী করে পুলিশের ভয়ে তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে, চিঠি লিখে সত্য চৌধুরীকে খবর জানিয়ে চিঠিখানা এখানকার কোনো ডাকবাক্সে ফেলে গেছে।

—হতেও পারে, না হতেও পারে। না হওয়াই সম্ভব।

—তা বটে। শুধু একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি ?

—কি চেষ্টা করবো ?

—এখন বেলা মোটে সাতটা। কাল শেষ রাতে যদি কেউ চিঠি লিখে থাকে তবে সেখানা এখনো বোধ হয় এই পাড়ার ডাকঘরেই বা ডাক-বাক্সে জমা আছে। সেখানা কোনো রকমে সংগ্রহ করা যায় নাকি ?

সুন্দরবাবু বললেন—কিছু ফল হবে বলে মনে হয় না। তবু ডাক ঘরেই যাচ্ছি। এখানকার পোস্ট মাস্টার আমার বিশেষ বন্ধু।

—বন্ধু না হলেও ক্ষতি ছিলো না, কারণ আপনি যাচ্ছেন রাজ-কার্যেই। আর দেরি করবেন না, বেরিয়ে পড়ুন। আমরাও বাড়িতে যাই। খবরটা দেবেন।

আধ ঘণ্টা পরেই বিমল ও কুমারের বৈঠকখানায় দিগ্বিজয়ীর মতো বুক ফুলিয়ে সুন্দরবাবুর প্রবেশ। তাঁর দুই চক্ষু আনন্দে ও উৎসাহে সমুজ্জ্বল।

বিমল হাসিমুখে বললো—কি সংবাদ ?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন—আশ্চর্য, আশ্চর্য ! বিমল-বাবু, আপনি গোয়েন্দা না হয়েও আমাদের সবাইকে যে হারিয়ে দিলেন ! জয়ন্তকে যদি ফিরে পাই, বলবো—হুয়ো জয়ন্ত !

—কেন বলুন দেখি?

—ব্লটিং প্যাডে উল্টো ছাঁদে তুচ্ছ দুটো কালির আঁচড় আর ঘরের মেঝেতে একটা স্থানচ্যুত কলম! এইমাত্র দেখেই আপনি কতোবড়ো একটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন! হুম্, আশ্চর্য!

—কি আবিষ্কার?

নৃমুণ্ড-শিকারীদের আস্তানা আবিষ্কার, তাদের দলপতিকে আবিষ্কার, এতোদিন ধরে আমরা কেউ যা করতে পারিনি! তার ওপরে জয়ন্ত আর মাণিককে আবিষ্কার।

—তাহলে সত্য-সত্যই ওখানে কাল রাতে কেউ চিঠি লিখেছিলো?

—পকেট থেকে একখানা খাম বার করে সুন্দরবাবু বললেন—এই নিন সেই চিঠি।

খামের ভেতর থেকে চিঠিখানা বার করে বিমল পড়ল:

মাননীয় মহাশয়,

আজ রাতে ডিটেকটিভ জয়ন্ত আর তার বন্ধুকে আমরা বন্দী করিয়াছি, জানিবেন। তারপর পুলিশের সহিত আমাদের দাঙ্গা হইয়াছে। ভীমাবতারের হাতে মার খাইয়া পুলিশ পলাইয়া গিয়াছে, হয়তো এখনি আবার ফিরিয়া আসিবে। আপনার অনুমতি পাই নাই বলিয়া বন্দীদের বধ করিতে পারিলাম না। তাহাদের লইয়া আমরা নৌকায় চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িব। তারপর পথে আপনার বাগান বাড়ি হইতে মোটর বোট লইয়া ফুলছড়ি দ্বীপের আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইব। আপনিও যথাসম্ভব শীঘ্র সেখানে যাইলে ভালো হয়। আর কিছু লিখিবার সময় নাই। ইতি—

আপনার অনুগত

শ্রীপশুপতি হাজরা

দশম পরিচ্ছেদ

ভূতরা অসামাজিক, অমানুষিক, অস্বাভাবিক

বিমল চিঠিখানা হাতে করে খানিকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললো, তাহলে জয়ন্তবাবুরা এখন ফুলছড়ি দ্বীপের দিকে যাত্রা করছেন।

সুন্দরবাবু বললেন—ফুলছড়ি দ্বীপের নাম আমি শুনেছি।

কুমার বললো—কিন্তু আমরা সেখানে একবার গিয়েছিলাম। সুন্দরবন ছাড়িয়ে মাত্‌লা আর জামিরা নদী যেখানে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে, সেখানে কতকগুলো দ্বীপ আছে। তাদেরই একটি হচ্ছে ফুলছড়ি দ্বীপ। ফ্রেজারগঞ্জ থেকে জলপথে ঐ দ্বীপে যাওয়া যায়।

সুন্দরবাবু বললেন—তাহলে এখন আমাদের কর্তব্য কি? আমরাও কি পোর্ট পুলিশের লঞ্চ নিয়ে পশুপতিদের পিছনে তাড়া করবো?

বিমল বললো—না। কারণ প্রথমত তারা অনেক আগে বেরিয়েছে, হয়তো তাদের ধরতে পারবো না। দ্বিতীয়ত, আসামীদের নাগাল পেলেও জলপথে তাদের সতর্ক চোখগুলোকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে কাছে যেতে পারবো না! দূর থেকে পুলিশের লঞ্চ দেখলেই তারা নিশ্চয়ই জয়ন্তবাবু আর মাণিকবাবুকে হত্যা করে জলে ফেলে দিয়ে নির্দোষী সাজবার চেষ্টা করবে। আমাদের চুপি চুপি যেতে হবে একেবারে তাদের আড্ডায়, অর্থাৎ ফুলছড়ি দ্বীপে।

সুন্দরবাবু বললেন—কিন্তু তাদের আড্ডা আছে হয়তো গভীর জঙ্গলের মধ্যে কোনো গোপন স্থানে। আমরা তার সন্ধান পাবো কেমন করে?

—সন্ধান পাওয়া খুবই সহজ।

—সহজ?

—হ্যাঁ। আগে ফ্রেজারগঞ্জে গিয়ে আমরা সত্য চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করবো। সত্যই তার আড্ডার সন্ধান বলে দিতে বাধ্য হবে।

—কিন্তু দেরি হলে পশুপতিরা যদি জয়ন্ত আর মাণিককে মেরে ফেলে?

—পশুপতির চিঠিতেই দেখছেন তো, সত্য চৌধুরীর হুকুম পায়নি বলেই সে বন্দীদের খুন করেনি।

—হুম্, সে কথা সত্যি। কিন্তু বলা তো যায় না, সত্য চৌধুরী যদি আমাদের আগেই ফুলছড়ি দ্বীপে গিয়ে হাজির হয়?

—কেন যাবে সে? জয়ন্তবাবুরা যে বন্দী হয়েছেন, এ খবর সে জানে-না। পশুপতির চিঠি আমাদের হাতে। এ চিঠি আমরা ফেরৎ দেবো না। চিঠির বদলে তার ঠিকানায় গিয়ে হাজির হবো সদলবলে আমরাই। তারপর বোঝা যাবে, সে আমাদের পথ দেখিয়ে ফুলছড়ি দ্বীপে নিয়ে যেতে রাজি হয় কিনা।

কুমার বললো, আমিও বিমলের প্রস্তাব সমর্থন করি। সুন্দরবাবু, আপনি এখন তাড়াতাড়ি ফ্রেজারগঞ্জে যাবার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলুন। সঙ্গে একদল সশস্ত্র পুলিশ নিতে ভুলবেন না। জয়ন্তবাবুদের উদ্ধার করবার আগে হয়তো আমাদের একটা খণ্ড-যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে।

সুন্দরবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হুম্, যুদ্ধে আমি ভয় পাই না। আমি কাপুরুষ নই। কিন্তু আমার ভয়, সেই বীভৎস ভীমাবতারকে! আমার গভীর সন্দেহ হচ্ছে, সেপাইরা কি তাকে কাবু করতে পারবে।

কুমার মুখ টিপে হাসতে হাসতে বিমলকে বললো—কিহে, ভীমা-বতারের গুপ্তকথা সুন্দরবাবুর কাছে খুলে বলবো নাকি?

বিমল মাথা নেড়ে বললো—না, এখন নয়।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন—হুম্, হুম্! ভীমাবতার কে, আপনারা তা জানেন?

বিমল বললো—জানি।

—কী আশ্চর্য! জানেন তবু বলবেন না?

—না।

—কেন শুনি?

—বললে হয়তো আরো বেশি ভয় পাবেন।

—হুম্, যা ভয় পেয়েছি তারই তুলনা হয় না। তার চেয়ে আর বেশি ভয় পাবার উপায়ই নেই। আপনি অনায়াসেই বলতে পারেন। ভীমাবতার কে? সে কি মানুষ, না ভূত?

—যদি বলি ভূত, তাহলে কি করবেন?

—তাহলে তার সঙ্গে আর দেখা করবো না। জয়ন্ত আর মাণিক জানে—আপনারাও জেনে রাখুন, ভূত সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিত দুর্বলতা আছে। কারণ ভূতেরা হচ্ছে অসামাজিক, অমানুষিক আর অস্বাভাবিক। তাদের সঙ্গে কোনো ভদ্রলোকেরই সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। আমি জানতে চাই, ভীমাবতারটা ভূত কিনা?

বিমল বললো—তাহলে খালি এইটুকু জেনে রাখুন, যে ভীমাবতার হচ্ছে ভূতের চেয়েও অসামাজিক, অমানুষিক আর ভয়ানক।

—তার মানে?

—তার মানে কোন বিশেষ প্রমাণ পেয়ে এই ভীমাবতারটির সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। কিন্তু শেষটা সে-সন্দেহ সত্য না হতেও পারে। কাজে কাজেই ভীমাবতার সম্বন্ধে আপাতত বেশি কিছু আর বলতে পারবো না। বিশেষ, এখন আমরা যাচ্ছি ফ্রেজারগঞ্জে, যেখানে ভীমাবতার নেই। সুতরাং আপনি নির্ভয় হতে পারেন।

সুন্দরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নির্ভয় হবো, না ছাই হবো! হুম্ নমস্কার! চললুম আমি সশরীরে যমের বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা উইল করে গেলেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে বোধ হয়। দুর্গা, দুর্গা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তের জাগরণ

এইবারে জয়ন্ত আর মাণিকের খবর নেবার সময় হয়েছে।

জ্ঞান হবার পর জয়ন্ত সর্বপ্রথমে দেখলো, সে শুয়ে আছে ঠাণ্ডা মাটির ওপরে, একটা আধা অন্ধকার ঘরে।

ওঠবার চেষ্টা করলো, পারলো না। তার হাত দুটো পিছু-মোড়া করে বাঁধা এবং পা দুটোও বাঁধা শক্ত দড়িতে। তখন নাচার ভাবে শুয়ে শুয়ে সে ঘরের চারিদিক লক্ষ্য করতে লাগলো। কিন্তু দেখবার বিশেষ কিছু নেই। চার দেওয়ালে চারটা ছোটো ছোটো জানলা এবং একদিকে একটা দরজা। একদিকের একটা জানলা খোলা—তার বাইরে দেখা যাচ্ছে ওপরে আলোকিত আকাশ এবং নিচে মর্মরিত অরণ্যের চূড়া।

হঠাৎ তার ডানপাশ থেকে সাড়া এলো—জয়ন্ত।

চমকে সেদিকে ফিরে য়ন্ত দেখতে পেলো মাণিককে। তারও অবস্থা এক।

—জয়ন্ত, এবারে বোধ হয় আমাদের লীলা খেলা ফুরোলো।

—হ্যাঁ মাণিক, সেই রকম তো মনে হচ্ছে। সুন্দরবাবু আর কোনো নতুন মামলায় আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারবেন না। সুন্দরবাবুর হতাশ মুখ মনে করে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে।

—কিন্তু আমরা কোথায় আছি?

—বলা অসম্ভব। তবে কলকাতায় নয় নিশ্চয়ই। বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো। শহরের আকাশ এমন পরিষ্কার আর নীল হয় না। চারিদিকের স্তব্ধতার ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে কেবল বাতাস আর গাছপালার কানাকানি আর পাখিদের ডাক। মানুষ বা অন্য

কোনো জীবজন্তুর সাড়া নেই। খুব সম্ভব আমরা কোনো নির্জন বনের ভেতর আছি। শহর বা গ্রাম এখান থেকে অনেক দূর।

—আমরা কতোক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম বলে মনে হয়?

—তাও বলা শক্ত। একদিনও হতে পারে, দু'দিনও হতে পারে!

—কি করে বুঝলে?

—আমরা যখন বিষ্ণুবাবুর লেনে গিয়েছিলাম, তখন রাত্রিকাল। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখো, এখন রোদ উঠছে গাছের মাথায়! তার মানে, একটু পরেই সূর্য অস্ত যাবে, সন্ধ্যা হবে, আবার রাত আসবে। আমরা যখন অজ্ঞান হয়েছিলাম, তখন কালকেও আর একবার দিন আর রাত এসেছে গিয়েছে কিনা, তা কে জানে?

—শোনো জয়ন্ত, স্বপ্নের মতো আমার একটা কথা মনে হচ্ছে, কতোক্ষণ আগে জানি না, কিন্তু আর একবার আমার অল্প অল্প জ্ঞান হয়েছিলো। মনে হলো আমার কানের কাছে যেন স্রোতের কল্‌কল্‌ শব্দ হচ্ছে। যেন মোটর বোটের আওয়াজও শুনলাম। কিন্তু ভালো করে কিছু বোঝবার আগেই নাকের কাছে কেমন একটা বিষম উগ্র গন্ধ জাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গে আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

—তোমার এ-স্বপ্ন সত্য হলে বলতে হয়, জল-পথে আমাদের শহরের বাইরে অন্য কোথাও নিয়ে আসা হয়েছে আর যাতে আমাদের জ্ঞান না হয়, বরাবর চেষ্টা করা হয়েছে।······কিন্তু ও কিসের শব্দ?······চুপ।

সশব্দে ঘরের দরজা খুলে গেলো। ভেতরে এসে দাঁড়ালো একটা মূর্তি। কালো রং, জোয়ান চেহারা, কুৎসিত, নিষ্ঠুর মুখ। হাতে এক গাছা তেলে পাকানো মোটা বাঁশের লাঠি।

লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনিটখানেক বন্দীদের দেখলো। তারপর কালো মুখে সাদা দাঁত খেলিয়ে বললো—এই যে জয়ন্ত! তাহলে আর তোমরা অজ্ঞান হয়ে নেই?

—না, এখন আমরা জ্ঞানবান্‌ হয়েছি। কিন্তু তুমি কে বাপু?

—আমি? আমি পশুপতি! বলেই সে হা-হা-হা-হা করে হাসতে

লাগলো।

—অতো হাসির ঘটা কেন, বন্ধু ?

—হাসছি তোমাদের ভবিষ্যৎ ভেবে।

—আমাদের ভবিষ্যৎ কি এতো হাস্যকর ? বেশ বন্ধু, তাহলে তোমার মুখে আমাদের ভবিষ্যতের বর্ণনা শুনলে আমরা খুব খুশি হবো।

—ওরে হাঁদারাম, ভবিষ্যতের বর্ণনা শুনলে তোদের পেটের পিলে চমকে যাবে।

—আমরা পিলে রুগী নই হে !

—তাহলে শোন্। কাল কি পরশুর মধ্যে দেহ দুটো হবে তোদের স্কন্ধ-কাটা। আর তোদের মুণ্ড দুটো থাকবে কাঁচের জারের ভেতরে স্পিরিটে ডোবানো।

—স্পিরিটে ডোবানো ? এ আবার কি খেয়াল ?

—খেয়াল নয়রে মূর্খ, খেয়াল নয়। আমাদের কর্তা সত্যবাবু হচ্ছেন সম্ভবত তান্ত্রিক সাধক, তাঁর ওপরে মা-কালীর অসীম করুণা। স্বপ্নে মা জানিয়েছেন, তাঁর আসল নর-মুণ্ডের মালা পরবার সাধ হয়েছে। তাই মায়ের কাছে কর্তাও মহাপ্রতিজ্ঞা করেছেন যে, একশো-আট নর-মুণ্ডের মালা তাঁর চরণে উপহার দেবেন। কিন্তু এই বিধর্মী ফিরিঙ্গিদের রাজত্বে একশো আটটা নর-মুণ্ড জোগাড় করা তো আর দু'-চার দিনের কাজ নয়। তাই আমরা এক-একটা মুণ্ড কাটি আর স্পিরিটে ডুবিয়ে টাট্‌কা রাখি। তেষট্টিটা মুণ্ড আমরা পেয়েছি—তোদের নিয়ে হবে পঁয়ষট্টিটা। আর তেতাল্লিশটা পেলেই মুণ্ড-মালা গাঁথা হবে।

—সুন্দর প্রস্তাব। মায়ের গলার মালায় দুলবো শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে। তোমাদের এই মা কোথায় আছেন ?

—এই ফুলছড়ি দ্বীপ। এখানেই আমাদের কর্তার সাধন-আশ্রম কিনা!

—বটে ! তাহলে কলকাতা থেকে আমরা বেড়াতে এসেছি ফুলছড়ি দ্বীপে ?

—বেড়াতে নয়রে গাধা, মরতে।

—তুমি কি দয়া করে এখনি আমাদের স্কন্ধ-কাটা করতে চাও ?

—না, কর্তার কাছে খবর পাঠিয়েছি। তাঁর হুকুম পাইনি বলেই তোরা এখনো বেঁচে আছিস।

—তবে এখন তুমি কি করতে এখানে এসেছো ? চাঁদ মুখ দেখাতে ?

—আমার মুখ যে চাঁদের মতো নয়, সে-কথা আমি জানি রে হনুমান।

—আর আমার মুখ যে হনুমানের মতন নয়, সে-কথা আমিও জানি হে, বন্ধু ! কিন্তু তুমি দয়া করে এখানে এসেছো কেন ? কেবল আমাদের ভবিষ্যৎ বর্ণনা করতে ?

—না রে গঙ্গারাম, না। বলির পাঁঠাকেও দানা-পানি দিতে হয়, জানিস না ? আমি জানতে এসেছি তোদের খিদে তেষ্টা পেয়েছে কিনা ?

—মাণিক, তোমার কোন্‌টা পেয়েছে, খিদে না তেষ্টা ?

—তেষ্টা।

—আমারও তাই।

—আচ্ছা। বলে পশুপতি বেরিয়ে গেলো। একটু পরেই সে দু' বোতল জল নিয়ে ফিরে এলো। জয়ন্ত ও মাণিককে মুখের কাছে বোতল ধরে সে একে একে দু'জনকেই জলপান করালো।

জয়ন্ত বললো—জল দিয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করলে বলে ধন্যবাদ। কিন্তু যখন আমাদের খাবার আসবে তখন আমরা খাবো কেমন করে ? আমাদের হাত-পা বাঁধা।

—যতোক্ষণ না জবাই হোস, ততোক্ষণ তোদের হাত-পা বাঁধাই থাকবে রে ছুঁচো ! আমরা এসে খাইয়ে যাবো।

—বন্ধু, জীবতত্ত্বে তোমার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখে আমি মুগ্ধ হচ্ছি। আমি গাধা…আমি হনুমান…আমি ছুঁচো ! তোমার কৃপায় আমি আরো কত নব নব মূর্তি ধারণ করবো, বলতে পারো ?

পশুপতি হেসে ফেলে বললো—সে-কথা পরে এসে বলবো, এখন আমি চললাম। সে বেরিয়ে গিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর তার পায়ের শব্দও দূরে মিলিয়ে গেলো।

জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবলো। তারপর বললো—মাণিক, মনে আছে?

—কি?

—এ-মামলাটা যখন হাতে নিই তখন তুমি বিলাতের পৃথিবী-প্রসিদ্ধ হত্যা-বাতিক-গ্রস্ত 'জ্যাক্ দি রিপারে'র কথা তুলেছিলে?

—হুঁ।

মনে আছে, আমিও তখন সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম যে, এই নৃমুণ্ড-শিকারীও হচ্ছে সেই কোনো বাতিক-গ্রস্ত-হত্যাকারী?

—হুঁ।

—দেখছো, আমার সন্দেহই সত্য? সত্য চৌধুরী হচ্ছে বাঙালি জ্যাক-দি-রিপার। অপরাধ-বিভাগে এই শ্রেণীর অপরাধীদের নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে। এদের উন্মাদ রোগ প্রকাশ পায় কেবল বিশেষ এক বাতিকের ক্ষেত্রে।

—ও আলোচনা এখন থাক। আমার ভালো লাগছে না, জয়ন্ত। চোখের সামনে চক্ চক্ করছে নৃমুণ্ড-শিকারীর খাঁড়া। ঐ দুরাত্মা পশুপতিটার সঙ্গে তুমি এই দুঃসময়ে হাসি ঠাট্টা করছিলে বলে গা আমার জ্বলে যাচ্ছিলো।

জয়ন্ত অট্টহাস্য করে বললো—যে পূজার যে মন্ত্র মাণিক, যে ব্রত আমরা নিয়েছি তাতে এইভাবেই আমাদের মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং দুঃখ করে লাভ কি?

—দেখো জয়ন্ত, মাঝে মাঝে আমার মনে আশার সঞ্চারও হচ্ছে।

—কি আশা?

—মুক্তি-লাভের একটা কোনো উপায় তুমি আবিষ্কার করবেই। ভগবান তোমার ঐ অপূর্ব মাথা নৃমুণ্ড-শিকারীর খাঁড়ার জন্য সৃষ্টি করেন নি। আমি জানি জয়ন্ত, বিপদ যতো গভীর হয়, তোমার বুদ্ধি ততো খোলে।

—আশা কুহকিনী মাণিক, আশা কুহকিনী। আশার ছলনায় ভুলো

না। অসম্ভবের বিরুদ্ধে কি চেষ্টা করবো ভাই? হাত দুটো যদি পিছু-মোড়া করে বাঁধা না থাকতো, তাহলেও কিছু আশা ছিলো। ঐ জানলাগুলোর লোহার গরাদ এক ইঞ্চির চেয়ে বেশি মোটা নয়। তুমি আমার এই বাহুর শক্তি জানো মাণিক, ওরকম গরাদ আমি মোমের মতো নরম বলে মনে করি। কিন্তু হাত-পা বাঁধা। কোনো আশাই নেই।

মাণিক বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো—দিনের আলো নিভে আসছে, বকের দল বাসায় ফিরছে, পাখিরা বিদায়ী গান গাইছে। জানি না, কালকের সন্ধ্যা এসে আর আমাদের দেখতে পাবে কিনা। জয়ন্ত, ফাঁসির আগের দিনে অপরাধীদের মনের ভাব কেমন হয়, বুঝতে পারছো?

—মোটেই পারছি না। আমি এখন নিস্পলক নেত্রে ঐ বোতল দুটোর দিকে তাকিয়ে আছি।

—বোতল?

—হ্যাঁ। দেখোনা আমাদের পশুপতি তাচ্ছিল্য করে বোতল দুটো এইখানেই ফেলে রেখে গিয়েছে।

—পশুপতিকে তুমি 'আমাদের বন্ধু' বলো না, জয়ন্ত।

—নিশ্চয়ই বলবো। এতোক্ষণ ঠাট্টা করছিলাম, এইবারে গম্ভীর ভাবেই বলবো।

—কেন?

—কারণ গ্রীক পণ্ডিত আর্কিমেডিসের ভাষায় এখন আমরা অনায়াসেই বলতে পারি—য়্যুরেকা। য়্যুরেকা।

—তোমার কথার অর্থ কি, জয়?

—মাণিক, আমার এক টিপ্ নস্য নিতে সাধ হচ্ছে।

মাণিক সানন্দে বললো—জয়ন্ত, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই মুক্তির উপায় আবিষ্কার করেছো! কারণ নস্যি নেওয়ার সাধ হচ্ছে তোমার বিপুল খুশির লক্ষণ।

—হ্যাঁ বন্ধু, ঐ বোতলই আমাদের উদ্ধার করবে।

—কি বলছো তুমি, জয়ন্ত?

জয়ন্ত জবাব দিলো না। বোতল ছিলো তার পায়ের কাছে। সে হঠাৎ তার বাঁধা পা দুটো দিয়ে একটা বোতলের ওপর সজোরে আঘাত হানলো। বোতলটা ছিট্‌কে দেয়ালের ওপরে গিয়ে পড়ে ভেঙে গেলো সশব্দে।

—কী আশ্চর্য জয়ন্ত, ঐ বোতলই যদি আমাদের বাঁচায়, তবে ওটা ভাঙলে কেন?

—মাণিক, তুমি কি কখনো ভাঙা কাঁচের ধার পরীক্ষা করোনি? ভাঙা কাঁচ ক্ষুরের কাজ করতে পারে—এমন কি, তা দিয়ে দাড়িও কামানো যায়।

—জয়! জয়! বুঝেছি বুঝেছি! কিন্তু আমাদের হাত যে বাঁধা ভাই।

জয়ন্ত কোনো কথা না বলে গড়িয়ে গড়িয়ে ভাঙা বোতলের টুকরো-গুলোর কাছে গেলো! তারপর বললো—মাণিক, তুমি পাশ ফিরে স্থির হয়ে শুয়ে থাকো দিকি।

মাণিক কথামতো কাজ করলো। জয়ন্ত কিছুক্ষণ ভাঙা কাঁচগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বড় একখণ্ড কাঁচ বেছে নিয়ে মুখ বাড়িয়ে সেটাকে দাঁত দিয়ে চেপে গড়িয়ে গড়িয়ে মাণিকের পেছন দিকে এলো। তারপর সেই কামড়ে ধরা কাঁচখানা দিয়ে মাণিকের পিছু-মোড়া করে বাঁধা হাতের দড়ির ওপরে ঘষতে লাগলো। মিনিট কয়েকের মধ্যেই মাণিকের হাত দুটো দড়ির বন্ধন থেকে পেলো মুক্তি।

কাঁচখানা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে জয়ন্ত বললো—বন্ধু, এইবারে স্বাধীন হাতের সাহায্যে তুমি নিজের পায়ের বাঁধন খোলো। তারপর ভগবান ছাড়া এই দুনিয়ায় কারুকে আমি গ্রাহ্য করি না।...

দুই বাহু বার কয়েক বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত করে জয়ন্ত আগে তাদের আড়ষ্টতা দূর করলো। গোটা কয়েক ডন্-বৈঠকও দিয়ে নিলো।

—ঠিক সেই সময়ে ঘরের বাইরে জাগলো কার যেন পায়ের শব্দ! মাণিক ত্রস্তস্বরে বললো—নিশ্চয়ই সেই শয়তান পশুপতি! হয়তো আমাদের খাবার নিয়ে আসছে।

—একজনের নয় মাণিক, আমি দু'-তিনজনের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বলেই সে এক লাফ মেরে জানলার কাছে গিয়ে পড়লো।

—জানলা ভাঙো জয়ন্ত! শীগ্‌গির!

মাণিকের মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জানলার দুটো লোহার গরাদ জয়ন্ত এক হ্যাঁচকা টানে বেঁকিয়ে খুলে ফেললো। একটা গরাদ মাণিকের হাতে দিয়ে বললো—দরকার হলে, এটা অস্ত্রের মতো ব্যবহার করো।

দরজায় কুলুপ খোলার শব্দ হলো। পরমুহূর্তে জয়ন্ত ও মাণিক জানলা গলে একে একে বাইরে লাফিয়ে পড়লো।

ওদিকে ঘরের মধ্যে জেগেছে তখন বিষম হট্টগোল, ভাঙা জানলার ফাঁকে পশুপতির হতভম্ব মুখ। জয়ন্ত ও মাণিককে দেখতে পেয়েই সে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো—কোথায় পালাবি? তোদের পেছনে যাবে মূর্তিমান যম। ডাক ভীমাবতারকে।

ছুটতে ছুটতে মাণিক বিস্মিত স্বরে বললো—ভীমাবতার কে, জয়ন্ত?

নিজের গতি আরো বাড়িয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললো—হয়তো সেই ভয়াবহ বিভীষণ। আরো জোরে পা চালাও, মাণিক।

মিনিট খানেক পরেই তাদের পেছনে দূর থেকে জেগে উঠলো এক বীভৎস গর্জন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভীমাবতারের জাগরণ ও নিদ্রা

মাণিক শিউরে উঠে বললো—ও কোন্ জীবের গর্জন, জয়?

জয়ন্ত বললো—ভগবান জানেন! তবে মানুষের গর্জন নিশ্চয়ই নয়।

—হয়তো ওটা এই বনেরই কোনো জীব। মানুষ দেখে গর্জন করছে।

—ওটা অজানা জীবের গর্জন। ও-রকম গর্জন করতে পারে, সুন্দরবনে

এমন কোনো জানোয়ার আছে বলে জানি না।

তারা দু'জনেই ছুটতে ছুটতে কথা কইছিলো। গর্জন হঠাৎ থেমে গেলো, কিন্তু তার বদলে শোনা গেলো আর এক রকম বেয়াড়া শব্দ। মনে হলো, পেছনের গাছপালার ভেতরে মড়-মড় শব্দ তুলে লতা-পাতা-ডাল ছিঁড়ে-ভেঙে কোন্ এক মত্ত হস্তীর মতন বৃহৎ জীব তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করে দিয়েছে।···কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই বোঝা গেলো, শব্দটা তাদের দিকেই সবেগে এগিয়ে আসছে!

এদিকে যে সরু পথ দিয়ে তারা ছুটছিলো, সেটা এসে পড়লো একটা মাঝারি মাঠের ওপরে। মাঠের ওধারে প্রায় সিকি মাইল পরে আবার বন-জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। মাঠের ডান ও বাম প্রান্তেও অরণ্যের প্রাচীর। জয়ন্ত দৌড় থামিয়ে বললো—দাঁড়াও মাণিক, আর ছুটো না। মাণিক দাঁড়িয়ে পড়লো।

শেষ গোধূলির ঝাপ্‌সা আলোয় মাঠের চারিদিকে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে জয়ন্ত বললো—এখন কি করা যায়, বলো দেখি?

—বিনা বাক্য-ব্যয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন।

—উঁহু, ঐ খোলা মাঠ দিয়ে পালাতে গেলে আমরা বোধ হয় ধরা পড়বো। শুনছো না, পেছনের শব্দ আমাদের কতো কাছে এসে পড়েছে? যে ঐ শব্দের সৃষ্টি করেছে তার গতি আমাদের চেয়ে দ্রুত বলেই মনে হচ্ছে।

—তাহলে উপায়?

—একমাত্র উপায় হচ্ছে, চট্‌পট্ পথ ছেড়ে পাশের জঙ্গলের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে চুপ করে বসে থাকা। আমরা মাঠ দিয়ে পালিয়েছি ভেবে শত্রু যদি অন্য দিক দিয়ে বিদায় হয়—সে তো বহুৎ আচ্ছা! নাহলে—এসো মাণিক, এসো! পা টিপে টিপে বনের মধ্যে ঢুকে মাথা গুঁজে বসে পড়ো। তারপর একটু নড়া নয়, একটি টুঁ শব্দও নয়।

বনের মধ্যে ঢুকে একটা ঝুপ্‌সি ঝোপের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। শব্দ তখন আরো কাছে এসে পড়েছে। খোলা মাঠের ওপর ঝাপ্‌সা

আলো তখনো নিঃশেষে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি বটে, কিন্তু অরণ্যের মধ্যে অন্ধকার তখন অবিচ্ছিন্ন না হলেও জমে উঠেছে রীতিমত।

এতোক্ষণ পরে আর একটা আশ্চর্য ব্যাপারে বোঝা গেলো—শব্দের উৎপত্তি জঙ্গলের নিচে নয়, গাছের ওপরে। কে যেন গাছের পর গাছের বড়ো বড়ো ডাল ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। কি ওটা? হাতি? না দৈত্য-দানব?

মাণিক আর কৌতূহল চাপতে না পেরে বলে উঠলো—জয়!

—চুপ!

পর মুহূর্তেই একটা বিপুল দেহ গাছে গাছে লাফ মেরে মূর্তিমান ঝড়ের মতো মাঠের দিকে এগিয়ে গেলো। অন্ধকারে তার আসল চেহারা কিছু বোঝা গেলো না। খালি মোটা মোটা দু'খানা হাত আর দু'খানা পা! তারপরেই গাছেদের আর্তনাদ স্তব্ধ।

জয়ন্ত ফিসফিসিয়ে বললো—মূর্তিটা মাঠের ধারের শেষ গাছে গিয়ে পড়ে আমাদের দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়েছে।

হঠাৎ মাটি কাঁপিয়ে ধুপ্ করে একটা শব্দ হলো।

—মূর্তিটা গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লো। এখন দেখো, সর্বনেশে আমাদের খুঁজতে আসে কিনা।

জয়ন্ত ও মাণিক দৃঢ় মুষ্টিতে লোহার ডাণ্ডা ধরে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো আসন্ন বিপর্যয়ের প্রতীক্ষায়। কিন্তু শত্রুর দেখা নেই, পায়েরও শব্দ নেই!

আরো মিনিটখানেক কাটলো।

সবাই চুপচাপ।

জয়ন্ত বললো—যাক, বোধ হয় আমরা ওর চোখে ধুলো দিতে পেরেছি। ও হয়তো আমাদের খোঁজবার জন্যে মাঠের ওপারে যাত্রা করেছে।

—কিন্তু কি ওটা? ঐ কি ভীমাবতার? না, ওটা কোনো বড় জাতের বানর?—নিজের মনেই গাছে গাছে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে, আমরা

মিছেই ওর জন্যে ভয় পেয়েছি!

—মাণিক, ওসব ভাববার সময় নেই, ঐ শোনো, বনের ভেতর দূর থেকে নতুন গোলমাল শোনা যাচ্ছে! বন্ধু পশুপতি নিশ্চয়ই সদলবলে 'যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি' রবে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে! এখন কি করবে? লড়বে না পালাবে?

—হরিণের মতো ছুটে পালাবো।

—আমারও ঐ মত। দু'জনে একটা দলকে হয়তো ঠেকাতে পারবো না। নাও, উঠে পড়ো। চালাও পা।

তারা বনের আঁধার ছেড়ে মাঠের আলো-আঁধারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো।

জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলো, যেন প্রকাণ্ড একটা ঘনীভূত ছায়া দ্রুতবেগে মাঠের ওপারকার অরণ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে! কিন্তু তখনো আসল রূপ ধরা গেলো না। বললো—মূর্তিটা গেছে সামনের দিকে। আমরা মাঠের কোন্ দিকে যাবো? ডাইনে না বাঁয়ে?

—আমরা এখানকার কোনো দিকই চিনি না, সুতরাং যেদিকে খুশি যাই, চলো।

—চলো তবে ডান দিকে। কিন্তু খুব জোরে ছুটতে হবে। পশুপতিরা যেন আমাদের টিকি পর্যন্ত দেখতে না পায়।

তারা যখন আবার দৌড়োতে আরম্ভ করলো, অশরীরী অভিশাপের মতো চলন্ত কালো ছায়াটা তখন মাঠের ওপারে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে! চারিদিক এমন মৌন, যেন এ আমাদের নিত্য-পরিচিত পৃথিবী নয়। বনের পাখিরা পর্যন্ত বাসায় ফিরে নীরব হয়ে পড়েছে। চাঁদ আজ অন্ধকারের আসর ভাঙতে আসবে অনেক রাতে। বাতাস স্পন্দনহীন। গাছের পাতাও তাই নীরব। সমস্ত বনভূমি যেন কোনো ভীষণ নৈশ নাটকের আসন্ন অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ধীরে ধীরে।

জয়ন্ত ও মাণিক যখন ডানদিকে ছুটে প্রায় মাঠের প্রান্তে গিয়ে পড়লো, আচম্বিতে তাদের সুমুখের বনের ভেতর থেকেও অত্যন্ত দ্রুত

পদশব্দ জেগে উঠলো—কে যেন মাঠের দিকেই ছুটে আসছে।

মাণিক হতাশভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, আমাদের আর কোনো আশা নেই, জয়ন্ত। এদিকেও শত্রু।

জয়ন্তও দাঁড়িয়ে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল ভেদ করে আবির্ভূত হলো আর এক নতুন মূর্তি। প্রথমটা সে তাদের দেখতে পায়নি—কিন্তু খানিকটা এগিয়ে এসেই সেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মহা বিস্ময়ে।

জয়ন্ত সচকিত চোখে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললো—কী আশ্চর্য! তুমি! তুমিও এখানে আছো? আমি যে তোমাকে চিনি, সত্য চৌধুরী! আমার মনের ক্যামেরায় তোমার চেহারা যে ধরা আছে।

তার বলিষ্ঠ দেহ যেমন দীর্ঘ, তেমন চওড়া। দুটো ক্ষুদ্র তীব্র চোখে জ্বলছে যেন তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ-শিখা।

মাণিক সবিস্ময়ে বলে উঠলো—আমিও যে এর ফটো দেখেছি, এ যে সত্য চৌধুরী!

সত্য কোনো জবাব না দিয়ে দৌড়ে তাদের পাশ কাটাতে গেলো। কিন্তু জয়ন্ত এক লাফে তার সামনে গিয়ে পড়ে মাথার ওপরে লোহার ডাণ্ডা তুলে কঠিন স্বরে বললো—দাঁড়াও সত্য চৌধুরী! হাতে যখন পেয়েছি তখন আর তোমাকে পালাতে দেবো না।

সত্য হা হা করে হেসে উঠেই চোখের নিমেষে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে জয়ন্তকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো। জয়ন্ত এই আকস্মিক আক্রমণের আশা করেনি—তাকেও তখন বাধ্য হয়ে হাতের ডাণ্ডা ফেলে সত্যকে জড়িয়ে ধরতে হলো।

আরম্ভ হলো বিষম ধ্বস্তাধ্বস্তি। জয়ন্তের দেহ যেমন পেশীবদ্ধ, পরিপুষ্ট ও সুদীর্ঘ—সত্যরও তেমনি। দু'জনের কেউই কাবু হবার পাত্র নয়। মাণিক একবার ভাবলো, ডাণ্ডা মেরে সত্যকে ঠাণ্ডা করে দেয়। কিন্তু তারপরেই ভাবলো, না জয়ন্ত যদি জেতে তো ন্যায় যুদ্ধেই জিতুক। জয়ন্তকে সে কখনো হারতে দেখেনি। তার পরাজয়ের সম্ভাবনা সে কখনো কল্পনাও করতে পারে না।

হঠাৎ পাশের নিস্তব্ধ অরণ্য যেন জেগে উঠলো। পায়ের শব্দের পর শব্দে। অনেক লোক যেন ছুটে আসছে—যেন একটা জনতা!

পরক্ষণেই পেছনেও হৈ হৈ শব্দ! দূরে—মাঠের ওপরেও অনেকগুলো ছুটন্ত ছায়ামূর্তি!

মাণিক ব্যাকুল স্বরে বললো—চারিদিকে শত্রু! আমরা বেড়াজালে ধরা পড়ে গেছি, জয়।

জয়ন্ত তার সমস্ত শক্তি একত্র করে সত্যকে মাটির ওপরে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। সত্যের দেহে অসুরের মতো ক্ষমতা।

বনের ভেতরকার পায়ের শব্দ এবং মাঠের ওপর ছায়ামূর্তিগুলো তখন আরো কাছে এসে পড়েছে।

জয়ন্ত চিৎকার করে বললো—মাণিক! শত্রুরা যখন চারিদিক থেকে দল বেঁধে আক্রমণ করতে আসছে তখন আর ন্যায়-যুদ্ধ নয়। মারো এর মাথায় লোহার ডাণ্ডা, পৃথিবীর একটা আপদ দূর হোক।

মাণিক লোহার ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে এলে, সত্য তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু জয়ন্তের দুই বাহুর লৌহ বন্ধন শিথিল করবার সাধ্য তার হলো না।

মাণিক মাথার ওপরে ডাণ্ডা তুললো। ঠিক সেই সময়ে কাছ থেকে শোনা গেলো—ডাণ্ডা নামান মাণিকবাবু। আমরা এসে পড়েছি—আর ভয় নেই।

মাণিক থমকে ফিরে দেখে, তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে বিমল ও কুমার—তাদের প্রত্যেকেরই হাতে রাইফেল! ওদিকে জঙ্গলের ভেতর থেকেও বেরিয়ে আসছে বন্দুক হস্তে দলে দলে পুলিশ।

দারুণ বিস্ময়ে মাণিক 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কাঠের পুতুলের মতো। তার মনে হলো, হয় সে একটা অসম্ভব স্বপ্ন দেখছে, নয় তো দুশ্চিন্তার ধাক্কায় তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

কিন্তু জয়ন্তের তখন বিস্মিত হবার অবকাশ নেই, সত্যর মারাত্মক

আক্রমণ ঠেকাতেই সে ব্যতিব্যস্ত। চারিদিকে পুলিশ দেখে সত্য তখন মরিয়া হয়ে লড়ছে।

বিমল এগিয়ে রাইফেল তুলে কর্কশ স্বরে বললো—স্থির হয়ে দাঁড়াও সত্য, নইলে তোমার মাথার খুলি ফুটো করে দেবো।

সত্য পাগলের মতো বলে উঠলো—ছোঁড়্ তুই গুলি! কিন্তু তার আগে জয়ন্তকে মেরে মরবো আমি।

কথা কইতে কইতে সত্য বোধ হয় একটু আনমনা হয়েছিলো, জয়ন্ত সেই সুযোগে এক প্যাঁচে তাকে একেবারে মাটির ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। সত্য মাটির ওপরে পড়ে ভয়ানক হাঁফাতে লাগলো এবং সেই অবস্থাতেই উন্মত্তের মতো চেঁচিয়ে উঠে বললো—তোরা যদি দল বেঁধে না এসে পড়তিস, তাহলে দেখতাম ঐ জয়ন্তকে।

জয়ন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—স্বীকার করি সত্য, আমাদের দু'জনের মধ্যে বাহুবলে কে শ্রেষ্ঠ, তা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না।

সত্য চৌধুরী বললো—তোর জন্যই আমি মা-কালীর মুণ্ড-মালা গাঁথতে পারলাম না। ওরে পাষণ্ড, নৃমুণ্ড-মালিনী তোর সর্বনাশ করবেন।

জয়ন্ত হাসিমুখে বললো—কিন্তু আমি স্বপ্ন পেয়েছি, তুমি ফাঁসি-কাঠে ওঠবার আগে মা-কালী আমাকে কিছুই করবেন না।

মাণিক মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলো, যে মূর্তি তাদের দিকে ছুটে আসছিলো তারা আবার অদৃশ্য হয়েছে, কে কোথায়। এমন সময়ে পাশের বনের ভেতরে জাগলো এক বিষম আর্তনাদ! কে পরিত্রাহি চিৎকার করে বললো—বিমলবাবু, কুমারবাবু! বাঁচান! ভীমাবতার···হুম্ হুম্ হুম্ হুম্।

এ যে সুন্দরবাবুর গলা! বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মাণিক বনের দিকে ছুটে গেলো, কিন্তু তারা কয়েক পা অগ্রসর হতে না হতেই সুন্দরবাবু জঙ্গল ভেদ করে এক লাফে মাঠের ওপরে ধপাস্ করে পড়ে গেলেন। তার-পর পেট-মোটা লাটাইয়ের মতন গড়াতে গড়াতেই পালাতে লাগলেন।

অকস্মাৎ আর এক সুবৃহৎ ছায়ামূর্তির আবির্ভাব। তখন আকাশে আর আলো নেই বললেই হয়, মূর্তিটাকে দেখাচ্ছিলো একটা ঘন

অন্ধকারের মতো—কেবল তার জ্বলন্ত চোখ দুটো ও দাঁতগুলো চক্‌চক্‌ করে উঠছে।

বিমল ও কুমারের হাতের বন্দুক তৎক্ষণাৎ গর্জন করে উঠলো, পর মুহূর্তেই বিরাট আর্তনাদ ও গুরুভার দেহ পতনের শব্দ!

সুন্দরবাবু দুই চোখ মুদে তখনো মাঠে গড়াতে গড়াতে আরো দূরে পালিয়ে যাচ্ছেন। মাণিক তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে দু'হাতে চেপে ধরে বললেন—থামুন, থামুন! আর গড়াবেন না সুন্দরবাবু! ভীমাবতার পটল তুলেছে।

অন্ধকার-মূর্তিটা যেখানে ভূতলশায়ী হয়েছে জয়ন্ত সেইদিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, কিন্তু বিমল বাধা দিয়ে বললো—এখনি ওদিকে যাবেন না, জয়ন্তবাবু। হয়তো এখনো ও মরেনি, কাছে গেলে মরণ কামড় দিতে পারে।

—কিন্তু ও কে?

—ওরাং ওটাং।

—ওরাং ওটাং? কি করে জানলেন আপনি?

—বিষ্ণুবাবুর গলিতে ওর ঘর থেকে আমি কয়েকগাছা লালচে-তামাটে রংয়ের চুল আবিষ্কার করেছি। সে চুল ওরাং ওটাংয়ের।

—আশ্চর্য! বোর্নিও-সুমাত্রা দ্বীপের বনমানুষ বাংলাদেশে এলো কেমন করে?

—সেকথা আমরা সত্য চৌধুরীর মুখেই শুনতে পাবো। তবে এইটুকু জানি, বাচ্চা অবস্থায় ধরলে ওরাং ওটাং মানুষের পোষ মানে। সত্য চৌধুরী নিশ্চয়ই ওকে অনেক দিন ধরে পোষ মানিয়েছে, ওকে নরহত্যা করতে শিখিয়েছে।

—কিন্তু বিমলবাবু, এখনো কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।

বিমল হেসে বললে—যথাসময়েই সে-সব কথা সুন্দরবাবুর মুখেই শুনতে পাবেন। আপাতত খালি এইটুকু জেনে রাখবেন যে, ফ্রেজারগঞ্জে আমরা গিয়েছিলাম সত্য চৌধুরীকে ধরতে। তার বাসা ঘেরাও করে-ছিলাম। কিন্তু সে ভয়ানক লোক। আমাদের তিনজন সেপাইকে গায়ের

জোরে কাবু করে পালিয়ে গিয়ে মোটর-বোটে চড়ে এই দ্বীপের দিকে আসে, আর আমরাও তার পেছনে লঞ্চ নিয়ে তাড়া করে এসে উঠেছি এই দ্বীপে। ভাগ্যি ঠিক সময়ে আসতে পেরেছি, নইলে কি হতো বলা যায় না।

জয়ন্ত অভিভূতের মতো বিমলের হাত চেপে ধরে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললো—আপনারা আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন! আর তিন-চার মিনিট দেরী হলে আমরা মারা পড়তাম।

বিমল বললো—সাধুর জীবন রক্ষার ভার নেন স্বয়ং ভগবান, আমরা নিমিত্ত মাত্র।

এতোক্ষণ পরে সুন্দরবাবুর হাঁফ কমলো। বিমলের দিকে অভিমান-ভরা চোখে তাকিয়ে তিনি বললেন—আপনারা বেশ লোক যাহোক! গহন বনে যমের মুখে আমাকে পেছনে ফেলে আপনারা কিনা অনায়াসে চলে এলেন!

মাণিক সহাস্যে বললো—ভুল বলবেন না সুন্দরবাবু। ওঁরা তো আপনাকে পেছনে ফেলেন নি, আপনাকে পেছনে ফেলেছে আপনারই আশ্রিত ঐ বিপর্যয় ভুঁড়ি।

সুন্দরবাবু বললেন—হুম্, মাণিক! এই কি তোমার ঠাট্টার সময়? জানো, তোমাদের বাঁচাতে এসেই আমি মরতে বসেছিলাম? এর পরেও আমার ভুঁড়ির ওপরে নজর দিচ্ছো? অকৃতজ্ঞ।

এমন সময়ে হঠাৎ চারিদিকের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে দূরে একখানা মোটর বোটের শব্দ জেগে উঠলো।

সুন্দরবাবু চমকে বললেন—ও আবার কি?

জয়ন্ত ব্যস্তভাবে বললো—পশুপতি সদলবলে পলায়ন করছে। কিন্তু তাদের পালাতে দেওয়া হবে না। বিমলবাবু চলুন, আমরা জনকয় সেপাই নিয়ে লঞ্চে উঠে ওদের গ্রেপ্তার করি। সুন্দরবাবু বাকি লোকজন নিয়ে এখানে পাহারা দিন, আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত।

সুন্দরবাবু একবার ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে

দেখলেন, তারপরে দৃঢ়স্বরে তাড়াতাড়ি বললেন—না। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো। কারণ আমি হচ্ছি এ দলের মধ্যে সুপিরিয়র অফিসার—সব দায়-দায়িত্ব আমার।…মনোহর!

মনোহর এগিয়ে এসে বললো—আজ্ঞে, স্যর।

—এক ডজন সেপাই নিয়ে তুমি এখানে পাহারা দাও।

মনোহর কাঁচু মাচু মুখে বললো—আজ্ঞে স্যর, সেটা কি ঠিক হবে স্যর।

—ছিঃ মনোহর, ভয় পেওনা। ডিউটি ইজ ডিউটি! আমরা দুরাত্মা সত্য চৌধুরীকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। তবে আর তোমাদের ভয়টা কিসের?

—আজ্ঞে স্যর, ভরসাও তো কিছু দেখছি না। এ রাক্ষুসে দলে যদি আরো দু'-তিনটে ওরাং থাকে স্যর।

—তোমাদের বন্দুক আছে। তাদের বন্দী করো। তাও না পারো পলায়ন করো।

—স্যর, স্যর! পালিয়ে কোথায় যাবো স্যর? এটা যে দ্বীপ স্যর। চারিদিকেই লোনা জল।

—সাঁতার কেটে পালিও।

—আজ্ঞে স্যর। সাঁতার স্যর?

—হুম্।

সুন্দরবাবু এমন জোরে হুম্ বলে গর্জন করলেন যে, বেশ বোঝা গেলো, এটা হচ্ছে তাঁর চরম হুম্। মনোহর আর 'আজ্ঞে স্যর' বলতে ভরসা করলো না।

●

কিং কঙ্

এক

চীন-সমুদ্রের টাইফুন্

জাহাজের নাম "ইণ্ডিয়া"। আমেরিকা থেকে জাপান হয়ে আসছিল ভারতবর্ষের দিকে।

হঠাৎ চীনা সমুদ্রে 'টাইফুন্' জেগে উঠলো। চীনা সমুদ্রে ভীষণ এক ঝড় ওঠে, তার নাম হচ্ছে 'টাইফুন্'। খুব সাহসী নাবিকরাও এই 'টাইফুন্'কে ভয় করে যমের মত। 'টাইফুনে'র পাল্লায় পড়ে আজ পর্যন্ত কত হাজার হাজার জাহাজ যে অতল পাতালে তলিয়ে গিয়েছে, সে হিসাব কেউ রাখতে পারে নি।

ঝড় গোঁ গোঁ ক'রে গর্জন করছে—চারিদিক অন্ধকার! ঝড়ের আঘাতে সমুদ্র প্রচণ্ড যাতনায় আর্তনাদ করতে লাগল—পৃথিবীতে এখন ঝড়ের হুঙ্কার আর সমুদ্রের কান্না ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। যেন ঝড়ের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্যেই বিরাট এক ভীত জন্তুর মত সমুদ্র বারংবার আকাশে লাফ মারতে লাগল।

ঝড়ের তোড়ে "ইণ্ডিয়া" জাহাজ অন্ধকারে কোথায় যে বেগে ছুটে চলেছে, কেউ তা জানে না। জাহাজের ইঞ্জিন যখন "ইণ্ডিয়া"কে আর সামলাতে পারলে না, কাপ্তেন ঈঙ্গ্ল্হর্ন তখন হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ ভাবে বললেন, "ভগবান আমাদের রক্ষা করুন।"

আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই—পৃথিবীর কোথাও এতটুকু আলো আভাস নেই। জাহাজ ছুটে চলেছে যেন মৃত্যুর মুখে।

'টাইফুনে' প্রতিবৎসরে চীনা সমুদ্রে কত জাহাজই ডোবে, হয়ত "ইণ্ডিয়া" জাহাজও আজ ডুববে, কিন্তু কেবল সেই কথা বলবার জন্যেই আজ আমরা এই গল্প লিখ্তে বসিনি।

"ইণ্ডিয়া" জাহাজের দুটি যাত্রীর জন্যেই আমাদের যত দুর্ভাবনা। ...কারণ তাঁরা বাঙালী। একজনের নাম শ্রীযুক্ত শোভনলাল সেন, আর একজন হচ্ছেন তাঁরই ভগ্নী কুমারী মালবিকা দেবী। ভাই-বোনে আমেরিকা বেড়িয়ে দেশে ফিরছেন।

শেষ রাতে ঝড় থামল, সমুদ্রও শান্ত হ'ল।

কাপ্তেন ঈঙ্গ্ল্হর্ন বললেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ! এ যাত্রা আমরা রক্ষা পেলুম!"

তাঁর সহকারী কর্মচারী বললেন, "কিন্তু জাহাজ যে কোথায় এসে পড়েছে, সেটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

কাপ্তেন বললেন, "না। তবে আমরা যে এখনো পৃথিবীতেই টিকে আছি, এইটুকুই হচ্ছে ভাগ্যের কথা। বেঁচে যখন আছি, তখন জাহাজ নিয়ে আবার ডাঙায় গিয়ে উঠতে পারব।"

কর্মচারী বললেন, "ও কিসের শব্দ?"

কাপ্তেন খানিকক্ষণ কান পেতে শুনে বললেন, "অনেকগুলো জয়ঢাক বাজছে! বোধহয় আমরা কোন দ্বীপের কাছে এসে পড়েছি। চারিদিকে যে অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হয়তো ওখানে কোন উৎসব হচ্ছে ...আচ্ছা, আগে রাতটা পুইয়ে যাক্, সকালে সবই বুঝতে পারব!"

ঢুম্ ঢুম্ ঢুম্, ঢুম্ ঢুম্ ঢুম্, ঢুম্ ঢুম্ ঢুম্! জয়ঢাকগুলো অশান্ত স্বরে বেজেই চলেছে। শোভনলাল আর মালবিকা 'ডেকে' দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে সেই রহস্যময় বাজনা শুনতে লাগল।

খানিক পরে মালবিকা বললে, "দেখ দাদা, কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে যেন ও বাজনা আমাকেই ডাকছে!"

শোভনলাল হেসে ঠাট্টা ক'রে বললে, "দূর পাগলী!"

দুই

খুলি-পাহাড়ের দ্বীপ

ঢাক-ঢোল একটানা বেজে চলেছে—এ ঢাক-ঢোল যেন থামতে শেখেনি!

পূর্বদিকে আলো-নদীর একটি উজ্জ্বল ধারা বয়ে যাচ্ছে—কিন্তু এখনো তার নিচেই দুলছে অন্ধকারের পর্দা।

আলো-নদীর দুই তীরে ধীরে ধীরে রক্তরাঙা রঙের রেখা ফুটে উঠেছে।

ক্রমে অন্ধকারের পর্দা পাতলা হয়ে এল এবং তারই ভিতর থেকে অস্পষ্ট ও ছায়াময় সব দৃশ্য দেখা যেতে লাগল।

ভোর। সূর্যের কিরণ-ছটা দেখা গেল।

শোভন ও মালবিকা বিস্মিত চক্ষে দেখলে, তাদের সামনেই একটি অর্ধচন্দ্রাকার দ্বীপ আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বীপের মাঝ থেকে মস্তবড় একটা পাহাড় মাথা তুলে আকাশের অনেকখানি ঢেকে ফেলেছে। সে পাহাড়ের উপরটা দেখতে ঠিক মড়ার মাথার খুলির মত—সেখানে গাছপালা বা সবুজ রঙের চিহ্নমাত্র নেই।

কিন্তু পাহাড়ের নিচেই গভীর জঙ্গল। আর সেই জঙ্গলের ভিতর থেকে তখনো কারা মহা-উৎসাহে ঢাক-ঢোল বাজাচ্ছে!

কাপ্তেন-সাহেব তাঁর প্রধান কর্মচারী ডেন্‌হাম্‌কে ডেকে বললেন, "মিঃ ডেন্‌হাম্! এ কোন দ্বীপ? আমরা কোথায় এসেছি?"

ডেন্‌হাম্ বললে, "আমারও জ্ঞান আপনার চেয়ে বেশি নয়! এখানে মড়ার মাথার খুলির মতন একটা আশ্চর্য পাহাড় রয়েছে। এ দ্বীপের কথা কখনো শুনেছি ব'লে মনে হচ্ছে না।"

জাহাজের ইঞ্জিনচালক এসে খবর দিলে, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। সারাতে সময় লাগবে।

কাপ্তেন বললেন, "হয়তো আজ আমাদের এইখানেই থাকতে হবে। ডেন্‌হাম্‌, সময়ই যখন পাওয়া গেল, এই অজানা দ্বীপটা একবার তদারক ক'রে আসতে দোষ কি?"

—"দোষ কিছুই নেই। কিন্তু কাল রাত থেকে শুন্‌ছি ওখানে কারা ঢাক-ঢোল বাজাচ্ছে, এ রহস্যময় দ্বীপে কারা বাস করে, তা জানি না। ওরা যদি অসভ্য নরখাদক হয়? যদি আমাদের আক্রমণ করে?"

—"ঠিকই বলেছ ডেন্‌হাম্‌। বেশ, আমরা দলে ভারি আর সশস্ত্র হয়েই যাব। দুখানা বোট নামাতে বল। ত্রিশজন নাবিক আমাদের সঙ্গে যাবে। সকলেই যেন বন্দুক নেয়।"

শোভন আর মালবিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপ্তেনের হুকুম শুনলে।

মালবিকা বললে, "আমি কখনো অসভ্য মানুষ দেখিনি। দাদা, আমারও ঐ দ্বীপে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

শোভন বললে, "এ প্রস্তাব মন্দ নয়, মালবিকা! ফাঁকতালে একটা নতুন দেশ দেখার সুযোগ ছাড়ি কেন? রসো, কাপ্তেন-সাহেব কি বলেন শুনে আসি।"

কাপ্তেন প্রথমটা নারাজ হ'লেন। তারপর শোভনের অত্যন্ত উৎসাহ দেখে বললেন, "আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে আপনারা যেতে পারেন,—কিন্তু না গেলেই ভালো হ'ত।"

মালবিকাকে বোটে উঠতে দেখে চার-পাঁচজন মেমও দ্বীপে যাবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলে। কিন্তু দ্বীপে অসভ্য নরখাদক থাকতে পারে শুনেই তাদের সমস্ত আগ্রহই ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

দুখানা বোট দ্বীপের দিকে অগ্রসর হ'ল।

ঢাক-ঢোল তখনো বাজছে।

বোট দুখানা খানিক দূর অগ্রসর হ'তেই দেখা গেল, দ্বীপের জঙ্গল আর সমুদ্রতীরের মাঝখানে প্রকাণ্ড উঁচু একটা পাঁচিল এদিক থেকে

ওদিক পর্যন্ত দৃষ্টি-সীমার বাইরে চ'লে গেছে।

শোভন সেইদিকে কাপ্তেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

কাপ্তেন বিস্মিত স্বরে বললেন, অত-বড় পাঁচিল দিয়ে জঙ্গলটা আড়াল ক'রে রাখা হয়েছে কেন? এ কী ব্যাপার!"

ডেন্‌হাম্ বললে, "এ যে চীনের প্রাচীরের মতন ব্যাপার। চীনারা পাঁচিল তুলেছিল তাতার-দস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। কিন্তু এখানে কাদের আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে এমন পাঁচিল তোলা হয়েছে?"

শোভন বললে, "আমরা দ্বীপের এত কাছে এসে পড়েছি, তবুও তো ওখানে জনপ্রাণীকে দেখতে পাচ্ছি না!"

মালবিকা বললে, "কিন্তু ঢাকের বাদ্যির তো বিরাম নেই।"

কাপ্তেন বললেন, "আর একটা-দুটো নয়, শত শত ঢাক বাজছে! আমার বোধহয়, দ্বীপে আজ কোন মহোৎসব হচ্ছে, বাসিন্দারা সবাই সেখানে গিয়ে জুটেছে!"

বোট দুখানা দ্বীপের যত কাছে আসে, সেই আশ্চর্য প্রাচীরের উচ্চতা ততই বেড়ে ওঠে।

শোভন বললে, "পাঁচিলটা দেড়শো ফুটের চেয়ে কম উঁচু হবে না। দেখুন, বড় বড় গাছগুলো পর্যন্ত পাঁচিলের কত নিচে রয়েছে।"

কাপ্তেন বললেন, "যাদের ভয়ে অত উঁচু পাঁচিল দেওয়া হয়, তাদের প্রকৃতি নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর! মিঃ সেন, আপনার ভগ্নীকে আমাদের সঙ্গে না আনলেই ভাল করতুম!"

মালবিকা হেসে বললে, "আমার কিন্তু একটুও ভয় করছে না। মিঃ ঈঙ্গ্‌লহর্ন!"

কাপ্তেন বললেন, "আপনার ভয় না করতে পারে, কিন্তু আমি ভাবছি আমার দায়িত্বের জন্যে!"

বোট ডাঙায় এসে লাগল। কিন্তু তখনো দ্বীপের কোন মানুষকে দেখা গেল না—কেবল সেই শত শত অশান্ত ঢাকের আওয়াজই জানিয়ে দিচ্ছিল যে, এখানে মানুষ বাস করে।

কাপ্তেন বোট থেকে নেমে নাবিকদের ডেকে বললেন, "বন্দুকে টোটা পুরে তোমরা তুজন তুজন ক'রে সার বেঁধে অগ্রসর হও। মিঃ সেন, আপনার ভগ্নীকে নিয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে মাঝখানে থাকুন!"

যেদিক থেকে ঢাক-ঢোলের আওয়াজ আসছিল, সকলে পায়ে পায়ে সেইদিকে এগুতে লাগল।

শোভন বললে, "দেখুন মিঃ ঈঙ্গ্‌লহর্ন! পাঁচিলটা এখন আরো কত বড় দেখাচ্ছে। আর এ পাঁচিল যে একেলে নয়, অনেক শত বৎসরের পুরানো, তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

কাপ্তেন বললেন, "পাঁচিলের গায়ে ওখানে যে একটা মস্তবড় ফটকও রয়েছে! তালগাছের সমান উঁচু ঐ ফটকটা কি-রকম মজবুত দেখেছেন!"

এইবারে সকলে একটা বড় গ্রামের কাছে এসে পড়ল। সারি সারি কুঁড়েঘর, মাঝে মাঝে অলিগলি ও রাস্তা। গ্রামের আকার দেখে আন্দাজে বোঝা গেল, এখানে অন্ততঃ চার-পাঁচ হাজার লোক বাস করে। কিন্তু কোথায় তারা? সারা গ্রাম নিস্তব্ধ ও জনশূন্য, কোথাও জীবনের কোন লক্ষণই নেই।

ঢাক-ঢোলের আওয়াজ তখন ভয়ানক বেড়ে উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে বহু কণ্ঠের গম্ভীর একতানও শোনা যাচ্ছে—যেন কারা অজানা ভাষায় স্তোত্র পাঠ করছে!

ডেন্‌হাম্ বললেন, "এতক্ষণে মানুষের গলার সাড়া পাওয়া গেল। গাঁ-শুদ্ধ লোক এখানে এসে জুটেছে। দেখা যাক্ এরা কারা?"

গাছপালার ভিতর থেকে প্রায় সত্তর-আশী ফুট উঁচু একটা কাঠের বাড়ি জেগে উঠল।

শোভন বললে, "গোলমালটা ঐদিক থেকেই আসছে। ঐ কাঠের উঁচু বাড়িটা বোধহয় মন্দির, নয়তো রাজপ্রাসাদ!"

সামনেই একটা জঙ্গল। সেটা পার হ'তেই সকলের চোখের সুমুখে যে দৃশ্য জেগে উঠল, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনই বিচিত্র!

মালবিকা এতক্ষণ খুব স্ফুর্তির সঙ্গে পথ চলছিল, এখন সে আঁৎকে

উঠে পিছিয়ে প'ড়ে শোভনের গা ঘেঁসে দাঁড়াল।

কাপ্তেন-সাহেব হাত তুলে ইসারা ক'রে নাবিকদের হুঁসিয়ার হ'তে বললেন। নাবিকেরাও তখনি বন্দুক প্রস্তুত ক'রে সাবধান হয়ে দাঁড়াল।

তিন

বেডো! বেডো!

মস্ত একটা কাঠের উঁচু মাচা! তার চারিদিকে কাঠের সিঁড়ি—নানান রকম জীবজন্তুর চামড়ায় ঢাকা!

সেই মাচার টঙে একটি বালিকা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে—কষ্টিপাথরের কালো মূর্তির মত! মেয়েটির মাথায় ফুলের মুকুট, সর্বাঙ্গে ফুলের গহনা!

কাঠের সিঁড়ির ধাপে ধাপে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো কালো কালো পুরুষ মূর্তি, তারা সমস্বরে যেন কি মন্ত্র পড়ছে!

মাচার ডানদিকে আর একটা কাঠের বেদী, তার উপরেও ভূতের মতন কালো একটা লম্বা-চওড়া মূর্তি, তার মাথায় পালকের টুপী, পরনে জন্তুর চামড়া, গলায় মড়ার মাথার মালা। সেও দু-হাত ঊর্ধ্বে তুলে চেঁচিয়ে কি মন্ত্র পড়ছে! বোধহয় সে প্রধান পুরোহিত।

মাচার বাঁ-দিকেও একটা বেদী এবং তার উপরেও জমকালো পোশাক-পরা আর একটা মূর্তি! তার মাথায় মুকুট, হাতে দণ্ড! বোধহয় সে এখানকার রাজা।

নিচের চারিদিকে কাতারে কাতারে লোক—স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ! দলে দলে যোদ্ধা,—হাতে বর্শা, কোমরে তরবারি, পিঠে তীরধনুক! শত শত বাজন্দার, বড় বড় ঢাকে কাঠি পিটুছে! প্রত্যেক মূর্তিই প্রায় উলঙ্গ, কোমরে কেবল কপ্‌নির মত এক এক টুক্‌রো ন্যাকড়া ঝুলছে!

হঠাৎ পুরুত মন্ত্র-পড়া বন্ধ ক'রে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ল। অম্‌নি ভিড়ের ভিতর থেকে জন-বারো মূর্তি বেরিয়ে এসে যে-মাচাটার উপরে সেই ভীত মেয়েটি ব'সে আছে, তারই চারপাশ ঘিরে লাফাতে লাফাতে তাণ্ডব নাচ শুরু ক'রে দিলে! সে মূর্তিগুলোর প্রত্যেকের মুখেই ভীষণ মুখোস, গায়ে বড় বড় লোমওয়ালা চামড়া।

ডেন্‌হাম্ বললে, "গরিলা! ওরা গরিলা সেজে নাচছে! এত জীব থাকতে ওরা গরিলা সাজল কেন?"

এতক্ষণ ওরা এমন ব্যস্ত হয়েছিল যে, কাপ্তেন-সাহেবের অস্তিত্বের কথা কেউ জানতেও পারেনি। কিন্তু এখন রাজদণ্ডধারী মূর্তিটার দৃষ্টি আচম্বিতে নূতন আগন্তুকদের উপর গিয়ে পড়ল! সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল—"বেডো! বেডো! ড্যামা পেটি ভেগো!"

অম্‌নি সমস্ত ঢাক-ঢোল, মন্ত্র-পড়া, চিৎকার ও নৃত্য যেন কোন্ মায়া-মন্ত্রেই একসঙ্গে থেমে গেল! চারিদিক এমনি স্তব্ধ হ'ল যে, একটা আল্‌পিন পড়ার শব্দও শোনা যায়!

সমস্ত লোক হতভম্বের মত কাপ্তেন-সাহেবের দলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল! এবং শিশু ও স্ত্রীলোকেরা একে একে ভিড়ের ভিতর থেকে নীরবে স'রে পড়তে লাগল।

ডেন্‌হাম্ ত্রস্তকণ্ঠে বললে, "দেখ, দেখ! স্ত্রীলোক আর শিশুরা পালিয়ে যাচ্ছে। গতিক সুবিধার নয়, আমাদেরও এখান থেকে অদৃশ্য হওয়া উচিত।"

কাপ্তেন বললেন, "আর পালানো চলে না। ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও, আমরা যে ভয় পেয়েছি সেটা ওদের জানতে দেওয়া হবে না।"

রাজা ও পুরুত বেদীর উপর থেকে নেমে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল, তাদের পিছনে পিছনে আসছে একদল যোদ্ধা। ভিড়ের ভিতরে এখন আর একজনও শিশু কি স্ত্রীলোক নেই!

ডেন্‌হাম্ বললে, "এই বনমানুষগুলো এগিয়ে আসছে কেন?"

রাজার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে কাপ্তেন বললেন, "জানি না।"

মালবিকা বললে, "হ্যাঁ দাদা, ওরা কি আমাদের আক্রমণ করবে?"

শোভন বললে, "কেমন ক'রে বলব? কিন্তু আমাদের আক্রমণ করলে ওদেরই বেশি বিপদ্ হবে। আমাদের বন্দুক আছে।"

রাজা ও পুরুত সদলবলে এগিয়ে নাবিকদের সামনে এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ পুরুতের চোখ পড়ল মালবিকার উপরে! অত্যন্ত বিস্ময়ে খানিকক্ষণ নীরব থেকে আচম্বিতে শূন্যে এক লাফ মেরে সে কি বিকট স্বরে চিৎকার ক'রে উঠল, "ড্যামা সি ভেগো! ড্যামা সি ভেগো! কং! কং! কং! টাস্কো!"

রাজাও মালবিকাকে দেখে সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কং! কং! কং! টাস্কো!"

তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তে যোদ্ধার দল ছুটে এসে মালবিকাকে ধরবার উপক্রম করলে।

মালবিকা সভয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠল—"দাদা! দাদা!"

কাপ্তেন বললেন, "বন্দুক ছোঁড়ো!"

একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক গর্জন ক'রে উঠল—পর-মুহূর্তে সাত-আটজন যোদ্ধার দেহ মাটির উপর প'ড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

এরা নিশ্চয়ই বন্দুকের নামও কখনো শোনেনি। কারণ ব্যাপারটা দেখে তারা সবাই বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে অল্পক্ষণ সেখানে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, এবং তারপরেই মহাভয়ে তীরবেগে পলায়ন করতে লাগল। তারপর কেবল তারা নয়, সেখানকার সেই বিপুল জনতাও যেন কোন যাদুমন্ত্রের মহিমায় কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

মালবিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "দাদা, ঐ কেলে ভূতগুলো আমাকে ধরতে এসেছিল কেন?"

মালবিকাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে শোভন বললে, "কি ক'রে জানব বল? ওদের ভাষা তো বুঝি না!"

কাপ্তেন হত ও আহত যোদ্ধাগুলোর দেহের উপরে একবার চোখ

বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "আর দ্বীপ দেখে কাজ নেই—যথেষ্ট হয়েছে। শীগ্‌গির জাহাজে চল, হতভাগারা যদি আবার দল বেঁধে আক্রমণ করে, তাহ'লে মুশকিলে পড়তে হবে।"

চার

বিপদ

ইঞ্জিন মেরামত করবার জন্যে জাহাজখানা সেদিন সেইখানেই থেকে গেল।

সন্ধ্যার সময়ে জাহাজের 'ডেকে' ব'সে কাপ্তেন, ডেন্‌হাম্‌, শোভন, মালবিকা ও আরো কয়েকজন আরোহী আজকের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিল।

ডেন্‌হাম্‌ বললে, "ওরা কং কং ক'রে অত চেঁচাচ্ছিল কেন?"

শোভন বললে, "হয়তো কং ওখানকার কোন দেবতার নাম।"

ডেন্‌হাম্‌ বললে, "উঁচু মাচার ওপরে সেই মেয়েটির কথা মনে কর। আমি বেশ দেখেছি, তার মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে, আর পুরুতরা যখন মন্ত্র পড়ছিল, সে তখন ভয়ে থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপছিল!—আর গরিলা-বেশে সেই লোকগুলোর কথাও মনে কর। নাচতে নাচতে হাত বাড়িয়ে তারা যেন সেই মেয়েটাকেই পেতে চাইছিল!"

মালবিকা বললে, "মিঃ ডেন্‌হাম্‌! আমার কিন্তু সেই মেয়েটিকে দেখে বলির পশুর কথাই মনে হচ্ছিল।"

শোভন বললে, "আর সেই অদ্ভুত প্রাচীর। আমি দেখেছি, প্রাচীরের সেই প্রকাণ্ড ফটকটা এদিক থেকেই বন্ধ করা আছে। তার মানে, ফটকের ওদিকে এমন কোন আতঙ্ক আছে, যাকে ওরা এদিকে ঢুকতে দিতে রাজি নয়। সে আতঙ্ক এমন ভয়ঙ্কর যে, দেড়শো ফুট উঁচু প্রাচীর

তুলতে হয়েছে। ওখানকার বাসিন্দারা সবাই প্রাচীরের এদিকে থাকে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, প্রাচীরের এদিকটাকেই ওরা নিরাপদ ঠাঁই ব'লে মনে করে।"

কাপ্তেন ঈঙ্গ্‌লহর্ন এতক্ষণ দুই চক্ষু মুদে পাইপ টানতে টানতে সমস্ত কথাবার্তা শুনছিলেন। এখন তিনি চোখ খুলে পাইপটা হাতে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, "আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, তবে আপনাদের আমি বিশ্বাস করতেও বলি না, কারণ অনেক দিন আগে আমি এমন একটা গল্প শুনেছিলুম, যা বিশ্বাস করবার মত নয়। গল্পটা শুনেছিলুম আমি এক বুড়ো নাবিকের মুখে। তাদেরও জাহাজ নাকি চীন-সমুদ্রে 'টাইফুনে' পথ হারিয়ে এক অজানা দ্বীপে গিয়ে প'ড়েছিল। সে দ্বীপের বাসিন্দারা অসভ্য। তাদের রাজা নাকি এক দানবের মত প্রকাণ্ড গরিলা। সে গরিলা এমন প্রকাণ্ড যে, কুকুর নিয়ে আমরা যেমন খেলা করি, বড় বড় হাতি নিয়ে তেমনি অবহেলায় সে খেলা করতে পারে। দ্বীপের বাসিন্দারা নাকি প্রতি-বৎসর তাদের গরিলা-রাজাকে একটি ক'রে বালিকা উপহার দেয়—সেই বালিকাকে তারা 'রাজার-বউ' বলে।"

শোভন বল্‌লে, "শুনেছি, আদিম কালে যখন মানুষের জন্ম হয়নি, তখন পৃথিবীতে সত্তর-আশী ফুট উঁচু অতিকায় সব জীবজন্তু ছিল। পণ্ডিতরা মাটির ভিতর থেকে তাদের অনেক কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু সে-সব জন্তু এখন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং হাতি নিয়ে ছোট কুকুরের মতন খেলা করতে পারে, এমন প্রকাণ্ড গরিলার কথা বিশ্বাস করি কেমন ক'রে?"

কাপ্তেন আবার তাঁর দুই চক্ষু মুদে ফেলে বললেন, "আপনাকেও বিশ্বাস করতে বলি না, আমি নিজেও বিশ্বাস করি না। আমি একটা গল্প শুনেছিলুম, আজ কেবল সেইটেই আপনাদের কাছে বল্‌লুম।"

ডেন্‌হাম্‌ বলল, "ও দানব-গরিলাটার কথাটা নিশ্চয়ই আজগুবি কথা। কিন্তু পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় এখনো যে আদিম কালের

অতিকায় জীবজন্তু জ্যান্ত অবস্থায় বিচরণ করছে, মাঝে মাঝে তাও শোনা যায়, আর অনেক পণ্ডিত সেকথা বিশ্বাসও করেন।"

শোভন বললে, "আমারও কিন্তু ঐ-রকম অতিকায় জন্তুদের স্বচক্ষে দেখতে সাধ হয়।"

মালবিকা বললে, "আমারও।"

হঠাৎ দুই চোখ খুলে ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে কাপ্তেন বললেন, "ডেন্‌হাম্! শুনছ?"

—"কি?"

—"হতভাগা বনমানুষগুলো আবার ঢাক-ঢোল বাজাতে শুরু করেছে।"

—"হুঁ। দেখ—দেখ; কাল দ্বীপ ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার, আজ কিন্তু ওখানে শত শত মশাল জ্বলছে। ব্যাপার কি, অত আলো জ্বেলে ওরা কি করছে?"

কৌতুক-হাস্য ক'রে মালবিকা বললে, "বোধহয় গরিলা-রাজার বৌকে সাজানো হচ্ছে।"

শোভন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "মালবিকা, বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আর থেকো না,—চল, ভেতরে চল।"

পরের দিন সকালে কাপ্তেন ঈঙ্গ্‌ল্‌হর্ন জাহাজের ডেকে পায়চারি করছেন, এমন সময়ে শোভন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, "মিঃ ঈঙ্গ্‌ল্‌হর্ন। আমার ভগ্নীকে আপনি দেখেছেন? তাকে কেবিনের ভেতরে পাওয়া যাচ্ছে না!"

কাপ্তেন বললেন, "মিস্ সেন এদিকে তো আসেননি। বোধহয় জাহাজের অন্য কোথাও আছেন।"

শোভন আকুল স্বরে বললে, "আমি সমস্ত জাহাজ খুঁজে দেখেছি—আমার বোন কোথাও নেই।"

কাপ্তেন হঠাৎ চকিত দৃষ্টিতে শোভনের হাতের দিকে তাকিয়ে

বললেন, "মিঃ সেন! আপনার হাতে ওটা কি?"

শোভন বললে, "আমার বোন যে কেবিনে ছিল, তারই দরজার কাছে আমি এই বর্শার ফলাটা কুড়িয়ে পেয়েছি।"

বর্শার ফলাটা হাতে ক'রে কাপ্তেন বললেন, "দ্বীপের যোদ্ধাদেরও বর্শার ফলা এইরকম। মিঃ সেন, চলুন—চলুন, জাহাজটা আমরা আর একবার খুঁজে আসি। মিস্ সেনকে পাওয়া যাচ্ছে না—তাও কি হ'তে পারে?"

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মালবিকার সন্ধান মিলল না!

কাপ্তেন ঈঙ্গ্লহর্ন হুঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন, "কি! আমার জাহাজ থেকে মহিলা চুরি! এর পরে সভ্য-সমাজে আমি মুখ দেখাব কেমন ক'রে? ডেন্হাম্—ডেন্হাম্। বোট নামাও,—এখনি আমরা দ্বীপে যাব। সবাই অস্ত্র ধর! বন্দুক, রিভলভার, বোমা, ডিনামাইট – সব নিয়ে চল। চীন-সমুদ্রের চীনে-বোম্বেটেদের ভয়ে সব-রকম অস্ত্রই আমি জাহাজে রেখেছি। সে-সবই নিয়ে বোটে ওঠো—এক মুহূর্তও দেরি নয়। এই বনমানুষের দেশ আজ আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশান ক'রে দিয়ে যাব।"

পাঁচ

কঙ্

রাতের নিবিড় অন্ধকারে অসভ্যদের ছিপ্ তীরের মত দ্বীপের দিকে ছুটে চল্ল।

তখনো তারা তাকে সজোরে চেপে আছে, মালবিকা অনেক চেষ্টা ক'রেও সে-সব কঠিন হাতের নিষ্ঠুর বাঁধন একটুও আল্গা করতে পারলে না! তার মুখও বাঁধা, চিৎকার করাও অসম্ভব!

সে কি দুঃস্বপ্ন দেখছে? এও কি সম্ভব—সে কি সত্য সত্যই অসভ্যদের

হাতে বন্দিনী? এত-বড় বিপদ যে তার কল্পনাতেও আসে না!

হঠাৎ একটা ধাক্কা লেগে নৌকাখানা থেমে গেল—সঙ্গে সঙ্গে যারা তাকে চেপে ধরেছিল, তারা হাতের বাঁধন খুলে দিলে।

কিন্তু তারপরেই অন্ধকারে কে তাকে পিঠের উপরে তুলে নিলে। অনুভবে সে বুঝলে, তাকে নিয়ে লোকটা নৌকা থেকে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ল।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু শব্দ শুনে সে বুঝতে পারলে, তার আশেপাশে অনেক লোক আছে। এরা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ···আর সে ভাবতে পারলে না, তার মাথা ঘুরতে লাগল, সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

মালবিকার যখন জ্ঞান হ'ল, তখন সে দেখলে, তার চারদিকে আলোয় আলো! সে ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বসল!

এ যে সকালের সেই দৃশ্যটাই আবার তার চোখের সামনে জেগে উঠল। সেই দুই বেদীর উপরে রাজা আর পুরুত ব'সে আছে, চারদিকে সেই জনতা, গরিলা-বেশে নর্তকদের নৃত্য, মন্ত্রপাঠ, ঢাক-ঢোলের আওয়াজ। কেবল সকালে মশাল ছিল না, এখন শত শত মশাল জ্বলছে।

তার দিকে করুণ মমতা-ভরা চোখে একটি কালো মেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, মালবিকা তাকেও চিনতে পার্‌লে। এই মেয়েটি সকালে ফুলের মুকুট ফুলের গয়না প'রে মাচার উপরে ব'সে ভয়ে থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছিল। এখন তার আর সে মুকুট ও গয়না নেই, এখন তার সাজ-গোজ এখানকার অন্য অন্য মেয়েদেরই মত।

একটু পরেই তার কারণও বুঝতে পারলে। তাকে উঠে বসতে দেখেই জনকয় লোক এসে তার মাথায় ফুলের মুকুট, গলায় ও হাতে ফুলের গয়না পরিয়ে দিলে।

পুরুত চিৎকার ক'রে উঠল—"হেডো মেডো গেডো!"

অম্‌নি কয়েকজন লোক এসে মালবিকাকে ধ'রে শূন্যে তুলে সেই

উঁচু মাচার উপরে গিয়ে উঠল। তারপর তাকে মাচার উপরে বসিয়ে দিয়ে নিচে নেমে গেল। মাচার সিঁড়ির ধাপে ধাপে অন্যান্য পুরোহিতেরা দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে মন্ত্রপাঠ শুরু করে দিলে—গরিলাবেশে বারোজন লোক ঢাকের তালে তালে তাণ্ডব নাচ নাচতে লাগল!...আজ সকালেও সে এইরকম দৃশ্য দেখে গিয়েছিল।

মালবিকার এখন আর কোন ভয় হচ্ছে না—তার মন এখন দুঃখ-ভয়-ভাবনার বাইরে গিয়ে পড়েছে, মন্ত্রমুগ্ধ ও স্বপ্নাচ্ছন্ন জীবের মতন মাচার উপরে সে ব'সে রইল—সামনে মূর্তিমান যমকে দেখলেও বোধহয় এখন সে চম্‌কে উঠবে না।

সেইখানে ব'সে ব'সে সে নির্বিকারভাবে দেখতে লাগল, খানিক তফাতে একদল লোক গিয়ে উচ্চ প্রাচীরের প্রকাণ্ড ফটকটা খুলে ফেল্‌লে—সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় কাঁসর ও ঝাঁঝের আওয়াজে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠল—ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঢং।

কোন্ পথ দিয়ে নিচেকার সমস্ত জনতা হৈ-চৈ তুলে সেই দেড়শো ফুট উঁচু পাঁচিলের উপরে গিয়ে উঠল—প্রত্যেকের হাতে এক একটা মশাল—চারিদিকের দৃশ্য দিনের বেলার মত স্পষ্ট।

রাজা হঠাৎ চেঁচিয়ে বললেন—"কং। কং। কং। টাস্কো।"

অমনি কয়েকজন যোদ্ধা এসে আবার মালবিকাকে মাচা থেকে তুলে নামিয়ে নিয়ে গেল এবং তারপর সেই প্রকাণ্ড ফটকের ভিতরে প্রবেশ করল।

ফটকের ভিতর ঢুকলে প্রথমেই নজরে পড়ে ছোটোখাটো একটা প্রান্তর,—তারপরেই যেদিকে তাকানো যায়—নিবিড় অরণ্য ও ভয়াবহ অন্ধকার এবং তারই ভিতর থেকে আকাশের দিকে উঠে গেছে সেই মড়ার মাথার খুলির মত অদ্ভুত পাহাড়ের চূড়াটা।

প্রাচীরের উপর থেকে বিপুল জনতা সমস্বরে মন্ত্রপাঠ করছে।—ঢাক বাজছে হুম্‌ হুম্‌ হুম্‌ হুম্‌,—কাঁসর-ঝাঁঝর গর্জন করছে ঘং ঘং ঘং ঘং।

প্রান্তরের উপরেও একটা উঁচু পাথরের বেদী—তার দুধারে বড় বড় থাম। যোদ্ধারা মালবিকাকে নিয়ে সেই বেদীর উপর গিয়ে উঠল এবং দুই থামের মাঝখানে তাকে দাঁড় করিয়ে থামের সঙ্গে তার দুই হাত বেঁধে দিলে। তারপর ভূতের ভয়ে লোকে যেমন ক'রে পালায়, তেমনি ভাবে সবাই আবার প্রাচীরের ওপারে পলায়ন করলে এবং সেইসঙ্গে সেই সুবৃহৎ ফটকটাও তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল।

পাহাড় ও অরণ্যের ভিতর থেকে একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অপার্থিব মেঘ-গর্জনের মতন গম্ভীর আওয়াজ জেগে উঠল।

প্রাচীরের উপরে হাজার হাজার মশাল নাচিয়ে হাজার হাজার কণ্ঠে চিৎকার উঠল—"কং! কং! কং! কং! কং! কং!"

মালবিকার প্রায়-মূর্ছিত দেহ তখন এলিয়ে পড়েছে—নির্বাক ভাবে, বিস্ফারিত নেত্রে সে দেখলে, জঙ্গলের গর্ভ থেকে অন্ধকারের চেয়ে কালো একটা ভয়ঙ্কর ছায়া-দানব দুল্‌তে দুল্‌তে এগিয়ে আসছে। কী বৃহৎ তার দেহ! যেন একটা চলন্ত পর্বত!

দানবটা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে প্রাচীরের উপরের জনতার দিকে চেয়ে কয়েকবার ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দান করলে! তারপর নিচু ও হেঁট হয়ে বেদীর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

তার চোখ দুটো ফুটবলের মতন বড় এবং তাদের ভিতর থেকে যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে। তার এক-একটা দাঁত হাতির দাঁতের মতন লম্বা। তার এক একখানা বাহু বটগাছের গুঁড়ির মতন মোটা। সেই বিভীষণ মূর্তি দেখে মালবিকা আর পারলে না—পরিত্রাহি চিৎকার করতে করতে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেল।

এই তাহ'লে কঙ্,—রাজা কঙ্! এখানকার সমস্ত লোক এই বিরাট গরিলা-রাজার প্রজা! মালবিকা হবে আজ এই গরিলা-দানবের মানুষ-বউ!

কঙ্ যেন মালবিকাকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। বৎসরে বৎসরে সে অনেক বধূ উপহার পেয়েছে, কিন্তু তাদের গায়ের রং তো এই নূতন বউয়ের মতন ধব্‌ধবে সাদা নয়!

কঙ্ হাত বাড়িয়ে পট্ পট্ ক'রে দড়ি ছিঁড়ে মালবিকাকে তুলে নিলে। মানুষের হাতে চড়ুই-পাখীকে যেমন দেখায়, কঙ্য়ের হাতের মুঠোর ভিতরে মালবিকাকেও দেখাতে লাগল তেম্নি ছোট্টটি।
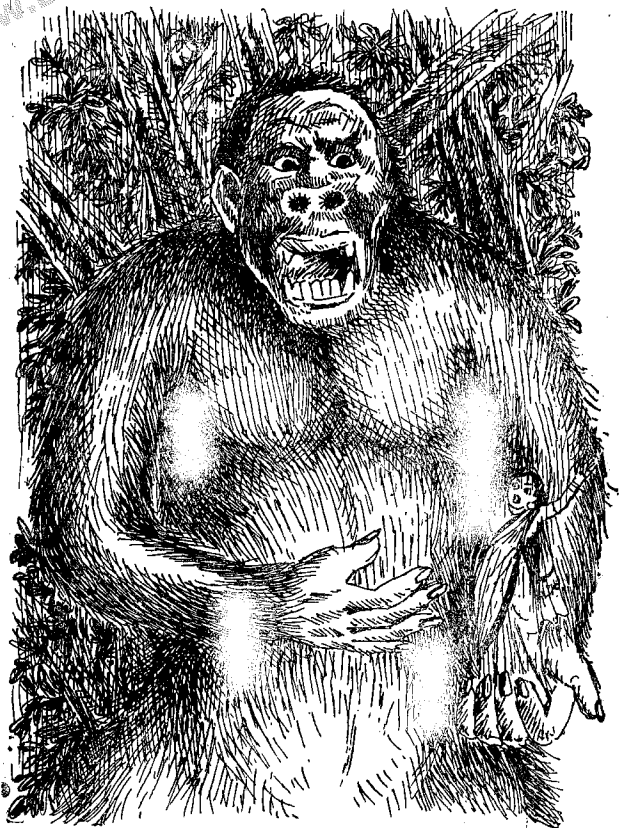
হাতের মুঠোয় মালবিকাকে নিয়ে কঙ্ আবার পর্বত ও অরণ্যের দিকে অগ্রসর হ'ল—তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

এমন সময়ে প্রাচীরের ওপার থেকে "গুড়ুম গুড়ুম" ক'রে বন্দুকের আওয়াজ ও বহু কণ্ঠের আর্তনাদ জেগে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সুবৃহৎ ফটক আবার খুলে গেল।

কঙ কিন্তু একবারও পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে না, মস্ত এক লাফ মেরে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুবৃহৎ ফটকের ভিতর দিয়ে তীরের মতন বেগে প্রথমে শোভন, তারপর কাপ্তেন-সাহেব, ডেন্হাম্ ও নাবিকেরা সেই প্রান্তরের উপরে এসে দাঁড়াল।

তাদের বন্দুকের গুলি খেয়ে প্রাচীরের উপর থেকে ততক্ষণে মশাল-ধারী অসভ্যগুলো কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

শোভন সর্বপ্রথমে এসেছিল ব'লে কেবল সেই-ই কঙ্য়ের বিরাট দেহটা দেখতে পেয়েছিল—মাত্র এক পলকের জন্যে।

শোভন চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, "দানবটা ঐ পথে গেছে। আমি তাকে দেখেছি। এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করলে আমার বোনকে আর পাওয়া যাবে না। তোমরা কে কে আমার সঙ্গে যাবে, এস।"

কাপ্তেন বললেন, "এক মিনিট অপেক্ষা করুন মিঃ সেন!……ডেন্-হাম্, তুমি বিশ জন লোক নিয়ে মিঃ সেনের সঙ্গে যাও। বাকি লোকদের নিয়ে জাহাজ আর অসভ্যদের উপরে পাহারা দেবার জন্যে আমি এখানে থাকি। সকলে এইটুকু মনে রেখ: মিস্ সেনকে উদ্ধার করা আমাদের কর্তব্য—তাঁকে উদ্ধার করা চাই-ই।"

সকলে একসঙ্গে ব'লে উঠল, "হ্যাঁ, তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য আমরা

প্রাণ দিতেও ভয় পাব না।"

কাপ্তেন বললেন, "ভগবান তোমাদের সহায় হোন!"

শোভন, ডেন্‌হাম্ ও বিশজন নাবিক সেই দুর্গম অরণ্য ও দুরারোহ পর্বতের দিকে ঝড়ের মত ছুটে চলল!

পাহাড়ের যেখান থেকে সেই দানব-গরিলার মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, সেইখানে উপস্থিত হয়ে দেখা গেল, পাহাড়ের গা সেখানে ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে—যেন জঙ্গলময় পাতালের অন্ধকারের মধ্যে।

ডেন্‌হাম্ বললে, "সকলে একসার হয়ে চল—একজনের পিছনে আর-একজন। প্রত্যেকে তার আগের লোকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হও।"

একে পাহাড়ের ঢালু গা, তার উপরে জঙ্গল ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে।

ডেন্‌হাম্ বললে, "মিঃ সেন, জাহাজে চাকরী নিয়ে আমি সারা-পৃথিবী ভ্রমণ করেছি, সব দেশের গাছপালাই আমি চিনি। কিন্তু এখান-কার জঙ্গলের একটা গাছও আমি চিনতে পারছি না। এ-সব গাছপালা দেখলে মনে হয়, এরা যেন এ পৃথিবীর নয়!"

শোভন বললে, "কেতাবে আমি সেকেলে পৃথিবীর গাছপালার ছবি দেখেছি। এখানকার গাছপালা দেখে সেই ছবির কথা আমার স্মরণ হচ্ছে। এখানকার সঙ্গে বোধহয় আধুনিক জগতের কোন সম্পর্ক নেই—হয়তো এখানকার জীবজন্তুরাও সেকেলে জীবজন্তুদের মতন ভয়ঙ্কর আর কিম্ভুতকিমাকার।"

—"আপনি তো বলছেন, সেই গরিলা-দানবটাকে আপনি দেখতে পেয়েছেন। মাথায় সে কত উঁচু হবে?"

শোভন বললে, "আমি অনেক দূর থেকে চকিতের মত তাকে এক-বার মাত্র দেখেছি! ঠিক ক'রে কিছু বলতে পারব না, তবে আমার মনে হল, মাটি থেকে তার মাথা বোধহয় পঞ্চাশ-ষাট ফুটের চেয়ে কম উঁচু হবে না।"

ডেন্‌হাম্‌ চম্‌কে উঠে বললে, "কি সর্বনাশ! বলেন কি?"

পাহাড়ের ঢালু গা একটা উপত্যকার ভিতরে এসে শেষ হয়েছে। উপত্যকার ভিতর দিয়ে একটা পাহাড়ে নদী কল্‌কল্‌ স্বরে ব'য়ে যাচ্ছে এবং নদীর ওপারে পাহাড়ের গা আবার উপর দিকে উঠে গিয়েছে। আরো একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, নদীর ওপারে যে জঙ্গল রয়েছে তা আরো ঘন এবং দুর্ভেদ্য। সেখানকার এক-একটা গাছই একশো-দেড়শো ফুট বা তার চেয়েও বেশি উঁচু! সেই সব গাছের উপরে কত রকমের পরগাছা ভিড় ক'রে আছে এবং অসংখ্য লতাপাতার জালে প্রত্যেক গাছের সঙ্গে প্রত্যেক গাছ বাঁধা। এখন আকাশে সূর্যালোকের জোয়ার বইছে, কিন্তু সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে কোন কালেই বোধহয় সূর্যালোক প্রবেশ করবার পথ পায়নি!

শোভন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললে, "দেখুন মিঃ ডেন্‌হাম্‌! নদীর তীরে ভিজে মাটির দিকে চেয়ে দেখুন।"

ডেন্‌হাম্‌ ও নাবিকরা আশ্চর্য হয়ে দেখলে, ভিজে মাটির উপরে সারি সারি পায়ের দাগ রয়েছে! সে-সব পায়ের দাগ মানুষের পায়ের দাগের মতন দেখতে বটে, কিন্তু মানুষের পায়ের দাগের চেয়ে তা অনেক—অনেক গুণ বড়, কারণ তার প্রত্যেকটি পদচিহ্ন পাঁচ-ছয় ফুটের চেয়ে কম লম্বা হবে না!

শোভন বললে, "এতক্ষণে সবাই বুঝতে পারলেন তো, আমরা কি ভীষণ দানবের পিছু নিয়েছি! সেই দানব এইখান দিয়ে নদী পার হয়ে গেছে। নদীটা ছোট, জলও বোধহয় বেশি নেই,—আসুন, আমরাও পার হয়ে যাই।"

বাস্তবিক, নদীতে এক কোমরের বেশি জল হ'ল না—সকলেই একে একে নিরাপদে পার হয়ে গেল।

ওপারে গিয়ে পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল, সেই দানবটা পাহাড়ের গা ব'য়ে আর উপরে ওঠেনি, ডানদিকে ফিরে নদীর ধার ধ'রেই চ'লে গেছে। সকলে সেই পথেই অগ্রসর হ'ল। কিন্তু খানিক দূর গিয়ে পায়ের

দাগও আর পাওয়া গেল না।

ডেন্‌হাম্‌ বললে, "এই যে, জঙ্গল সরিয়ে এখান দিয়ে মস্ত বড় কোন জানোয়ার ভিতরে ঢুকেছে। এই পথেই এস।"

আরো খানিকটা এগিয়েই ডেন্‌হাম্‌ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শোভন বললে, "ব্যাপার কি?"

ডেন্‌হাম্‌ বললে, "সামনের দিকে চেয়ে দেখুন।"

জঙ্গলের ভিতরে ছোট্ট একটা জমি। সেখানে এক ভীষণাকার জীব বিচরণ করছে। তার দেহটা চার-চারটে হাতির চেয়ে বড়, ল্যাজটা কুমীরের মতন দেখতে—কিন্তু লম্বায় তা চব্বিশ-পঁচিশ ফুট হবে এবং তার উপরে শত শত তীক্ষ্ণ গজাল। তার গলদেশও দীর্ঘতায় চব্বিশ-পঁচিশ ফুটের চেয়ে কম হবে না এবং মুখটা দেখতে অজগর সাপের মত। এই হস্তি-কুমীর-অজগর আকৃতির কিম্ভূতকিমাকার অতিকায় দানবটা আপন মনে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে এবং তার পদভরে পৃথিবীর বুক থর্‌ থর্‌ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ছে।

হঠাৎ সেও শোভনদের দূর থেকে দেখে ফেললে এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন বিকট ও কর্কশ স্বরে গর্জন ক'রে উঠল যে, আকাশ বাতাস পর্যন্ত যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ডেন্‌হাম্‌ চেঁচিয়ে বললে, "সবাই সাবধান। ও আমাদের দেখতে পেয়েছে। ও আমাদের দিকে আসছে।"

ডেন্‌হাম্‌ ও শোভন একসঙ্গে বন্দুক ছুঁড়লে, গুলি তার গায়েও লাগল, কিন্তু তার অত বড় দেহের ভিতরে দুটো ক্ষুদে ক্ষুদে গুলি ঢুকে কিছুই করতে পারলে না, সে এক এক লম্বা লাফ মেরে তেমনি বিকট স্বরে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে শোভনদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ডেন্‌হাম্‌ আবার গলা তুলে বললে, "সবাই মাটির উপর শুয়ে পড়। আমি বোমা ছুঁড়ছি।"

বোমা ফাট্‌বার সময়ে কাছে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে তারও আহত হওয়ার সম্ভাবনা। সবাই শুয়ে পড়ল—সেই হিংস্র দানবটার দিকে

সজোরে বোমা ছুঁড়ে ডেন্‌হাম্‌ও ধরণীতলকে আশ্রয় করলে।

গড়াম্‌ ক'রে কান-ফাটানো শব্দের সঙ্গে বোমা ফেটে গেল—চারিদিকে ধুলো-ধোঁয়া কাঠ-পাথর মাংস ও হাড়ের টুকরো ঠিক্‌রে পড়তে লাগল এবং সকলেই শুনতে পেলে বিরাট এক দেহ মাটির উপরে এক প্রচণ্ড আছাড় খেলে।

সকলে আবার উঠে দাঁড়াল। প্রায় ডেন্‌হামের পায়ের কাছে এসে সেই জীবটার অজগরের মতন ভয়ানক মুখটা ছট্‌ফট্‌ করছে এবং তার দেহটা স্থির ও উপুড় হয়ে প'ড়ে রয়েছে ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মত।

আরো গোটাকয়েক গুলিবৃষ্টি করবার পর তার শেষ প্রাণটুকুও বেরিয়ে গেল।

শোভন বললে, "কি ভয়ানক। বোমা ছোঁড়বার পরেও এই জীবটা অন্ততঃ পঞ্চাশ ফুট জমি পার হয়ে এসেছে।"

ডেন্‌হাম্‌ আনন্দ ও গর্বের স্বরে বললে, "কিন্তু এই রাক্ষসকে আমি কাৎ করেছি। একি যে-সে বোমা।"

শোভন বললে, "আমি যা ভেবেছিলুম, তাই। যে-কোন কারণেই হোক্‌, এই দ্বীপে সেকেলে পৃথিবীর রাক্ষুসে জীবগুলো এখনও বেঁচে আছে।......কিন্তু এখন আমাদের এ-সব কথা ভাববার সময় নেই। এবার কোন্‌দিকে যাব?"

একজন নাবিক আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, "এই তো আমাদের পথ। দেখছেন না, জঙ্গল ভেঙে এখান দিয়ে যেন একটা পাগ্‌লা হাতি চ'লে গিয়েছে।"

নাবিক ঠিকই বলেছে। সকলে আবার সেই পথে পা চালিয়ে দিলে। বেশিদূর যেতে হল না। আবার সুমুখে এক মস্ত বাধা।

জঙ্গলের একপাশে নদীর জল প্রায় একটা হ্রদের মত জলাশয় সৃষ্টি করেছে। গরিলা-দানবের পায়ের দাগ সেই জলের ভিতরে নেমে গিয়েছে;—দেখলে বুঝতে দেরী লাগে না যে, সে হ্রদ পার হয়ে ওপারে গিয়ে

উঠেছে।

হ্রদের গভীরতা পরীক্ষা ক'রে সকলেই বুঝলে এবারে আর পায়ে হেঁটে ওপারে যাওয়া চলবে না। এখন উপায়?

ডেন্‌হাম্‌ দমবার পাত্র নয়। সে বললে, "এস, সবাই মিলে গাছ কেটে ভেলা তৈরী করি। আমরা ভেলায় চ'ড়ে হ্রদ পার হ'ব।"

তা ছাড়া উপায়ও ছিল না। সবাই গাছ কাটতে আরম্ভ করলে।

শোভন বললে, "আমার ভগ্নীর উদ্ধারের জন্যে আমাকে যদি পৃথিবীর এদিক থেকে ওদিকে যেতে হয়, যদি মরণের সম্মুখীনও হ'তে হয়, তাতেও আমার ভাববার কিছু থাকবে না। এইমাত্র আমরা যে অদ্ভুত জীবের কবলে গিয়ে পড়েছিলুম, এই দ্বীপে হয়তো তার চেয়েও সব ভয়ঙ্কর জীব-জন্তু আছে। হয়তো তাদের আক্রমণে আমাদের অনেকেরই প্রাণ যাবে। আমার ভগ্নীর জন্যে আপনারা নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করবেন কিনা, এইবেলা সেই কথাটা ভেবে দেখুন। আমি নিশ্চয়ই মরণের দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে যাব, কিন্তু আপনারা ইচ্ছা করলে এখনো ফিরে যেতে পারেন।"

সকলে একস্বরে ব'লে উঠল, "আমরা কাপুরুষ নই—মরতে ভয় পাই না।"

সাত

ডাইনসর

কতকগুলো মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি কেটে শক্ত লতার বাঁধনে তাদের একসঙ্গে বেঁধে ভেলা তৈরী করা হ'ল। লম্বা লম্বা গাছের ডালের সাহায্যে ভেলা চালাবারও ব্যবস্থা হ'ল।

বাইশজন লোক সেই ভেলার পক্ষে গুরুভার হ'লেও ভেলা সে ভার কোনরকমে সহ্য করলে। তারপর ভেলাকে অন্য তীরের দিকে

সাবধানে চালনা করা হ'ল।

খানিক দূরে গিয়ে গাছের লম্বা ডাল যতটা পারা যায় জলে ডুবিয়েও থই পাওয়া গেল না।

ডেন্‌হাম্ বললে, "আচ্ছা, ডালগুলোকে দাঁড়ের মত ব্যবহার কর। অবশ্য, আমরা আর ততটা তাড়াতাড়ি যেতে পারব না, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই।"

ডালগুলোকে দাঁড়ের মত ব্যবহার করাতে ভেলাটা টলমল করতে লাগল।

ডেন্‌হাম্ বললে, "ভাই সব, সাবধান! ভেলা উল্টোলে আর রক্ষা নেই।"

হঠাৎ সমস্ত ভেলাটা একপাশে কাৎ হয়ে পড়ল—যেন জলের ভিতরে কিসের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগেছে।

সেই সঙ্গেই একসঙ্গে যেন পঞ্চাশটা ষাঁড় ক্রুদ্ধ গর্জন ক'রে উঠল।

একজন নাবিক সভয়ে বললে, "হে ভগবান্! ও আবার কি?"

জলের মধ্য থেকে ভেলার ঠিক পাশেই প্রকাণ্ড একখানা বীভৎস মুখ এবং বিরাট একটা দেহের কতক অংশ জেগে উঠল। সে মুখখানা এত বড় যে, এক গ্রাসে পাঁচ-ছয়জন মানুষকে গিলে ফেলতে পারে!

শোভন ব'লে উঠল, "ডাইনসর! ডাইনসর! ছবিতে আমি এ মূর্তি দেখেছি"

ভীষণ আতঙ্কে সকলে এ ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল! ভেলা উল্টে যায় আর কি!

হঠাৎ সেই ভয়াবহ ডাইনসর জলের ভিতরে আবার ডুব মারলে। নাবিকরা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে; কিন্তু শোভন ও ডেন্‌হাম্ দেখলে জলের ভিতর দিয়ে মস্ত একটা ছায়া ভেলার দিকে এগিয়ে আসছে।

ডেন্‌হাম্ তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "ভেলা সামলাও—ভেলা সামলাও!" কিন্তু তার মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতে সেই ক্রুদ্ধ জীবটা ভেলার তলায় বিষম এক ঢু' মারলে। পর মুহূর্তে ভেলাখানা টুকরো টুকরো হয়ে

শূন্যে ঠিকরে উঠে আবার জলের ভেতরে গিয়ে পড়ল।

শোভন, ডেনহাম্‌ ও অন্যান্য নাবিকরা পাগলের মত ওপারের দিকে সাঁতরে চলল। ভাগ্যে তীর আর বেশি দূরে ছিল না, সবাই কোনরকমে ডাঙায় গিয়েই উঠে পড়ল—কেবল একজন ছাড়া। ডাঙায় উঠে শোভন ও ডেনহাম্‌ তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দেখলে, ডাইনসরটা আবার জলের উপর মাথা তুলছে এবং তার চোয়ালের একপাশ দিয়ে এক হতভাগ্যের পা দুটো বেরিয়ে তখনও ছট্‌ফট্‌ করছে।

ডেনহাম্‌ শিউরে ব'লে উঠল, "বোমা। একটা বোমা দাও।"

একজন নাবিক বললে, "বোমা জলে তলিয়ে গেছে।"

—"বন্দুক, বন্দুক, একটা বন্দুক!"

—"তাও জলের ভেতরে।"

—"মূর্খ! তোমার নিজের বন্দুকটাও রক্ষা করতে পারোনি?"

—"আপনিও তো নিজের বন্দুকটা জলে ফেলে এসেছেন!"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ—যাক্‌ গে, আর কিছু বলতে চাই না। কিন্তু চোখের সামনে ও বেচারার প্রাণ গেল, আর আমরা কিছু করতে পারলুম না।"

শোভন বললে, "আর এখানে থাকলে এইবার আমাদেরও প্রাণ যাবে! ঐ দেখ ডাইনসরটা ডাঙার দিকেই আসছে। জলে-স্থলে ওর অবাধ গতি।"

সবাই আবার প্রাণপণে ছুটল—হ্রদের ধার ছেড়ে, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, ঢালু পাহাড়ের গা ব'য়ে।

পিছনে আর কোন শব্দ নেই শুনে সবাই আবার দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

কিন্তু ভগবান সেদিন তাদের কপালে বিশ্রাম লেখেননি। এক মিনিট জিরুতে না জিরুতে নিচের দিকে জঙ্গল ভাঙার শব্দ হ'ল।

ডেনহাম্‌ আঁৎকে উঠে বললে, "আবার সেই ডাইনসর আসছে নাকি?"

শোভন বললে, "চুপ! নিচের ঐদিকটায় চেয়ে দেখ!"

সেই গরিলা-দানব—রাজা কঙ্‌। তার ডানহাতের মুঠোয় তখনো

মালবিকা অজ্ঞান হয়ে আছে।

কী বৃহৎ তার দেহ—বড় বড় গাছের উপরেও তার মাথা জেগে আছে। অতি যত্নে মালবিকাকে নিয়ে ঢালু পাহাড়ের গা ব'য়ে সে উপরে উঠে আসছে এবং মাঝে-মাঝে মালবিকার দেহের দিকে যেন সস্নেহেই তাকিয়ে দেখছে।

আচম্বিতে পাশের জঙ্গল ভেদ ক'রে আরো দুটো বেয়াড়া, ভীষণ-দর্শন জানোয়ার কঙ্য়ের সামনে এসে পথ জুড়ে দাঁড়াল। দেখতে কতকটা গণ্ডারের মত, কিন্তু মাথায় তারা প্রায় হাতির সমান উঁচু এবং তাদের প্রত্যেকের মাথার উপরে তিন-তিনটে ক'রে ধারাল শৃঙ্গ।

ডেন্‌হাম্ চুপি চুপি সভয়ে বললে, "ও আবার কি সৃষ্টিছাড়া জীব?"

শোভন বললে, "ট্রাইশেরোটপ্! ওরাও সেকেলে পৃথিবীর জীব।"

ট্রাইশেরোটপ্‌দের দেখেই কঙ্ যেন তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠল! সে তখনি একটা উঁচু ঢিপির উপরে মালবিকার দেহকে নিরাপদ করবার জন্যে তুলে রাখলে এবং তারপর প্রকাণ্ড একখানা পাথর তুলে গর্জে উঠে সজোরে একটা ট্রাইশেরোটপের দিকে নিক্ষেপ করলে। কঙ্য়ের হাতের জোরে ও পাথরের ভারে ট্রাইশেরোটপের একটা শৃঙ্গ তখনি ভেঙে গেল!

ডেন্‌হাম্ সবিস্ময়ে বললে, "ও দানবের দেহের শক্তি স্বচক্ষে দেখেও যে বিশ্বাস হচ্ছে না। ও পাথর ছুঁড়লে না, একটা পাহাড় তুলে ছুঁড়লে? অত-বড় পাথর কোন জ্যান্ত জীব তুলতে পারে?"

এদিকে সঙ্গীর দুর্দশা দেখে দ্বিতীয় ট্রাইশেরোটপ্‌টা ভয়ে পিছিয়ে আসতে লাগল। প্রথমটাও পালাই পালাই করছে, কিন্তু তার আগেই আর-একখানা আরো-বড় প্রস্তর তুলে কঙ্ আবার তার দিকে সজোরে ছুঁড়লে।—সঙ্গে সঙ্গে সেও মাটির উপর লুটিয়ে প'ড়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল! বিজয়-গৌরবে ফুলে উঠে কঙ্ সগর্বে দুই হাতে ঘন ঘন নিজের বুক চাপড়াতে লাগল!

শোভন বললে, "আর এখানে নয়। ঐ দেখুন, দ্বিতীয় ট্রাইশেরোটপ্‌টা এদিকেই ছুটে আসছে। ওর আগেই আমাদের পালাতে হবে।"

সকলে দ্রুতপদে পলায়ন করলে। কিন্তু ট্রাইশেরোটপ্‌টা তাদের চেয়েও বেশি তাড়াতাড়ি ছুটে আসছিল—সে তাদের দেখতে পেলে এবং এরা আর-একদল নূতন শত্রু ভেবে ভীষণ আক্রোশে তাদের আক্রমণ করলে।

সকলের পিছনে ছিল যে বেচারা, সে ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা গাছের উপরে চড়তে লাগল কিন্তু ট্রাইশেরোটপের মাথার এক আঘাতে গাছটা মড়্‌ মড়্‌ ক'রে ভেঙে পড়ল।

তারপরেই বুক-ফাটা এক আর্তনাদ এবং তারপরেই ট্রাইশেরোটপের নিষ্ঠুর শৃঙ্গ আর-একজন অসহায় মানুষের কণ্ঠ চিরকালের জন্যে নীরব ক'রে দিলে।

আট

মানুষ-পোকা

সকলে একান্ত শ্রান্তভাবে টল্‌তে টল্‌তে একটা বড় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ব'সে পড়ল।

মানুষের শরীরে আর কত সয়? সাহস ও বীরত্বেরও একটা সীমা আছে। এই খানিক আগেই যারা বলেছিল, 'আমরা মরতে ভয় পাই না' এখন তারাই আর সে কথা বলতে পারবে কিনা সন্দেহ। বেলা ডোবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্ত আশা ফুরিয়ে গিয়েছে। তারা এতক্ষণে বুঝলে, যেখানে পদে পদে এমন সব মারাত্মক বিপদ, সেখানে নিরস্ত্র ক্ষুদ্র মানুষ কোন কাজই করতে পারবে না।

তখনো হাল ছাড়েনি খালি শোভন ও ডেন্‌হাম্‌।

ডেন্‌হাম্‌ বললে, "মিঃ সেন, আমার এক প্রস্তাব আছে। আমার বিশ্বাস, খালি-হাতে ঐ দানবের কাছ থেকে মিস্‌ সেনকে আমরা

কথনোই উদ্ধার করতে পারব না। তার চেয়ে আর এক কাজ করলে কেমন হয়?"

—"কি কাজ?"

—"আমাদের একজন এখানে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ গরিলা-দানবের গতিবিধির উপরে দৃষ্টি রাখুক। দলের বাকি লোকের কোনরকমে ফিরে গিয়ে আবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আস্থক।"

—"এ পরামর্শ মন্দ নয়। আপনারা ফিরে যান, আমি এখানে থেকে ঐ দানবের উপরে পাহারা দি।"

—"কিন্তু ঐ দেখুন মিঃ সেন, দানবটা আবার এই দিকেই আসছে। ও কি আমাদের দেখতে পেয়েছে?"

মালবিকার অচেতন দেহ সেইভাবে করতলে নিয়ে কঙ্ আবার এই দিকেই আসছে বটে। কিন্তু তার ভাব দেখে মনে হয় না, সে সন্দেহজনক কিছু দেখছে। কারণ, সে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

খানিকটা এগিয়ে এসেই সে আবার থেমে দাঁড়াল একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখে নিলে। তারপর পাহাড়ের গা ব'য়ে একদিকে নামতে লাগল।

অত্যন্ত সন্তর্পণে সবাই উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, অল্প নিচেই আর-একটা পাহাড়ে' নদী ব'য়ে যাচ্ছে সেই নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত রয়েছে সুদীর্ঘ একটা গাছের গুঁড়ি। হয়তো কবে কোন্ ঝড়ে প'ড়ে গিয়ে গাছটা এই স্বাভাবিক সেতুর সৃষ্টি করেছে।

কঙ্ সেই সেতু পার হয়ে ওপারের জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শোভন বললে, "আমিও সেতু পার হয়ে ওর পিছনে পিছনে চললুম। আপনারা ফিরে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আস্থন। আমি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব।" এই ব'লে সেও পাহাড়ের গা ব'য়ে সেতুর দিকে নামতে লাগল।

নামতে নামতে সে দেখলে, সেতুর প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচে, নদীর

তীরে তীরে শত শত অজানা ও ভয়ানক জীব বিচরণ করছে। কোনটা মাকড়সার মত দেখতে, কিন্তু আকারে বড়-জাতের কচ্ছপকেও হার মানায়। কোন কোন জীব অনেকগুলো শুঁড় নেড়ে বেড়াচ্ছে, অক্টোপাসের মত। কোন কোনটা গিরগিটির মত—কিন্তু কুমীরের মত মস্ত গিরগিটি। তারা সবাই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। শোভন শিউরে উঠে ভাবলে, নরকও বোধ করি এই দ্বীপের চেয়ে ভয়ানক নয়।

এদিকে ডেন্‌হাম্‌ও তার দলবল নিয়ে উঠে দাঁড়াল। অস্ত্র হাতে নিয়েও মানুষ এখানে নিরাপদ নয়, এখন আবার সকলকে নিরস্ত্র অবস্থায় এই সুদীর্ঘ পথ পার হ'তে হবে। হয়তো ফেরবার পথে আরো কত লোকের প্রাণ নষ্ট হবে। সেই বিষম হ্রদ! তার জলের তলা দিয়ে ক্ষুধার্ত সব কালো ছায়া আনাগোনা করে—মানুষ সেখানে অসহায় কীট মাত্র, তার জীবনের কোন মূল্যই নেই!

সকলে অত্যন্ত নাচারের মত অগ্রসর হ'তে লাগল—সকলেই বোবা ও বিমর্ষ, জাহাজে ফিরে যাবার জন্যেও কারুর মনে কিছুমাত্র উৎসাহ নেই।

কিন্তু সর্বনাশ! সেই শয়তান ট্রাইশেরোটপ্‌ তখনো যে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে! সাম্‌নে এতগুলো মানুষকে দেখেই প্রবল পরাক্রমে সে আবার তিনটে শিং নেড়ে তেড়ে এল।

ডেন্‌হাম্‌ বললে, "নদীর ধারে—নদীর ধারে চল! সাঁকোর মত সেই গাছের ওপরে।

সকলে উর্ধ্বশ্বাসে সেই পাহাড়ে' নদীর তীরে,—সাঁকোর সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।

শোভন ততক্ষণে ওপারে গিয়ে হাজির হয়েছে। পিছনে গোলমাল শুনে ফিরে দাঁড়িয়েই দেখলে, তার সঙ্গীরাও সাঁকোর উপরে ছুটে আসছে এবং তাদের পিছনে পিছনে আসছে মূর্তিমান বিভীষিকার মত সেই ট্রাইশেরোটপ্‌! ব্যাপারটা বুঝতে তার দেরি লাগল না।

এদিকে উপর থেকে কার এক বিপুল ছায়া তার গায়ের উপর এসে পড়ল।

মাথা তুলতেই নজরে পড়ল, কঙ্‌য়ের প্রচণ্ড মুখ পাহাড়ের পাশ থেকে উঁকি মারছে। পর-মুহূর্তেই কঙ্‌য়ের মুখ আবার অদৃশ্য হয়ে গেল —শোভন বুঝলে, কঙ্‌ তাদের আক্রমণ করতে আসছে।

সে চিৎকার ক'রে বললে, "পালাও—পালাও—মাথার ওপরে সাক্ষাৎ যম!"

দেখা দেল, আবার পাহাড়ের গা ব'য়ে কঙ্‌ লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে।

শোভন হেঁট হয়ে দেখলে, নদীর ধার থেকে পাহাড়ের যে-অংশটা খাড়া উপরে উঠেছে, তার ভিতরে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গুহার মতন রয়েছে অনেকগুলো গর্ত। পাহাড়ের উপর থেকে অগুন্তি আঙুর-লতা সেই সব গর্তের মুখ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। আঙুর-লতা যে কি-রকম শক্ত, শোভনের সেটা অজানা ছিল না। সে চট্‌ ক'রে একটা আঙুর-লতা ধ'রে ঝুলে পড়ল এবং একটা গুহার ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

ডেন্‌হাম্‌ও তখন সাঁকো পেরিয়ে নদীর এপারে এসে প'ড়েছিল, শোভনের দেখাদেখি সেও আর-একটা আঙুর-লতাকে অবলম্বন ক'রে আর-একটা গুহায় গিয়ে ঢুকল।

কঙ্‌ সাঁকোর মুখে এসে হাজির হ'ল। যে নারকীয় দেশে সে বাস করে, সেখানকার মূলমন্ত্র হচ্ছে—'হয় মারো, নয় মরো।' হিংসাই সেখানকার ধর্ম। প্রত্যেক জীবই সেখানে অন্য জীবকে হিংসা করে। কাজেই জীবিত যা-কিছু, কঙ্‌ তাকেই শত্রু ব'লে ভাবে—তা সে আকারে ছোটই হোক্‌ আর বড়ই হোক্‌!

এতগুলো মানুষ-পোকাকে দেখে তাই কঙ্‌য়ের আজ রাগের সীমা নেই। একটা বজ্র-দগ্ধ চুড়ো-ভাঙা গাছের গুঁড়ির উপরে মালবিকার জ্ঞানহারা দেহকে সকলের নাগালের বাইরে রেখে, কঙ্‌ সশব্দে তার বুক চাপ্‌ড়াতে লাগল—যেন সে সবাইকে যুদ্ধে আহ্বান করছে!

কঙ্‌য়ের কাছে পোকার মতই ক্ষুদে ক্ষুদে সেই মানুষগুলো তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে কি, উভয়-সঙ্কটে প'ড়ে তাদের অবস্থা তখন অত্যন্ত কাহিল

হয়ে পড়েছে। সাঁকোর এদিকে দাঁড়িয়ে কঙ্ করছে 'যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি' সাঁকোর ওদিকে দাঁড়িয়ে তিন তিনটে। শং উঁচিয়ে তড়্পাচ্ছে সেই বিশ্রী ট্রাইশেরোটপ্! তুচ্ছ এক গাছের গুঁড়ির সাঁকো, তার উপরে আঠারো জন অসহায় মানুষ—একবার পা ফস্কালেই আর রক্ষা নেই।

কঙ্ গাছের গুঁড়িটা ধরে একবার একটা ঝাঁকানি দিয়ে দেখলে। মানুষগুলো অমনি গুঁড়ি জড়িয়ে ধ'রে আর্তনাদ ক'রে উঠল শুনে কঙ্ নিজের ভাষায় কচর্ কচর্ ক'রে কি যেন বলতে লাগল।

শোভন গুহা থেকে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বললে, "হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার!"

কঙ্ শোভনকে দেখে তার দিকেই দু'পা এগিয়ে এল—কিন্তু তার-পরেই কী ভেবে আবার সাঁকোর মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

ডেন্হাম্ নিজের গুহার ভিতর থেকে একখানা বড় পাথর দু'হাতে তুলে কঙ্কে সজোরে ছুঁড়ে মারলে। সে পাথরখানা কোন মানুষের উপরে গিয়ে পড়লে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটত; কিন্তু তার আঘাত কঙ্ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না! সে দুই হাতে কাঠের গুঁড়ির একমুখ তুলে ধ'রে ক্রমাগত ডাইনে-বাঁয়ে নাড়া দিতে লাগল।

দুইজন হতভাগ্য লোক গাছের গুঁড়ি থেকে ফসকে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে নিচে প'ড়ে গেল। সেখানে নদীর জল ছিল না। প্রথম লোকটা নিচে প'ড়ে একটুও নড়ল না। কিন্তু সে পড়বামাত্রই কুমীরের মত মস্ত একটা গিরগিটি এসে তার দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় লোকটা পড়ল নিচের দিকে পা ক'রে—তার কোমর পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেল। হয়তো সে বেঁচে যেত, কিন্তু সে যখন কাদা থেকে ওঠবার চেষ্টা করছে, তখন কোথা থেকে দলে দলে প্রকাণ্ড কাছিমের মত মাকড়্সা এসে তাকে আক্রমণ করলে। সে পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল এবং সেই হিংস্র মাকড়্সাগুলো তার গা থেকে ডুমো ডুমো মাংস খুব্লে খেতে লাগল।

কঙ্ আবার গুঁড়ি ধ'রে নাড়া দিলে, আবার কয়েকজন লোক নিচে গিয়ে পড়ল। আবার গুঁড়ি ধরে নাড়া, আবার মনুষ্য-বৃষ্টি।

আর একজন মাত্র মানুষ সাঁকোর উপরে আছে। সে এমন প্রাণপণে গুঁড়িটা জড়িয়ে রইল যে, কঙ্ অনেক নাড়া দিয়েও তাকে স্থানচ্যুত করতে পারলে না। তখন সে একটানে গুঁড়িশুদ্ধ মানুষকে শূন্যে তুলে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করলে। নদীগর্ভ তখন হরেক-রকম বীভৎস জানোয়ারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে; আসন্ন ভোজের সম্ভাবনায় তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়তে লাগল এবং আহত মানুষদের মর্মান্তিক আর্তনাদে আকাশ, বাতাস, পর্বত ও অরণ্য ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

নিজের গুহায় নিরুপায় হয়ে ব'সে মহা আতঙ্কে ও স্তম্ভিত নেত্রে শোভন এইসব হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে হয়তো মানুষের গন্ধ পেয়েই এক বিরাট মাকড়্সা দ্রাক্ষালতা বেয়ে কখন যে উপরে উঠতে শুরু করেছে, শোভন প্রথমটা তা টের পায়নি। যখন দেখতে পেলে, মাকড়্সাটা তখন প্রায় গুহার মুখে এসে পড়েছে—দুটো ক্ষুধার্ত ড্যাব্‌ডেবে ভীষণ চক্ষু শোভনের দিকে তাকিয়ে আছে! শোভন তাড়াতাড়ি ছোরাখানা বার করলে—এই ছোরাখানাই তখন তার একমাত্র সহায়। সে ছোরার আঘাতে দ্রাক্ষালতা কেটে দিলে—লতাশুদ্ধ মাকড়্সাটা নিচে প'ড়ে গেল।

ডেন্‌হামের চিৎকার শোনা গেল—"মিঃ সেন! মিঃ সেন!"

আবার কি ব্যাপার, দেখবার জন্যে শোভন গুহার ভিতর থেকে মুখ বাড়ালে। একখানা লোমশ, কৃষ্ণবর্ণ গাছের গুঁড়ির মতন প্রকাণ্ড বাহু পাহাড়ের উপর থেকে গুহার দিকে নেমে আসছে। পাহাড়ের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে কঙ্ তাকে ধরবার চেষ্টা করেছে। শোভন সাঁৎ ক'রে গুহার ভিতরে স'রে গেল। তারপর হাতখানা যেই গুহার মুখে এল, শোভন অমনি তার উপরে বসিয়ে দিলে ছোরার এক ঘা। হাঁউ-মাউ ক'রে চেঁচিয়ে কঙ্ তখনি হাত সরিয়ে নিলে। নিজের রক্তমাখা হাতের দিকে তাকিয়ে সে সবিস্ময়ে ভাবতে লাগল—'মানুষ-পোকাগুলো তাহ'লে কামড়াতেও জানে!' ওদিকের গুহা থেকে ডেন্‌হাম্ একখানা বড় পাথর ছুঁড়লে,—পাথরখানা সিধে এসে ঠক্ ক'রে তার নাকের

ডগায় লাগল। চোট্ খেয়ে কঙ্ আরো চ'টে গেল—"অ্যাঃ, আমার নাকের ডগায় পাথর ছুঁড়ে মারা! রোস্ তো, মজাটা দেখাচ্ছি তবে!" বোধহয় এইরকম একটা-কিছু ভেবেই কঙ্ আবার পাহাড়ের ধারে ঝুঁকে প'ড়ে গুহার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে শোভনকে খুঁজতে লাগল—ছেলেরা যেমন ক'রে দেওয়ালের গর্তে হাত ঢুকিয়ে পাখির বাচ্চা খোঁজে। শোভন আড়ষ্ট হয়ে সেই গুহার পিছনের দেয়ালে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নয়

কুমীর-কাঙ্গারু

বাজ-পোড়া গাছের উপরে এতক্ষণ পরে মালবিকার জ্ঞান ফিরে এল।

প্রথমটা কিছুই তার মনে পড়ল না। একবার এপাশ, আর একবার ওপাশ ক'রে ব্যথা বোধ হ'ল—আবার চিৎ হয়ে দেখলে, উপরে রোদের সোনার জলে ধোয়া নীল আকাশ।

পিঠে কেন লাগে? কোথায় সে? ধড়্-মড়্ ক'রে উঠে ব'সে দেখে, চারিদিকে পাহাড়, বন, নদী। এখানে সে কেমন ক'রে এল?

আচম্বিতে তার মনের মধ্যে জেগে উঠল, অসভ্যদের ঢাক-ঢোলের আওয়াজ, গরিলারূপে নর্তকদের নাচ্ হাজার হাজার মশালের আলো, আকাশ-ছোঁয়া পাঁচিলের প্রকাণ্ড ফটক, প্রান্তরের দুই থামওয়ালা পাথরের বেদী, সহস্র কণ্ঠের চিৎকার—এবং তারপর, সেই বিভীষণ গরিলা-দানব—রাজা কঙ্! তখন তার সকল কথা মনে পড়ল।

খানিক তফাতেই দেখলে, পাহাড়ের ধারে ব'সে কঙ্ নিচের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে কি করছে! তাহ'লে এখনো সে তাকে ছাড়েনি। এই উঁচু গাছের গুঁড়ির উপরে এখনো সে কঙ্য়েরই বন্দিনী?

আর একটা ভয়ানক ও কী জীব এদিকে আসছে? একি স্বপ্ন? একি

সত্য? এমন জীব কি তুনিয়ায় থাকতে পারে? আকারে এ কঙ্‌য়েরই মতন বিরাট, কিন্তু এর চেহারা যে কঙ্‌য়েরও চেয়ে ভয়ঙ্কর! মাথায় পাঁচ-ছয়তলা বাড়ির চেয়েও উঁচু, যেন একটা বিশালদেহ কুমীর-কাঙ্গারুর মতন পিছনের তুই পায়ে ভর দিয়ে লাফাতে লাফাতে আসছে।

মূর্তিটা আরো কাছে এলে পর মালবিকা দেখলে, তার সামনেও তুটো পা আছে বটে, কিন্তু সে পা তুটো এত পল্‌কা যে, মুখে খাবার তুলে খাওয়া ছাড়া তার দ্বারা বোধহয় আর কোন কাজ করাই চলে না। কিন্তু তার মুখ! কী ভীষণ, কী বীভৎস সে মুখ, দেখলেই যেন আর জ্ঞান থাকে না।

মূর্তিটা ক্ষুধিত ভাবে রক্তরাঙা চক্ষে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ মালবিকা তার নজরে প'ড়ে গেল। আর কোথায় যায়? পৃথিবী কাঁপানো এক হুঙ্কার দিয়ে মালবিকার দিকে সে মস্ত এক লাফ মারলে। মালবিকাও মহা ভয়ে আর্তনাদ ক'রে তুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললে।

সেই হুঙ্কার আর এই আর্তনাদ কঙ্‌য়ের কানে গেল—বিত্যুতের মতন ফিরেই সে সেই নরখাদক জীবটাকে দেখতে পেলে। গুহার ভিতরকার তুচ্ছ মানুষ-পোকার কথা ভুলে তখনি সে উঠে দাঁড়াল এবং বিষম আক্রোশে তুই হাতে বুক চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে ঝড়ের মতন বেগে ধেয়ে এসে সেই ভয়াবহ দানবকে অকুতোভয়ে আক্রমণ করলে!

দানবটার গজালের মতন বড় বড় দাঁতে যেন আগুন খেলে গেল—মস্ত এক হাঁ ক'রে সে কঙ্‌কে কামড়ে দিতে এল—তারপরেই পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে তুই বিরাট দেহই 'পপাত ধরণীতলে' হ'ল। কঙ্‌ পড়ল তার উপরদিকে। প্রথমটা মনে হ'ল, এই দানবটাকে কায়দায় আনতে কঙ্‌য়ের বেশি সময় লাগবে না,—কিন্তু ভুল। সেও বড় সামান্য রাক্ষসে জীব নয়! কঙ্‌ তুই হাতে তার গলা টিপে ধরেছিল বটে, কিন্তু তার পিছনের বিষম মোটা বলবান পা তুটো দিয়ে সে শত্রুর বুকে এমন প্রচণ্ড লাথি মারলে যে, অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হয়েও কঙ্‌ কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলে না—বেজায় একটা ডিগ্‌বাজি খেয়ে সে

বহুদূরে ছিট্‌কে নিচে নদীর গর্ভে প'ড়ে যায় আর কি।

অতি উৎকণ্ঠার সঙ্গে মালবিকা ব'লে উঠল—"না, না, না!"

মালবিকা চায়, কঙ্ জয়লাভ করুক। কঙ্ বড় কম-ভয়ানক নয়, তার হাতে বন্দিনী হওয়াও মরণেরই সামিল,—কিন্তু এই ভুতুড়ে দানবের মুখ-গহ্বরে যাওয়ার চেয়ে কঙ্‌য়ের কবলগত হওয়া অনেক ভালো।

কঙ্ কোনরকমে সে যাত্রা বেঁচে গিয়ে আবার উঠে দানবটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জনের চিৎকারে পাহাড়ের পাথরও যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। দানব আবার তার সাংঘাতিক পা ছুঁড়লে—কঙ্ আবার দূরে ছিট্‌কে গিয়ে ভূতলশায়ী হ'ল।

কঙ্ আবার উঠে দাঁড়াল। সে আর গর্জনও করলে না, বুকও চাপ্‌ড়ালে না। বোধহয় সে বুঝলে, এ রকম বলিষ্ঠ ও প্রচণ্ড শত্রুকে চেঁচিয়ে বা বুক চাপ্‌ড়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করা মিথ্যা। এবারে সে খুব সাবধানে এগিয়ে এল এবং তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে একটা ফাঁক খোঁজবার চেষ্টা করতে লাগল। এমন সব শত্রু তার কাছে নতুন নয়। এদের কাবু করবার ফিকির সে জানে।

কঙ্ হঠাৎ এক লাফে দানবের সুমুখে এল এবং তার উপরকার একখানা পা ধ'রে একেবারে ভেঙে মুচড়ে দিলে! দানবটাও তার কাঁধ কামড়ে ধরলে—কঙ্‌ও আবার তফাতে স'রে গেল!

কঙ্ আবার এল—আবার এক লাফে দানবের গলা চেপে ধরলে—আবার দুইজনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—এবং দানবটা আবার তাকে লাথি মারলে।

কিন্তু এবারের লাথিতে আর আগেকার জোর ছিল না—তাই লাথি খেয়ে মাটিতে পড়বার আগেই কঙ্ যা চাচ্ছিল সেই সুযোগটা পেলে,—সে দানবের পিছনের একখানা পা খপ্ ক'রে ধ'রে ফেললে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক মোচড় দিতেই দানবটা একেবারে হুড়্‌মুড়িয়ে মাটির উপরে লম্বা হয়ে পড়ল! চোখের পলক ফেল্‌বার আগেই কঙ্ একেবারে তার পিঠে চ'ড়ে বসল এবং নিজের দুই পায়ে তার কাঁধ চেপে ধ'রে দুই হাতে

তার দুই চোয়াল বাগিয়ে ধ'রে প্রাণপণ শক্তিতে দিলে এক বিষম হ্যাঁচ্‌কা-টান। কী হাতের জোর কঙ্‌য়ের! দানবের সেই বৃহৎ চোয়াল চড়্ চড়্ ক'রে চিরে গেল! সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে কঙ্ আবার দাঁড়িয়ে উঠল! দানবটা মৃত্যু-যন্ত্রণায় পাক্‌সাট্ খেতে খেতে যতই ছট্‌ফট্ করে, বিজয়-উল্লাসে অধীর হয়ে কঙ্ তত হুঙ্কার দিয়ে ওঠে! তারপর দানবটার দেহ যখন একেবারে স্থির ও আড়ষ্ট হয়ে গেল, কঙ্ তখন খুব খুশি হয়ে কচর্ কচর্ ক'রে নিজের ভাষায় কি বল্‌তে বল্‌তে বারংবার মালবিকার পানে তাকাতে লাগল,—যেন সে তার মুখে নিজের বীরত্বের জন্যে দু-চারটে বাহবা শুনতে চায়!

কিন্তু মালবিকার তখন কোন শক্তিই ছিল না—বিপুল উত্তেজনায় আবার তার জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কঙ্ অত্যন্ত যত্ন ও মমতার সঙ্গে তার দেহকে তুলে নিলে।

এই বিশ্রী জানোয়ারটা নোংরা হাতে আবার তার ভগ্নীর দেহ স্পর্শ করছে দেখে, শোভন রাগে যেন ক্ষেপে গেল! সে গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করলে। কিন্তু তারপরে এই ভেবে আত্মসংবরণ করলে যে, কঙ্‌কে বাধা দেবার মিছে চেষ্টা ক'রে যেচে নিজের মরণকে ডেকে এনে লাভ কি? তাতে তো মালবিকা মুক্তি পাবে না। তার পক্ষে এখন একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, লুকিয়ে কঙ্‌য়ের পিছনে পিছনে থাকা। তাহ'লেই যথাসময়ে ডেন্‌হাম্ লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফিরে এলে মালবিকাকে উদ্ধার করা খুবই সহজ হবে।

ওদিকে কঙ্‌য়ের ব্যবহার দেখে বেশ বোঝা গেল যে, গুহার ভিতরকার দুষ্ট-মানুষ-পোকার কথা তার আর কিছুই মনে নেই! সে পুতুলের মতন মালবিকাকে নিজের হাতের চেটোয় নিয়ে আবার পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শোভন ও ডেন্‌হাম্ তখন নিশ্চিন্ত হয়ে গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে দ্রাক্ষালতা বেয়ে পাহাড়ের উপরে উঠল।

শোভন বললে, "পোল ত আর নেই! আপনি ওপারে যাবেন কেমন

ক'রে ?"

ডেন্‌হাম্ বললে, "যেমন ক'রে হোক্, নদী পার হবই। কিন্তু মিঃ সেন, এই নরকে আপনাকে একলা ফেলে যেতে আমার মন সরছে না।"

শোভন বললে, "আমার সঙ্গে থেকেই বা আপনি কি করবেন? খালি হাতে আমরা দু'জনে কিন্তু কঙ্‌য়ের সঙ্গে লড়তে পারব না। বন্দুক চাই, বোমা চাই, লোকবল চাই। আপনি তাই আনতে যান। কঙ্‌য়ের পিছনে কোন্ দিকে আমি গেছি, পথে সে চিহ্ন রেখে যাব।"

ডেন্‌হাম্ বললে, "হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বেশ, তাই হোক্।"

শোভন বললে, "আর এখানে সময় নষ্ট করলে কঙ্‌কে হয়তো শেষটা হারিয়ে ফেলব। বিদায় বন্ধু, বিদায়!"

—"বিদায়! ভগবান আপনাকে সাহায্য করুন।"

দূরে বনের ভিতরে মড়্ মড়্ ক'রে গাছ-ভাঙার শব্দ হচ্ছে। কঙ্ তার পথ সাফ করতে করতে বাসায় ফিরে চলছে। বাজ-পোড়া গাছের পাশে দানবটার বিশাল দেহ প'ড়ে রয়েছে। মরা জন্তুর মাংসের গন্ধ যে নিচে নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছেছে, সেই প্রমাণ দেবার জন্যে দলে দলে কাছিমের মত বড় মাকড়্সা ও কুমীরের মত বড় গির্‌গিটি এবং আরো সব কত বিট্‌কেল জন্তু দানবের সেই আড়ষ্ট দেহের দিকে এগিয়ে আসছে।

শোভন শিউরে উঠে কঙ্‌য়ের সন্ধানে ছুটল।

দশ

জলচর অজগর

কঙ্ কোন্ দিকে গেছে, তা খোঁজবার জন্যে শোভনকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। কোথাও ধুলোর উপরে প্রকাণ্ড পায়ের দাগ, কোথাও-বা গাছের ভাঙা ডাল প'ড়ে রয়েছে ;—সেই-সব চিহ্ন দেখে সে অনায়াসেই ঠিক পথে এগিয়ে চলল। সমস্ত শত্রু বধ ক'রে কঙ্‌ও এখন নিশ্চিন্ত হয়েছিল, তাই এখন সে পরম আরামে ধীরে ধীরে হেল্‌তে হেল্‌তে দুল্‌তে দুল্‌তে অগ্রসর হচ্ছিল,—কাজেই শোভন শীঘ্রই তার নাগাল ধরে ফেললে। কিন্তু সে খুব সাবধানে লুকিয়ে লুকিয়ে পথ চলতে লাগল,—কেননা একবার কঙ্‌য়ের চোখে প'ড়ে গেলে তার যে কি দুর্দশা-টাই হবে, সেটা সে ভালো ক'রেই জানে। পথের উপরে নানা আকারের আরো-সব পায়ের দাগ দেখে এও সে বুঝতে পারলে যে, এখান দিয়ে কঙ্‌য়ের মত প্রকাণ্ড বহু রাক্ষুসে জীবই আনাগোনা ক'রে থাকে, তারাও তাকে দেখতে পেলে জামাই-আদর করবে না। এখানে পদে পদে বিপদ, একটু অন্যমনস্ক হ'লেই প্রাণটা বাজে-খরচ হ'তে বিলম্ব হবে না।

মাঝে মাঝে ভরসা ক'রে দু' পা বেশি এগিয়ে সে উঁকি মেরে দেখে নিচ্ছে মালবিকার অবস্থাটা। কিন্তু কঙ্‌য়ের হাতের চেটোয় সে বরাবর ঠিক এক ভাবেই স্থির হয়ে প'ড়ে রয়েছে—বোধহয় এখনো তার মূর্ছা ভাঙেনি।

জঙ্গল ক্রমেই পাৎলা হয়ে আসছে—ঝোপঝাপ, লতাপাতা আর বড় দেখা যায় না। খানিক তফাতে তফাতে বড় গাছগুলো কেবল দাঁড়িয়ে রয়েছে!

পাহাড়ের ঢালু গা ক্রমেই উপরে উঠে গিয়েছে—শোভনের চোখের

সুমুখে এখন স্পষ্ট জেগে উঠল মড়ার মাথার খুলির মত সেই পাহাড়টার ন্যাড়া শিখর। কঙ্ সেই দিকেই যাচ্ছে।

শোভন বুঝলে, এই-সব উঁচু শিখরের উপরেই কঙ্য়ের বাসা আছে। এখানে গাছপালা ঝোপঝাপ জঙ্গল নেই। কাজেই এখানকার সাংঘাতিক জীবজন্তুরা খুব-সম্ভব এদিকে বড়-একটা বেড়াতে বা শিকার খুঁজতে আসে না এবং কখনো-সখনো এলেও কঙ্য়ের তীক্ষ্ণ চোখের সামনে সহজেই তাদের ধরা পড়বার সম্ভাবনা! এই-সব বুঝে-সুঝেই বুদ্ধিমান কঙ্ হয়তো এখানে তার আস্তানা গেড়ে বসেছে!

শোভনের শরীর আর তার মনের বশে থাকতে চাইছে না। এখন বৈকাল। আজ খুব-ভোর থেকেই তার শরীরের উপর দিয়ে যে-সব ধাক্কা চ'লে যাচ্ছে, অন্য কেউ হ'লে এতক্ষণ হয়তো এ-সব সহ্য করতে পারত না। অন্য কেউ কেন, অন্য সময়ে সে নিজেই কি এতটা সইতে পারত; কেবল তার আদরের বোনের মায়া-মাখা মুখখানিই এতক্ষণ তাকে দু'-পায়ের উপরে সোজা দাঁড় ক'রয়ে রেখেছে! তার বোনের জন্যে আজ কত বিদেশী পর হয়েও প্রাণ দিলে, হয়তো আবার আরো কত লোক প্রাণ দিতে আসছে! আর রক্তের টান ভুলে এখন কি সে অমানুষের মত বিশ্রাম করতে পারে? নিজের শরীরকে নিজে নিজেই ধমক দিয়ে সে ফের চাঙ্গা ক'রে তুললে—দ্বিগুণ উৎসাহে বেগে কয় পা এগিয়েই সে আবার চম্‌কে ও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল—কী সর্বনাশ, তার খুব কাছেই ঐ যে কঙ্! অতিরিক্ত উৎসাহকে দমন ক'রে আবার সে পিছিয়ে এল।

এমন সময়ে একটি দৃশ্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। পাহাড়ের উপর মস্ত-বড় একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে এবং তার ভিতর দিয়ে হুড় হুড় ক'রে জল বেরিয়ে আসছে! পাহাড়ের গর্ভে নদী! শোভন মুখ ফিরিয়ে দেখলে, ঢালু পাহাড়ের গা ব'য়ে খানিক দূর গিয়ে নদীর জলধারা একটা জঙ্গলের কাছে মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।……এই দৃশ্য দেখে তখন আর কোন কথা মনে হ'ল না বটে, কিন্তু খানিক পরেই সে এক অদ্ভুত আবিষ্কার করলে!

ধীরে ধীরে সে ক্রমেই উপরে উঠছে। তারপর, সূর্যের শেষ আলোক-রেখা যখন আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাই যাই হয়েছে, কঙ্ তখন পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরের তলায় এসে দাঁড়াল। সেখানে পাহাড়ের গা ঢালু হয়ে চারিদিক থেকে খানিকটা নেমে গিয়েছে—মাঝখানে খানিকটা সমতল জায়গা—ঠিক যেমন সার্কাসের গ্যালারির মাঝখানে থাকে খেলা দেখাবার খোলা জমি।

সেই সমতল জায়গাটার একপাশে রয়েছে পুকুরের মত একটা জলাশয়। সেই পুকুরের দিকে কঙ্ সন্দেহপূর্ণ নেত্রে তাকিয়ে খানিকক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কী দেখছে কঙ্? পুকুরের কালো জল তো স্থির হয়ে আছে—ওখানে জীবনের কোনো লক্ষণই নেই। খানিকক্ষণ জলের দিকে তাকিয়ে থেকে কঙ্ আবার এগিয়ে গেল। পুকুরের উপরেই খাড়া-পাহাড়, এবং জল থেকে বিশ-পঁচিশ ফুট উপরেই সেই খাড়া-পাহাড়ের গায়ে একটা বড় গুহা।

কঙ্য়ের দেখাদেখি শোভনও পুকুরের দিকে তাকিয়ে রইল। অল্পক্ষণ পরে সে লক্ষ্য করলে, পুকুরের যেদিকে খাড়া-পাহাড় নেই, কেবল সেই-দিকে জল যেন চক্রাকারে ঘুরছে। এর মানে কি? তবে কি পুকুরের তলায় জল বেরুবার কোন পথ আছে?

ধাঁ ক'রে শোভনের মনে প'ড়ে গেল সেই সুড়ঙ্গ-নদীর কথা! পুকুরের জল যেদিকে ঘুরছে, সেইদিকেই খানিক আগে সে যে সেই সুড়ঙ্গ নদী দেখে এসেছে! এ এক মস্ত আবিষ্কার!

শোভন ভাবতে লাগল, আজ সকালে প্রান্তরের কাছে সে প্রথম যে নদী দেখেছে, তারপর থেকে সারা পথেই জমি ধীরে ধীরে ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠেছে। এই পাহাড়ের শিখরের কাছে এসে চড়াই শেষ হয়েছে।

এই পাহাড়ে' পুকুরের জল যখন এক জায়গায় চক্রাকারে ঘুরছে, তখন পুকুরের নিচে নিশ্চয়ই জল বেরুবার একটা পথ আছে। সে পথ কোথায় গেছে? নিশ্চয়ই খানিক-আগে দেখা সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে!

এবং জল যখন বেরুচ্ছে, অথচ পুকুর শুকিয়ে যাচ্ছে না, তখন জলের যোগান আসছে কোথা থেকে ? পাতাল থেকে ? নিশ্চয়ই পুকুরের তলায় গুপ্ত উৎস আছে—পাহাড়ের উপরকার অধিকাংশ সরোবর বা হ্রদের তলাতেই যা থাকে।

প্রান্তরের কাছে সেই যে নদী, এই পাহাড়ের শিখরেই তার উৎস। পাহাড়ের গা ক্রমেই ঢালু হয়ে যখন প্রান্তরের প্রায় কাছে গিয়ে নেমেছে, তখন জলের ধারাও এঁকে-বেঁকে ভীষণ ডাইনসরের হ্রদ হয়ে নিশ্চয়ই একেবারে সেই প্রান্তরের নদীর ভিতর দিয়েই ব'য়ে গেছে। শোভনের এই অদ্ভুত আবিষ্কারের কি আশ্চর্য ফল হয় একটু পরেই সেটা ভালো ক'রে বোঝা যাবে। তার হিসাব খুব ঠিক। কেউ একটা ছোট নৈবেদ্যের আকারে মাটির পাহাড় বানিয়ে তার মাথায় জল ঢেলে পরীক্ষা করলেই দেখবে, সে জল একেবারে নিচে না গিয়ে পারবে না।

ওদিকে কঙ্ তখনো কেন যে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পুকুরের পানে তাকিয়ে আছে, শোভন তার কারণ বুঝতে পারলে না। সে-ও বারকয়েক তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে পুকুরের দিকে তাকাতে লাগল। একটু পরেই সে-রহস্যও স্পষ্ট হ'ল। পুকুরের কালো জলের তলায় আরো বেশি কালো কি-একটা যেন এঁকে-বেঁকে উপরে উঠে আসছে। মোষের পেটের মতন মোটা একটা অজগর সাপ। কঙ্য়ের সাবধানী চোখ আগেই তাকে দেখে ফেলেছে এবং সে-ও কঙ্‌কে দেখেছে। সে ভয়ানক সাপটা যে কত লম্বা, ভগবানই তা জানেন—কিন্তু সে যখন জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে কঙ্‌কে তেড়ে এল, তখনো তার দেহের নিচের দিকটা জলের ভিতরেই রইল।

ক্রুদ্ধ কঙ্ টপ্ ক'রে এক হাত বাড়িয়ে পুকুরের উপরকার খাড়া-পাহাড়ের গুহার ভিতরে মালবিকার দেহকে রেখে দিলে, তারপর মহা-গর্জন ক'রে প্রতি-আক্রমণ করলে। তারপর সে কী ঝটাপটি। অজগরটা পাকে পাকে কঙ্য়ের সর্বাঙ্গকে নাগপাশে বেঁধে ফেললে, তারপর চেষ্টা করতে লাগল তাকে পুকুরের কালো জলে টেনে আনবার জন্যে। কঙ্ এবার খালি তার বজ্র-বাহু দিয়ে নয়, তার বড় বড় ধারালো দাঁত দিয়েও

লড়ছে। সেই রুদ্রমূর্তি কুমীর দানব যা পারেনি, এই আশ্চর্য জলচর অজগর সেই অসাধ্যই সাধন করলে—নাগপাশের বাঁধনে কঙ্‌য়ের দুই
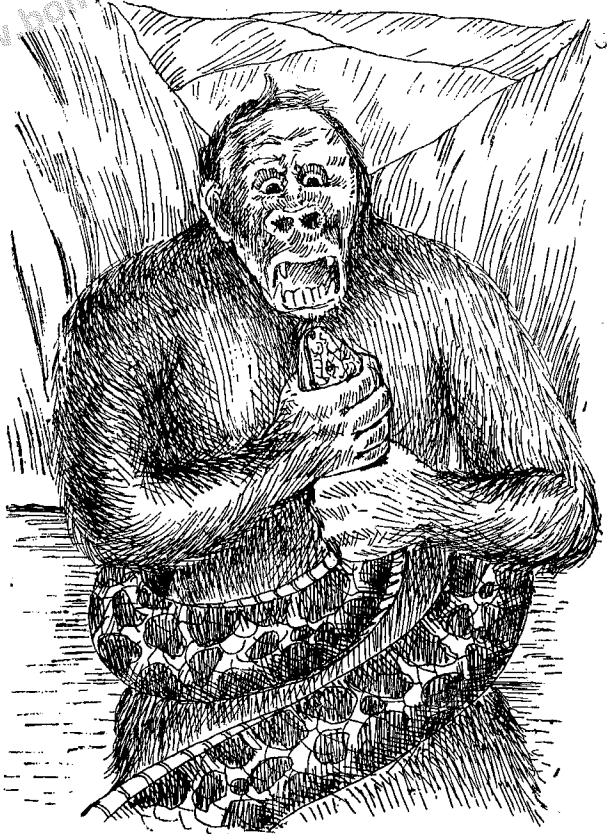
চক্ষু যেন ঠিক্‌রে কপালে উঠল। সে তবু দুই হাতে অজগরের গলা টিপে রইল এবং বার বার কামড় দিয়ে অজগরের ভীষণ বন্ধন ছিঁড়ে ফেলবার

চেষ্টা করতে লাগল।

দেহের সমস্ত শেষ শক্তি এক ক'রে এবং দেহের প্রত্যেক মাংসপেশী ফুলিয়ে কঙ্ অজগরের মাথাটা দুই হাতে আপনার বুকে চেপে ধ'রে একেবারে থেঁৎলে ফেললে। অজগরের ল্যাজের দিকটা তখন ছট্‌ফট্ করতে করতে জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল—কঙ্ এক পায়ে তাকে মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার চূর্ণ-বিচূর্ণ মাথাটা সজোরে পাহাড়ের উপরে আছড়ে ফেললে! আবার দ্বীপের রাজা কঙ্‌য়ের জয়। কিন্তু এবারে তার আর বিজয়-আনন্দ প্রকাশ করবারও শক্তি ছিল না—অজগরের নাগপাশ তার সেই বিরাট দেহকেও এম্‌নি অবশ ক'রে দিয়েছিল যে, সে টল্‌তে-টল্‌তে মাটির উপরে ধপাস্ ক'রে ব'সে পড়ল! এমন-কি, সেই বিশাল অজগরের যে বিপুল কুণ্ডলী তখনো তার চারিপাশে পাকিয়ে আছে, তার বাহিরে গিয়ে বসবার শক্তিটুকুও কঙ্‌য়ের তখন ছিল না! দুই চোখ মুদে পাহাড়ের গায়ে মাথা কাৎ ক'রে রেখে ভোঁস ভোঁস শব্দে সে হাঁপাতে লাগল।

শোভন দেখলে, এ এক সোনার সুযোগ! এমন সুযোগ সে হারালে না—পা টিপে টিপে কঙ্‌য়ের পিছনদিক দিয়ে উপরে উঠে শোভন সেই খাড়া-পাহাড়ের গুহার পাশে গিয়ে হাজির হ'ল।

বাইরে যখন দুই মত্ত দানবের বিষম লড়াই বেধে গেছে, গুহার ভিতরে মালবিকার তখন আবার জ্ঞানোদয় হয়েছে। পাথরের ঠাণ্ডা, আদুড় গা ছুঁয়ে সে ভাবলে, এ আবার আমি এলুম কোথায়? কঙ্ কোথায় গেল? বাইরেও মাতামাতি আর দাপাদাপি করছে কারা? আরার কি কোন নতুন দানবের আবির্ভাব হয়েছে,—না ভূমিকম্প হচ্ছে?

গুহার মুখ খোলাই রয়েছে! বাইরে কি কাণ্ডকারখানা চলছে, সেটা একবার উঁকি মেরে দেখে আসবার জন্যে মালবিকার অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল, কিন্তু তার ভরসায় কুলালো না।

হঠাৎ গুহার মুখে কার ছায়া এসে পড়ল! মালবিকার বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠল! পা টিপে টিপে চুপি চুপি এ আবার কোন নতুন শত্রু

গুহার ভিতরে তাকে আক্রমণ করতে এল? মালবিকা ভয়ে সেদিকে তাকাতে পারলে না।

—"মালবি, মালবি—শীগ্‌গির ওঠ্!"

এ যে তার দাদার গলা! কঙ্‌য়ের গুহায় তার দাদা? অসম্ভব। সে কি ভুল শুনছে! সে স্বপ্ন দেখছে! সে পাগল হয়ে গেছে!

—"শীগ্‌গির শীগ্‌গির! মালবি, আমি এসেছি! যদি বাঁচতে চাস্, এখান থেকে পালাতে চাস্, তবে উঠে পড়্—দেরি করিস্ নে!"

—"দাদা, দাদা! আমার দাদা এসেছ?"

—"চুপ্! পরে দাদা ব'লে ডাকবার আর কথা কইবার অনেক সময় পাওয়া যাবে, কঙ্ এখনি আসবে, আর তাহ'লেই আমি মারা পড়ব। উঠে আয়!"

—"কোথায় যাব?"

—"গুহার ধারে আয়। ঠিক তলাতেই একটা পুকুর দেখতে পাচ্ছিস?"

—"হ্যাঁ।"

—"তুই তো খুব ভালো সাঁতার আর 'ডাইভ্' করতে জানিস্। এখান থেকে লাফিয়ে পুকুরে পড়তে পারবি?"

—"পারব। কিন্তু তারপর? পুকুর তো ঐটুকু! আর ঐখানেই যে কঙ্ ব'সে আছে! আমরা পালাব কেমন ক'রে?"

—"সে কথা পরে বলব। এখন কঙ্‌কে পুকুরের ধার থেকে সরাতে হবে। নইলে বলা যায় না তো, পুকুরের ভিতরে হাত বাড়িয়েই হয়তো সে আমাদের ধ'রে ফেলবে। তুই তৈরী হয়ে থাক্। আমি বললেই লাফিয়ে পড়বি। আমি কঙ্‌কে রাগিয়ে দি।

গুহার ধার থেকে বড় বড় পাথর তুলে নিয়ে শোভন ছুঁড়তে লাগল, কঙ্‌কে টিপ্ ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে সে যা-মনে আসে তাই ব'লে চ্যাঁচাতে লাগল—"ওরে ছুঁচো কঙ্! ওরে নেংটি ইঁদুর! ওরে ক্ষুদে খোকা! ওরে ধেড়ে পোকা! আয় এখানে, আমি তোর সঙ্গে আজ কুস্তি লড়ব!"

দৈত্য কঙ্ তখনো কাতরভাবে হাঁপাচ্ছিল। দু-একটা পাথর গায়ে

লাগতেই সে চম্‌কে চোখ খুলে দেখে—অ্যাঁঃ, ও কী ব্যাপার? তারই গুহার মুখে একটা মানুষ-পোকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাচ্ছে, আর লাফাচ্ছে, আর তাল ঠুক্‌ছে! যেখানে যমও ভয়ে ঢোকে না, সেখানে একটা বাজে মানুষ-পোকা তিড়িং-মিড়িং করছে! এও কি সহ্য হয়?

হুঙ্কার দিয়ে লাফ মেরে কঙ্‌ দাঁড়িয়ে উঠল! নিজের সমস্ত কষ্ট ভুলে কালবোশেখীর কালো মেঘের মত কঙ্‌ রুদ্রমূর্তিতে গুহার পথে উঠ্‌তে লাগল!

আরে গেল! মানুষ-পোকাটা এখনো যে নাচে, ঢিল্‌ ছোঁড়ে, তাল ঠোকে! ওটা কি জানে না আমি হচ্ছি বিশ্বজয়ী রাজা কঙ্‌ আর ও গুহা হচ্ছে আমারই রাজবাড়ি, আর ওখান দিয়ে পালাবার কোন পথ নেই?

একটা ঢিল্‌ তার হাঁ-করা মুখের মস্ত গর্তে ঢুকে তার গলায় গেল আট্‌কে। মুস্কিলে প'ড়ে সে খক্‌-খক্‌ ক'রে খানিক কেশে ঢিল্‌টাকে গলা থেকে বার ক'রে দিলে। ক্ষুদে মানুষ-পোকার নষ্টামি দেখে কঙ্‌ রেগে টং হয়ে উঠল! দুই হাতে বুক চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে সে প্রায় গুহার কাছে এসে পড়ল।

আরে—আরে—ও কী? মানুষ-পোকা আর সেই জ্যান্ত পুতুল-মেয়েটা যে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল! ওদের ভরসা তো কম নয়—এখনি ডুবে মরবে যে!

গুহার ধারে মুখ বাড়িয়ে কঙ্‌ অবাক হয়ে দেখতে লাগল! সে-ও ওদের মত জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে না, ঐখানেই তার হার! তার তালগাছ-সমান দেহ নিয়ে সাধারণ নদী বা হ্রদ সে অনায়াসেই হেঁটে পার হয়ে যেতে পারে,—কিন্তু সে জানে, পুকুরের গভীর জলে তার বিশাল দেহও থই পাবে না! পায়ের তলায় মাটি থাকলে কঙ্‌ অসম্ভবও সম্ভব করতে পারে, কিন্তু অথই জলে সে সাঁতার কাটতে পারে না।

কিন্তু মানুষ-পোকা আর পুতুল-মেয়েটা তো ডুবলো না! মাছের মত সাঁতার কেটে ওরা যে পুকুরের ওপারের দিকে ভেসে যাচ্ছে! বটে! ঐদিকে গিয়ে ডাঙায় উঠে তোমরা আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে চাও?

হুঁঃ, কঙ্-এর হাত ছাড়িয়ে পালানো এত সোজা নয়,—দাঁড়াও মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি!

কঙ্ আবার লাফিয়ে লাফিয়ে পুকুরের দিকে নেমে আসতে লাগল।

সাঁতার কাটতে কাটতে শোভন ও মালবিকা কঙ্-এর উপরে দৃষ্টি রাখতে ভোলেনি।

শোভন বললে, "মালবি! তাড়াতাড়ি! কঙ্ নিচে আসবার আগেই আমাদের ওপারের কাছে যেতে হবে!"

মালবিকা বললে, "কিন্তু ওপারে গিয়ে ডাঙায় উঠলেই তো কঙ্ আবার আমাদের ধ'রে ফেলবে!"

—"আঃ, যা বলি শোন্ না! কঙ্ আমাদের কিছুই করতে পারবে না!"

কঙ্ যখন পুকুরের পাড়ে এসে নামল, শোভন ও মালবিকা তখন পুকুরের ওপারের কাছে এসে পড়েছে!

বড় বড় কয়েকটা লাফ মেরে কঙ্ ওপারে ডাঙার উপরে গিয়ে হাজির হ'ল। পুকুরের দুই দিকে তার দুই সুদীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে কঙ্ শোভন ও মালবিকার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল—তার তখনকার ক্রুদ্ধ চেহারা দেখলে বুকের রক্ত জল হয়ে যায়!

মালবিকা সভয়ে ব'লে উঠল, "দাদা, এইবারেই আমরা গেলুম!"

শোভন বললে, "কোন ভয় নেই। শোনো, যতটা পারো নিঃশ্বাস নাও। একেবারে পুকুরের তলায় ডুব দাও। এইখানে একটা বড় সুড়ঙ্গ আছে। নিচে গিয়ে সাঁতার কেটো না। হাত দুটো দিয়ে মাথা চেপে রাখো। এস!"

খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে শোভন ডুব দিলে। মালবিকাও তাই করলে।

খানিকটা নিচে নামতেই জলের ভিতরে তারা একটা প্রবল টান অনুভব করলে—এবং সেই টানে তাদের দেহ তীরবেগে ছুটে চলল—হয়ত কোন্ অজানা মরণের দিকেই। তারা বেশ বুঝলে, জলের গতি

যেদিকে, এখন হাজার বাধা দিলেও সেদিকে ছাড়া আর কোনদিকে তাদের যাবার উপায় নেই। তাদের দেহ ঘুরতে ঘুরতে জলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, এখন সামনে যদি কোন বাধা থাকে, তাদের দেহ তাহ'লে কাঁচের পেয়ালার মতই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

এইবারে মালবিকার কষ্ট হতে লাগল। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে? এ ভেসে-যাওয়ার শেষ কোথায়?—জলের টান কখন তাদের মুক্তি দেবে? আর বেশিক্ষণ এভাবে থাক্‌লে দম বন্ধ হয়েই সে যে মারা পড়বে!

আচম্বিতে জলের টান খুব ক'মে গেল—মালবিকা দেখলে, আলোয় জলের ভিতরটা ধব্ ধব্ করছে! তাড়াতাড়ি সে হাত দিয়ে জল কেটে পায়ের ঠেলায় নিজের দেহটাকে উপরপানে তুলে দিলে।

কী আনন্দ! ঐ তো আকাশ—পূর্ণিমার রূপোর মতন উজ্জ্বল! তার সামনেই ভেসে চলেছে শোভন। তারা এখন এক নদীর ভিতরে এবং নদীর দুধারে খালি পাহাড় আর বন!

মালবিকা খুব খুশি হয়ে ব'লে উঠল, "দাদা, দাদা! এ আমরা কোথায় এলুম—কেমন ক'রে এলুম?"

শোভন বললে, "পুকুরের তলায় সুড়ঙ্গ দিয়ে আমরা এই নদীতে এসেছি। এই নদীর জন্ম ঐ পুকুরে। আর এই নদী গিয়ে পড়েছে একেবারে সেই প্রান্তরের কাছে। জলের যে রকম টান দেখছি, আমাদের খালি ভেসে থাকলেই চলবে! এখানে এসেছি স্থলপথে, কিন্তু এখন জলপথে তার চেয়ে ঢের সহজেই আমরা প্রান্তরের কাছে গিয়ে পড়ব।"

মালবিকা বললে, "ওহো, কি মজা! কিন্তু দাদা, দৈত্য কঙ্ আমাদের পিছনে পিছনে তেড়ে আসছে না তো?"

শোভন বললে, "কঙ্ যাই-ই হোক্, সে পশু ছাড়া আর কিছুই নয়! কী কৌশলে আমরা তাকে ফাঁকি দিলুম, হয়তো সে সেটা বুঝতেই পারবে না। আর, যদিও বা পারে, তবে তাকে আসতে হবে স্থলপথে, অনেক ঘুরে। সে সাঁতার জানে না; নদীর জল যেখানে খুব গভীর, সেখানে

সে আসতে পারবে না। আমাদের আর ভয় নেই। কঙ্ এর ঢের আগেই আমরা প্রান্তরের কাছে গিয়ে পড়ব।”

এগারো

কঙ্ য়ের প্রত্যাগমন

প্রান্তরের উপর দিয়ে আবার নতুন একদল নাবিক খুলি-পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাদের সঙ্গে একখানা বোট, ঝুলোনো সাঁকো তৈরি করবার জন্যে রাশীকৃত দড়িদড়া, এবং আরও নানান রকম জিনিস-পত্তর রয়েছে।

দলের আগে আগে দেখা যাচ্ছে কাপ্তেন ঈঙ্গ্‌ল্‌হর্ন ও ডেন্‌হাম্‌কে। এরা সবাই চলেছে মালবিকা ও শোভনকে উদ্ধার করতে।

কাপ্তেন বললেন, “আমি খালি মিস্ সেন আর মিঃ সেনকে উদ্ধার করব না। আমি কঙ্ কেও বন্দী করবার চেষ্টা করব।”

ডেন্‌হাম্ বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক’রে বললে, “কেন? কঙ্ কে বন্দী ক’রে কি হবে?”

কাপ্তেন বললেন, “আমাদের মুখের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি সভ্য জগতকে দেখাতে চাই, কি ভীষণ দৈত্য এখনো এই পৃথিবীতে বাস করছে। আমাদের এই অদ্ভুত আবিষ্কারে সারা দুনিয়ায় হৈ-চৈ উঠবে,—আর লোকের মুখে মুখে আমাদের নাম ফিরতে থাকবে, আমরা অমর হয়ে যাব!”

ডেন্‌হাম্ বললে, “কঙ্ হবে মানুষের হাতে বন্দী! অসম্ভব! পাগলের প্রলাপ।”

কাপ্তেন খাপ্পা হয়ে বললেন, “পাগলের প্রলাপ! কেন?”

ডেন্‌হাম্ বললে, “আপনি কঙ্ কে এখনো দেখেননি ব’লেই এই কথা

বলছেন। সে এক সজীব পাহাড়। পিঁপড়েরা যদি বলে 'মানুষকে বন্দী করব,'—তাহ'লে সেটা কি তাদের পাগলামি হবে না? কঙ্‌য়ের কাছে আমরা কীট-পতঙ্গ পিঁপড়ের মতই তুচ্ছ।"

কাপ্তেন বললেন, "কিন্তু সে পশু, আর আমরা হচ্ছি মানুষ। মানুষের বুদ্ধির কাছে পশুকে হার মানতেই হবে। কঙ্‌কে বন্দী করব ব'লে আমি অনেক বোমা এনেছি।"

ডেন্‌হাম্ বললে, "বোমা আমাদেরও কাছে ছিল। তবু এতগুলো লোকের প্রাণ গেল।"

—"সেটা তোমাদেরই বুদ্ধির দোষে।"

—"মানলুম। কিন্তু বোমা ছুঁড়ে কঙ্‌কে বড়-জোর আমরা হত্যা করতে পারি। তাকে হত্যা করা এক কথা, আর জ্যান্ত অবস্থায় বন্দী করা অন্য কথা।"

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বোমার সাহায্যেই কঙ্‌কে বন্দী করব। এ যে-সে বোমা নয়,—গ্যাসের বোমা—বিষাক্ত গ্যাসের বোমা।"

ডেন্‌হাম্ চমৎকৃত হয়ে মহা উৎসাহে একটা লম্ফ ত্যাগ ক'রে বললে, "কি আশ্চর্য! এই সোজা কথাটা তো এতক্ষণ আমার মাথায় ঢোকেনি! ধন্য আপনার বুদ্ধি! হ্যাঁ, বিষাক্ত বোমার উপরে আর কোন কথা নেই বটে।"

কাপ্তেন হঠাৎ প্রান্তরের দিকে সচকিত চোখে তাকিয়ে বলেন, "ওরা কারা? ওরা কারা এদিকে আসে? মানুষ! একটি মেয়ে, একটি ছেলে।"

ডেন্‌হাম্ আহ্লাদে আর এক লাফ মেরে বললে, "আরে—আরে! ও যে মিস্ আর মিষ্টার সেন! অ্যাঁ! এ কি কাণ্ড! অবাক্!"

শোভন ও মালবিকা প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে!

ডেন্‌হাম্‌ও তাদের দিকে ছুটে গিয়ে বললে, "মিঃ সেন—"

ছুটতে ছুটতেই বাধা দিয়ে শোভন হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "সব কথা পরে শুনবেন! এখন পালিয়ে আসুন—ফটক বন্ধ করুন! কঙ্ আমাদের পিছনে পিছনে আসছে।"

—"কঙ্ ?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, পালিয়ে আসুন—পালিয়ে আসুন !"

কঙ্ আসছে শুনে সকলেরই পিলে চমকে গেল। লাম্পি ব'লে একজন লম্বা-চওড়া নাবিক এতক্ষণ সঙ্গীদের কাছে বড়াই করতে করতে আসছিল যে, বোমা ছুঁড়ে কেমন ক'রে সে কঙ্য়ের মোটা ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে। এখন কঙ্য়ের নাম শুনেই সকলের আগে সে ফটকের দিকে এমন লম্বা দৌড় মারলে যে, একবারও আর পিছন ফিরে চাইবার সময় পেলে না।

কেবল কাপ্তেন একবার বললেন, "আসুক না কঙ্! আমরা এইখানে দাঁড়িয়েই তার সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা করব।"

ডেন্হাম্ বললে, "না, না, পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে; শীগ্গির পালিয়ে আসুন!" ব'লেই ডেন্হাম্ দৌড় মারলে। কঙ্ যে কি চীজ্ সেটা আর বুঝতে বাকি নেই।

দেখতে দেখতে প্রান্তর জনশূন্য হয়ে গেল।

ওদিকে উচ্চ প্রাচীরের উপর থেকে অসভ্যরা আশ্চর্য দৃষ্টিতে দেখলে, তাদের রাজা কঙ্য়ের বউ আবার ফিরে এসেছে। নিজেদের চোখকেই তারা যেন বিশ্বাস করতে পারলে না! রাজা কঙ্য়ের বউ ফিরে এসেছে, এমন অসম্ভব ব্যাপার সে-দেশে আর কখনো কেউ দেখেনি।

প্রান্তরের অরণ্যের ভিতর থেকে আচম্বিতে এক ভয়াবহ, বুক দমানো গুরুগম্ভীর গর্জন জেগে উঠল—সে গর্জন শুনলে পাহাড়ের চূড়াও যেন খ'সে পড়ে!

বারো

কঙ্‌য়ের বউ-খোঁজা

"কঙ্‌! কঙ্‌! কঙ্‌!"—প্রাচীরের উপর থেকে হাজার হাজার কণ্ঠে চিৎকার উঠল—"কঙ্‌! কঙ্‌! কঙ্‌!"

প্রান্তরের উপর দিয়ে পাঁচ-ছয়-তলা অট্টালিকার চেয়ে উঁচু কী-একটা মহাদানব বন্যার বেগে ধেয়ে আসছে—চারিদিকে ধোঁয়ার মতন ধূলারাশি উড়িয়ে। প্রান্তরের বড় বড় গাছগুলোও তার বুক পর্যন্ত পৌঁছায় না।

চিৎকার সমানে চলল—"কঙ্‌! কঙ্‌! কঙ্‌! কঙ্‌! কঙ্‌! কঙ্‌! কঙ্‌!"

অসভ্যদের রাজার কি হুকুম হ'ল—দলে দলে লোক ছুটে গিয়ে প্রাচীরের মস্ত-বড় ফটকটা সশব্দে বন্ধ ক'রে দিলে।

—"কঙ্‌! কঙ্‌! কঙ্‌!—রাজা কঙ্‌ তার বউকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসছে!"

কিন্তু ফটক বন্ধ হয়েও বন্ধ হ'ল না। তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হবার আগেই কঙ্‌ তার হাতির দেহের চেয়েও মোটা একখানা প্রকাণ্ড পা ফটকের ফাঁকের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে—আর হুড়্‌কো লাগানো অসম্ভব।

পাছে সে ভিতরে ঢুকে পড়ে, সেই ভয়ে শত শত মানুষ ফটকের দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। কঙ্‌ ভিতরে ঢুকলে কী অমঙ্গল যে ঘট্‌বে, সকলেই তা জানে!

শোভন কাপ্তেনের দিকে ফিরে বললে, "মিঃ ঈঙ্গ্‌লহর্ন, এই বিপদের ভিতরে আমার ভগ্নীর আর থাকা উচিত নয়। ওকে আগে জাহাজে পাঠিয়ে দিন!"

কাপ্তেন সায় দিয়ে বললেন, "ঠিক বলেছেন মিঃ সেন। আচ্ছা, আমি

এখনি সে ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

তখন ফটকের ওদিকে কঙ্, আর এদিকে শত শত অসভ্য মহা ঠেলাঠেলি ও ধাক্কাধাক্কি শুরু ক'রে দিয়েছে। কয়েকজন জাহাজী-গোরাও অসভ্যদের সঙ্গে যোগদান করলে।

আগেই বলেছি, কঙ্ তার পা দিয়ে ফটকটা ফাঁক ক'রে রেখেছিল। হঠাৎ সেই ফাঁকের ভিতর হাত চালিয়ে সে একসঙ্গে দুজন অসভ্য ও একজন গোরাকে খপ্ ক'রে মুঠোর ভিতরে চেপে ধরলে এবং পরমুহূর্তেই সেই তিনজনের দেহ আকারহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত হ'ল।

কঙ্ ফটকের উপরে আবার এক প্রচণ্ড চাপ দিলে—সঙ্গে সঙ্গে ফটকের উপরদিকের একটা অংশ সশব্দে ভেঙে পড়ল। তারপর সে এমন ধাক্কার পর ধাক্কা মারতে লাগল যে, ফটকের বাকি অংশও হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে দেরি লাগল না।

সমুদ্র-তীরে এসে দাঁড়াল যে প্রলয়ঙ্কর কালভৈরবের মূর্তি, তাকে দেখেই হাজার হাজার অসভ্য পঙ্গপালের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল! দুর্জয় ক্রোধে কঙ্ আজ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে; সে প্রত্যেকবার পা ফেলছে আর তার বৃহৎ পদের চাপে প্রতিবারেই তিন-চারজন ক'রে লোকের দেহ ভেঙে চট্‌কে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কী সে গর্জন। সেই গর্জন শুনেই অনেকে মূর্ছিত হয়ে পড়্‌ছে!

মানুষগুলো কে মরল, কে পালালো, আর কেই-বা বাঁচল সে সব দিকে কঙ্‌য়ের আজ কোন লক্ষ্যই নেই,—তার মুণ্ড চারিদিকে ঘুরছে, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চারিদিকে ফিরছে,—কিন্তু যাকে অন্বেষণ করছে, তাকে যেন পাচ্ছে না!

কঙ্ খুঁজছে মালবিকাকে! সে সেই পুতুল-মেয়েকে আবার নিজের বাসায় নিয়ে যেতে চায়! কিন্তু মালবিকা তখন জাহাজে।

এইবারে কঙ্ অসভ্যদের গ্রামের দিকে ছুটল! সারি সারি কুঁড়েঘর। কঙ্ এক-একবার হাত ছোঁড়ে আর এক-একখানা ঘরের চাল উড়ে যায় —দেয়াল পড়ে যায়। কঙ্ অমনি সেই ঘরের ভিতরে হাত চালিয়ে

তারপর শোভন এবং তারপর ডেন্‌হাম্‌ও তার দিকে এক একটা

বোমা নিক্ষেপ করলে। ধোঁয়া যেন পুরু মেঘের মতন কঙ্‌কে গ্রাস ক'রে ফেল্‌লে!

কাপ্তেন বললেন, "ব্যাস! দেখ, কি হয়! আর বোধহয় বোমা ছুঁড়তে হবে না।"

বোমার ধোঁয়ার ভিতর থেকে কঙ্ যখন বেরিয়ে এল, তখন তার আগেকার তেজ আর নেই। তার পা দুটো তখন মাতালের মতন টল্‌মল্ করছে, মুণ্ডটা থেকে থেকে কাঁধের উপর কাৎ হয়ে পড়ছে এবং ক্রমাগত কাশির ধমকে তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে! কিন্তু সমুদ্রের তীরে সুদীর্ঘ কালো ছায়া ফেলে প্রচণ্ড কুম্ভকর্ণের মত কঙ্ আসছে—আসছে তবু আসছে! ভয় কাকে বলে তা সে জানে না।

কাপ্তেন বিপুল বিস্ময়ে বললেন, "এই একটা বোমা একদল মানুষকে অজ্ঞান ক'রে দিতে পারে, কিন্তু ঐ আশ্চর্য দৈত্যটা তিন-তিনটে বোমা হজম ক'রে ফেললে। আচ্ছা বন্ধু, আমরা এখনো ফতুর হইনি,—এই নাও, তোমাকে আর একটা বোমা উপহার দিলুম! আশা করি, এইবারে তুমি লক্ষ্মীছেলের মত ঘুমিয়ে পড়বে?"

চতুর্থ বোমাটা কঙ্‌য়ের বুকের উপরে দড়াম্ ক'রে ফেটে আবার রাশি রাশি ধোঁয়া বমন করলে—সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতর থেকে খানিকটা জলীয় বিষ তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল! কঙ্ আর এক পাও চলতে পারলে না, তার চোখ তখন অন্ধ এবং দমও যেন বন্ধ হয়ে গেল,—তবু কোনরকমে একটা মানুষ-পোকাকে ধরবার জন্যে সাম্‌নের দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে সমুদ্র তীরের বালির উপরে ধপাস্ ক'রে সটান সে প'ড়ে গেল।

শোভনের মনে হ'ল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হিড়িম্বা-পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচও বোধহয় এম্‌নি করেই ধরাশায়ী হয়েছিল।

ডেন্‌হামের মনে হ'ল, তার সাম্‌নে যেন বিশ-পঁচিশটা হাতি পাশাপাশি ম'রে প'ড়ে রয়েছে।

কাপ্তেন হাঁক দিলেন, "শীগ্‌গির মোটা লোহার শিকল দিয়ে ওর সর্বাঙ্গ বেঁধে ফেলো। ভয় হচ্ছে? আর কোন ভয় নেই—কঙ্ এখন অন্ততঃ তিন-চার ঘণ্টা খুব আরাম ক'রে ঘুমোবে—একটা আঙুলও নাড়তে পারবে না। আমার বোমার গুণ কত।...তাড়াতাড়ি একটা বড়

ভেলা তৈরী ক'রে ফেল! কঙ্‌য়ের ঐ ছোট্ট খোকার মত দেহখানি তো জাহাজে তোলা চলবে না, জাহাজের সঙ্গে ভেলায় ক'রে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে! যাও, যাও, ভ্যাবাকান্তের মত হাঁ ক'রে দেখছ কি?"

শোভন বললে, "কঙয়ের কাছে লোহার শিকল হয়তো ফুলের মালার মতন পল্‌কা!—ও কি বাঁধা থাকতে রাজী হবে?"

কাপ্তেন বললেন, "রাজী হয় কি না হয়, সেটা পরে বোঝা যাবে! কঙ্‌, কঙ্‌, কঙ্‌! রাজা কঙ্‌! সবাই কঙ্‌ কঙ্‌ ক'রে ভয়েই সারা! এই দ্বীপেই সে রাজা, সভ্য দেশে সে পশু মাত্র! যে-কোন পশুকে মানুষ একটা মস্ত বড় শিক্ষা দিতে পারে। সেটা হচ্ছে, ভয়। মানুষ—হাতি, বাঘ, সিংহকে বশে রেখেছে এই ভয় দেখিয়েই। কঙ্‌কেও আমরা শিখিয়ে দেব, ভয় কাকে বলে! তারপর সে বশ মানে কিনা দেখা যাবে। লোহার শিকলে নয়, ভয়ে এই পশু কঙ্‌ আমাদের গোলাম হয়ে থাকবে!"

ওদিকে পাঁচিলের উপর থেকে বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়ার মতন ডাগর ক'রে অসভ্যরা অবাক্ হয়ে দেখতে লাগল, তাদের বিশ্ববিজয়ী রাজা কঙ্‌কে ওই বিদেশীরা লোহার শিকলে বেঁধে ভেলায় করে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রধান পুরোহিত ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "ভেটো খোটো হোটো ধোটো ঘংচা!"

রাজাও চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, "হাভা ডাভা খাভা তাভা খোংখু!"

এ-সব কথার মানে কি জানি না। বোধহয় খুবই দুঃখ-শোকের কথা!

কাপ্তেন শোভনের পিঠ চাপড়ে বললেন, "মিঃ সেন! আপনি বীর বটে! রূপকথার রাজপুত্রের মত আপনি এই দৈত্যটার হাত থেকে আপনার ভগ্নীকে উদ্ধার ক'রে এনেছেন!...এই কঙ্‌কে নিয়ে আমি পৃথিবীর বড় বড় সব শহরে ঘুরে বেড়াব, আর আপনার সম্মানের জন্যে সর্বপ্রথমে যাব কলকাতা শহরেই!"

তেরো

"পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য"

সারা কলকাতার লোক আজ সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের এক মাঠের দিকে সমুদ্রের তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতন ছুটে চলেছে !

সারা কলকাতার ছোট-বড় বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে সচিত্র বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে একটা গগনস্পর্শী গরিলার ছবি এবং তার তলায় মস্ত বড় হরফে লেখা রয়েছে—**"রাজা কঙ্, পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময় !"**

সারা কলকাতায় সমস্ত ছেলে-মেয়ে আজ প্রতিজ্ঞা করেছে, রাজা কঙ্‌কে স্বচক্ষে না দেখে, কেউ আর ইস্কুলের কোন কেতাব স্পর্শ করবে না।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে যে-সব 'ট্রাফিক-কনস্টেবল' পাহারা দেয়, মানুষের ভিড়ের চোটে আর গাড়ির ঠেলায় অস্থির হয়ে তারা রাজা কঙ্‌য়ের উদ্দেশে অভিশাপ বৃষ্টি করছে !

রাজা কঙ্‌কে আজ তিনবার দেখানো হবে। কলকাতার কোন বায়স্কোপ ও থিয়েটারে আজ একখানাও টিকিট বিক্রী হয়নি। ক্যাল্‌কাটা-মোহনবাগানের খেলার মাঠে চেঁচিয়ে গলা ভাঙ্‌বার, হাততালি দেবার ও রেফারিকে গালাগালি দিয়ে খুশি হবার জন্যে একজন লোকও যায়নি।

খবরের কাগজওয়ালাদের মুখে আজ হাসি আর ধরছে না। মালবিকার বিপদের ও শোভনের বীরত্বের কাহিনী ছাপিয়ে কাগজ-ওয়ালারা আজ যত কাগজ বিক্রী করেছে, সারা বছরেও তত বিক্রী হয় না।

মাঠে আজ মস্ত তাঁবু পড়েছে এবং তাঁবুর ভিতরে-বাইরে জনতার মধ্যে কেবল হাজার হাজার কালো মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তিনবারের প্রদর্শনীর সমস্ত টিকিটই বিক্রী হয়ে গেছে। ধুমধামপুরের জমিদার হুমদাম দে এবং প্যান প্যান-গড়ের মহারাজ ভ্যান্ ভ্যান্ সিং

নাকি এক-একখানি টিকিটের জন্যে যথাক্রমে পাঁচশো ও হাজার টাকা দিতে চেয়েও একটুখানি দাঁড়াবার ঠাঁই পর্যন্ত পাননি!

ফুলস্টপ কোম্পানীর বড় সাহেব মিঃ সেমিকোলন ও তাঁর স্ত্রী মিসেস্ কমা রাজা কঙ্‌কে দেখবার আগ্রহে চল্লিশ টাকার একখানি 'বক্স' অতি কষ্টে কিনতে পেরেছিলেন। তাঁবুর ভিতরে এসে দূর থেকে রাজা কঙ্‌য়ের গর্জন শুনেই তাঁদের কান নাকি কালা হয়ে গিয়েছে! এবং পাছে রাজা কঙ্‌কে দেখলে চোখ তাঁদের কাণা হয়ে যায়, সেই ভয়ে নাকি তাঁরা চোখে ঠুলি পরবার জন্যে আবার বেরিয়ে গেছেন!

ভিড়ের জন্যে চৌরঙ্গীর মোড় পার হ'তে না পেরে তিতুরাম তাঁতি সেইখানেই পঁচিশ-ত্রিশ জন শ্রোতার কাছে রীতিমত আসর জমিয়ে বলছে—"ভায়ারা, রাজা কঙ্ সোজা লোক নন! তিনি তাঁর দেশে শুয়ে যখন ঘুমোতেন,—বুঝলে কিনা—তাঁর ঠ্যাং থাকত পাতালে, ধড়্ থাকত পৃথিবীতে, আর বুঝলে কিনা মুণ্ডটা থাকত আকাশের চাঁদের পাশে!"

একজন অবিশ্বাসী শ্রোতা বললে, "তাহ'লে ঐটুকু তাঁবুতে তিনি কেমন ক'রে মাথা গুঁজে আছেন?"

তিতুরাম তাঁতি একগাল হেসে বললে, "আরে মুখ্যু, তাও জানো না! রাজা কঙ্ যে—বুঝলে কিনা—ত্রেতার বীর হনুমানের ভায়রা-ভাই! হিঁদুর বেটা হয়ে তুমি কি এ-ও শোনো নি যে, হনুমানজী ইচ্ছে করলেই ক'ড়ে আঙুলটির মতন ছোট্টটি হ'তে পারতেন? রাজা কঙ্‌ও সেই বিদ্যে জানেন, ছোট তাঁবুতে ছোটটি হয়ে আছেন।"

একজন মাড়োয়ারী ভুঁড়ি চুলকোচ্ছিল, হনুমানজীর নাম শুনেই ভুঁড়ি চুলকানো ভুলে, উদ্দেশে প্রণাম করে বললে, "হাঁ বাবু সাব, ও বাৎ ঠিক হ্যায়!"

আর একজন তিতুরামকে সুধোল, "এত খবর তুমি কোথা থেকে পেলে?

তিতুরাম তাঁতি ফিক্ ক'রে আবার একটু হেসে বললে, "খবর কি অম্‌নি পাওয়া যায় ভায়া, খবর রাখতে হয়! আমি খবর পাবো না তো

খবর পাবে কে? আমার শাশুড়ীর বোনঝির মামী-শাশুড়ীর বোন-ঝি যে—বুঝলে কিনা—ঐ শোভন ছোকরার পিশে-মশাইয়ের মামা-শ্বশুর-বাড়ীতে—বুঝলে কিনা—কাপড় বেচতে যান!"

এত বড় প্রমাণের পরে আর কথা চলে না। অতএব সবাই তিতুরাম তাঁতিকে একজন সত্যবাদী লোক ব'লেই মেনে নিলে।

শহরের হাটে-মাঠে-বাটে এম্‌নি নানান রকম গুজবের অন্ত নেই! সকলের ভাগ্যে রাজা কঙ্‌য়ের সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা তো ঘট্‌ল না, কাজেই আজ কঙ্‌ সম্বন্ধে যে যেমন কথাই বলুক না কেন, সকলেই তা বিশ্বাস ক'রে খুশি হচ্ছে!

কিন্তু আজ কাপ্তেন ঈঙ্গ্‌ল্‌হর্নের চেয়ে বেশি খুশি কেউ নয়! তিনি ব্যাপার দেখে স্থির করেছেন, এইবারে জাহাজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর শহরে শহরে কঙ্‌কে দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করবেন।

ডেন্‌হাম্‌কে ডেকে তিনি বললেন, "আর তুমি ছোকরা হবে আমার ম্যানেজার। আমার যা লাভ হবে, তা থেকে তুমি দু-আনা অংশ পাবে। আমি একলাই সব টাকা হজম করতে চাই না।"

ডেন্‌হাম্‌ হেসে বললে, "বেশ, ও-সব কথা নিয়ে পরে আলোচনা করব। কিন্তু আপাততঃ যে ভারি বিপদ উপস্থিত।"

কাপ্তেন ব্যস্ত হয়ে বললেন, "বিপদ! কিসের বিপদ? কঙ্‌ কি খাঁচার দরজা ভেঙে ফেলেছে?"

ডেন্‌হাম্‌ বললে, "না, আজ সে দরজা ভাঙেনি—তবে পরে একদিন হয়তো ভাঙ্‌বে।"

—"তবে আবার বিপদ কিসের?"

—"মিঃ সেন আর মিস্‌ সেন দর্শকদের সামনে আসতে রাজী হচ্ছে না!"

—"কেন? আমি তো স্বীকার করেছি, তাঁদের বীরত্বের পুরস্কারের জন্যে আজ্‌কের টিকিট বিক্রীর সব টাকা তাঁদেরই আমি উপহার দেব!"

—ডেন্‌হাম্‌ ঘাড় নেড়ে বললে, "না, না সেজন্যে তাদের আপত্তি

নয়! টিকিট-বিক্রীর টাকা তাঁরা চান না! তাঁরা বলছেন, এমন ভাবে সকলের সামনে আস্‌তে তাঁদের লজ্জা করছে!”

ডেন্‌হামের পিঠে এক আদরের চড় মেরে কাপ্তেন বললেন, “ওঃ, এইজন্যে তুমি এত ভাবছ? কোন ভাবনা নেই,—তাঁদের এখানে নিয়ে এস, আমি ঠিক রাজী করাব!”

ডেন্‌হাম্ বেরিয়ে গেল এবং শোভন ও মালবিকাকে নিয়ে আবার ফিরে এল।

কাপ্তেন বললেন, “আপনারা দর্শকদের সামনে আসতে রাজী নন কেন?”

শোভন বললে, “কারণ তো মিঃ ডেন্‌হাম্‌কে আগেই বলেছি।”

কাপ্তেন বললেন, “তাহ’লে আমার মান কোথায় থাকবে? সমস্ত কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, আজকের প্রদর্শনীতে এলে সবাই আপনা-দেরও দেখতে পাবে! আপনাদের একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে আজ কত লোক টিকিট কিনেছে, আপনারা কি সে-খবরটা রাখেন? কঙ্গয়ের সামনে দাঁড়িয়ে, কেমন ক’রে তাকে ধরা হ’ল যখন সেই গল্প বলা হবে, তখন লোকে আপনাদের খুঁজবে। কিন্তু তখন আমি কি বলব?”

শোভন বললে, “আপনি টিকিট বিক্রী করছেন ব’লেই তো আমাদের আপত্তি।”

—“কেন? আজকের টাকা তো আমি নিজের পকেটে পুরছি না। এ সবই তো আপনাদের।”

শোভন একটু বিরক্ত স্বরে বললে, আমাদের আসল আপত্তি তো সেইজন্যেই। আমরা কি থিয়েটারের অভিনেতা, না সার্কাসের খেলোয়াড় যে, টাকার লোভে লোকের কৌতূহল মেটাতে আসব? না, মিঃ ঈঙ্গল্‌র্গর্ন, আমাদের দিয়ে এ-কাজ হবে না।”

কাপ্তেন মুশকিলে প’ড়ে হতাশভাবে বললেন, “তা’হলে আমার কি উপায় হবে? লোকে যে আমাকে মারতে আসবে।”

কাপ্তেনের মুখ দেখে মালবিকার মায়া হ’ল! খানিকক্ষণ ভেবে সে

বললে, "আচ্ছা, যখন অন্য উপায় নেই, তখন কি আর করা যাবে? তবে আমরা এক সর্তে রাজী হ'তে পারি। আজ্‌কের টিকিট-বিক্রীর এক পয়সাও আমরা নেব না। কি বল দাদা?"

শোভন বললে, "এ প্রস্তাব তবু মন্দের ভালো।"

কাপ্তেন বললেন, "খামাখা এতগুলো টাকা ছেড়ে দেবেন?"

শোভন বললে, "টাকার লোভে আমরা মনুষ্যত্ব বিক্রী করতে পারব না।"

কাপ্তেন উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, "সাধু! সাধু! আপনাদের যতই দেখছি, আপনাদের ওপরে আমার শ্রদ্ধা ততই বেড়ে উঠছে। এইবার চলুন—প্রথম প্রদর্শনীর সময় হয়েছে।"

চৌদ্দ

কঙ্‌য়ের জাগরণ

কঙ্‌ ব'সে আছে। কিন্তু আজ আর সে রাজা কঙ্‌ নয়। বেজায় মজবুত ইস্পাতের খাঁচার ভিতরে, সর্বাঙ্গে ইস্পাতের শিকলের বাঁধন নিয়ে পর্বতের ভেঙে পড়া শিখরের মত স্তব্ধ হয়ে, হেঁট মাথায়, ম্রিয়মাণ মুখে সে ব'সে আছে। মোটা লোহার চেনে তার প্রকাণ্ড হাত ও পা বাঁধা। সমস্ত দেহের মধ্যে মাঝে মাঝে নড়ছে কেবল তার চোখ দুটো।

তাকে দেখলে দুঃখ হয় সত্য সত্যই। কী অধঃপতন! আকাশ ছোঁয়া সেই খুলি-পাহাড়ের শিখর। সে ছাড়া আর কোন জীবজন্তুর ছায়া সেখানে পড়েনি! তার উপর দিয়ে ব'য়ে যেত মেঘের সার আর ঝোড়ো হাওয়া এবং নিচে দিয়ে ব'য়ে যেত অনন্ত মহাসাগর! সেইখানে ব'সে ব'সে কঙ্‌ তার দ্বীপ-রাজ্য শাসন করত। অরণ্যবাসী ভয়ঙ্কর সব দানব জন্তু—যাদের লাঙ্গুলের আঘাত লাগলে বড় বড় শাল, তাল, দেবদারু

গাছ ধুলো হয়ে উড়ে যায়, যাদের পায়ের ভারে মেদিনী টলমল করে, —কঙ্‌য়ের বলিষ্ঠ বাহু তাদেরও দর্প চূর্ণ করেছে! যে-সব পুঁচ্‌কে মানুষ-পোকাগুলো তাকে খুশি রাখবার জন্য পূজা করত, বৎসরে বৎসরে বউ যোগাত, কঙ্‌ একটা নিশ্বাস ফেললে, হয়তো যারা ঝড়ের তোড়ে শুক্‌নো পাতার মত হুস্‌ ক'রে কোথায় উড়ে যায়, দৈব-বিড়ম্বনায় আজ কিনা সেই ঘৃণ্য কীটগুলোই তাকে কুকুর-বিড়ালের মত বেঁধে রেখে দিয়েছে, পরম অবহেলা-ভরে তার সুমুখ দিয়ে আনাগোনা করছে! যদিও এই পোকাগুলোর ভাষা সে জানে না, তবু এটুকু তার বুঝতে বাকি থাকছে না, প্রায়ই তাকে একটা তুচ্ছ জীব ভেবে তারা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসা করে, তাকে টিট্‌কিরি দেয়! হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙও তাই নিয়ে কৌতুক-বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না! হায় রে অদৃষ্ট!···

কয়েকজন খবরের কাগজের 'রিপোর্টার'কে নিয়ে কাপ্তেন এলেন,—তাঁর পিছনে পিছনে ডেন্‌হাম্‌, শোভন ও মালবিকা!

মালবিকা সহজে সেখানে আসতে রাজী হচ্ছে না, বলছে, "না মিঃ ডেন্‌হাম্‌, আপনি জানেন না, কঙ্‌কে দেখলেই আমার বুক ধুক্‌ ধুক্‌ করে, ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যায়!"

ডেন্‌হাম্‌ বললে, "মিস্‌ সেন, আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন! এর মধ্যে ইস্পাতের খাঁচা, শিকল আর চাবুকের মহিমায় কঙ্‌য়ের সব জারি-জুরি আর জাঁক আমরা ভেঙে দিয়েছি। এখন সে পোষা খরগোসের মত শান্ত হয়ে পড়েছে।"

মালবিকা ভয়ে ভয়ে তার দাদার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল।

"দেশবন্ধু" পত্রের রিপোর্টার অনেক তফাতে দাঁড়িয়ে বললেন, "বাঁদরটার শিকল বেশ শক্ত তো!"

"বঙ্গবীর" পত্রের রিপোর্টার ক্যামেরা নিয়ে এসেছেন কঙ্‌য়ের একখানা ফোটো তুলতে। কিন্তু তিনি ফোটো তুলবেন কি, কঙ্‌য়ের চেহারা দেখে তাঁরই দাঁতে দাঁত লেগে গেল!

"যুবক ভারত"-এর রিপোর্টার খাঁচার ভিতরে একবার উঁকি মেরেই

তুষ্ট হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চ'লে গেলেন।

হঠাৎ বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠল। কাপ্তেন বললেন, "আর সময় নেই। কঙ্‌কে দর্শকদের সামনে নিয়ে চল।"

খাঁচার তলায় ছিল চাকা। প্রায় দুশো কুলি এসে দড়ি দিয়ে "হেঁইও জোয়ান হো" ব'লে খাঁচাটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

তাঁবুর ভিতরে দর্শকদের আসনে তখন আর তিলধারণের ঠাঁই নেই। এতক্ষণ সেখানে বাজে গোলমালে ও তর্ক-বিতর্কে কান পাতবার যো ছিল না—কিন্তু এখন রাজা কঙ্ সশরীরে আসছেন শুনে, "পৃথিবীর এই অষ্টম বিস্ময়"কে স্বচক্ষে দেখবে ব'লে, সকলে রুদ্ধশ্বাসে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

তারপর কঙ্‌য়ের মূর্তি দেখে চারিদিকে বিস্ময়ের যে বিপুল চিৎকার উঠল, তা বর্ণনা করা যায় না। প্রথম কয়েক সারে বেশি দামী আসনে যে সব ধনী বাঙালী ও সাহেব-মেম ব'সে ছিল, তারা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে পিছনে স'রে গেল। অনেক মেম মূর্ছিত হয়ে পড়ল, এবং সমস্ত বালক-বালিকা এক-তানে কান্নার কন্সার্ট শোনাতে শুরু করলে।

তবু কঙ্‌য়ের দাঁড়ানো মূর্তির ভয়ানক ভাবটা কেউ দেখতে পেলে না,—কারণ খাঁচার ভিতরে কঙ্ জড়োসড়ো হয়ে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

এমন সময়ে দর্শকদের আগ্রহে ও অনুরোধে কাপ্তেন-সাহেব শোভন ও মালবিকাকে এনে খাঁচার পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

এতক্ষণ কঙ্ টু-শব্দটিও করেনি। তার অত্যন্ত নির্বিকার ভাব দেখে কাপ্তেন-সাহেব স্থির করেছিলেন যে, সে ভয়েই এমন চুপ মেরে আছে।

কিন্তু এখন, মালবিকা যেমনি খাঁচার পাশে এসে দাঁড়াল, কঙ্ অমনি চমকে মুখ তুলে বাজের মতন চেঁচিয়ে উঠল!

পর-মুহূর্তে সেই মস্ত তাঁবুর আধখানা খালি হয়ে গেল—দর্শকরা আঁৎকে উঠে এ-ওর ঘাড়ে প'ড়ে তীরের মতন বেগে পালাতে লাগল। যারা অত্যন্ত সাহসী তারাও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—এবং তাদেরও

ভাব দেখলে বোঝা যায়, আর একটু বাড়াবাড়ি হ'লে তারাও পলায়ন করবার জন্যে রীতিমত প্রস্তুত হয়েই আছে।

কাপ্তেন গলা তুলে বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ ও মহোদয়াগণ! আপনারা মিথ্যা ভয় পাবেন না। কারণ, কঙ্-য়ের শিকল 'ক্রোম স্টিলে' প্রস্তুত—এ শিকল ছেঁড়া অসম্ভব।"

মালবিকার মুখও তখন ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে সেও কয়েক পা 'পিছিয়ে এল।

শোভন তার কানে কানে বললে, "সবাই জানে আমরাই কঙ্-কে বন্দী ক'রে এনেছি। মালবি, এত লোকের সামনে ভয় পেও না, সবাই ঠাট্টা করবে।"

কঙ্-য়ের হাত-পায়ের শিকলগুলো হঠাৎ ঝন্‌ঝনিয়ে বেজে উঠল।

মালবিকা বললে, "দাদা, কঙ্-য়ের চোখ দেখ! ও কি-রকম ভাবে আমার পানে তাকিয়ে আছে! কাপ্তেনকে বল,—ওঁর যা বলবার, তাড়াতাড়ি সেরে নিন ; নইলে হয়তো আমি অজ্ঞান হয়ে যাব।"

শোভন বললে, "মিঃ ঈঙ্গ্‌লহর্ন, আর দেরি করবেন না, যা বলতে হয় চট্ ক'রে ব'লে ফেলুন। আমার ভগ্নী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

কাপ্তেন আবার গলা তুলে বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ ও মহোদয়াগণ—"

শিকলগুলো এবার বড় জোরে বেজে উঠল,—কাপ্তেন স্তম্ভিত নেত্রে দেখলেন, কঙ্-য়ের হাত ও পা থেকে শিকলের বাঁধন খুলে পড়েছে। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"ডেন্‌হাম্! ডেন্‌হাম্! শীগগির কুলিদের ডাকো!"

কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই রইল—শূন্যে মুখ তুলে কঙ্ আর-একবার বিকট গর্জন ক'রে আচম্বিতে উঠে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মজবুত ইস্পাতে তৈরি ছাদ ঝন্‌ঝনিয়ে বেজে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। কঙ্-য়ের মাথা তখন প্রায় তাঁবুর ছাদে গিয়ে ঠেক্‌ল।

তাঁবুর দরজার কাছে দর্শকদের ভিতরে তখন রীতিমত যুদ্ধ বেধে গেছে—কে আগে পালাবে তাই নিয়ে। অনেক ভিড়ে ধাক্কা সইতে না পেরে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল—পিছনের লোকেরা তাদেরই দেহ পায়ে

থেঁৎলে এগিয়ে যেতে লাগলো! ভীত চীৎকারে, আহতদের আর্তনাদে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে গেল!

ইতিমধ্যে শোভনও তাড়াতাড়ি মালবিকার মূর্ছিত দেহকে কাঁধে তুলে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডেন্‌হাম্ একটা গ্যালারির তলায় আশ্রয় নিলে, কাপ্তেনও তার পিছনে পিছনে গ্যালারির ফাঁক দিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গেলেন—কিন্তু গ্যালারির দুই তক্তার মাঝখানে গেল তাঁর হৃষ্টপুষ্ট ভুঁড়িটা আট্‌কে। অসহায় ভাবে দুই পা শূন্যে ছুঁড়তে ছুঁড়তে তিনি বললেন, "ডেন্‌হাম্। আমাকে বাঁচাও—কঙ্ আমাকে ধরলে বুঝি!"

ডেন্‌হাম্ প্রাণপণ শক্তিতে তাঁর দুই হাত ধ'রে টেনে-হিঁচড়ে কোন-রকমে তাঁকে ভিতরে টেনে নিলে।

দুই পদাঘাতে সমস্ত খাঁচা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে দৈত্য কঙ্ বাইরে এসে দাঁড়াল!

একজন সার্জেণ্ট্ তাকে লক্ষ্য ক'রে পাঁচ-ছয়বার রিভলভার ছুঁড়লে, কিন্তু কঙ্ সে-সব গ্রাহ্যও করলে না। সে একটানে সমস্ত তাঁবুটা ছিঁড়ে উপড়ে আকাশের দিকে এক টুক্‌রো ন্যাক্‌ড়ার মতন উড়িয়ে দিলে এবং তারপর পায়ের তলায় কলকাতা শহরের দিকে সক্রোধে তাকিয়ে হুঙ্কারের পর হুঙ্কার দিতে লাগল!

পনেরো

কঙ্‌য়ের কথা ফুরুলো

নিজের বাড়িতে ফিরে বিছানায় শুয়ে মালবিকা তখন কাঁদছিল।

শোভন বললে, "মালবি, তুই এত ভীতু, আমি তা জানতুম না!"

মালবিকা বললে, "দাদা, দাদা! আর আমি সইতে পারছি না!

কঙ্ ছাড়া পেয়েছে। সে আবার আমাকে সেই দ্বীপে ধ'রে নিয়ে যাবে।"

তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে শোভন বললে, "দূর পাগলী। সে তোর খোঁজ পেলে তো।"

মালবিকা বললে, "না দাদা, আমার মন বলছে, সে আবার আসবে।"

—"হুঁ", আসবে, না আরো-কিছু। এটা অসভ্যদের দ্বীপ নয়, এ হচ্ছে কলকাতা শহর। এতক্ষণে কঙ্ হয়তো আবার গ্রেপ্তার হয়েছে।"

তবুও মালবিকা প্রবোধ মানলে না, উঁ-উঁ ক'রে কাঁদতে লাগল।

শোভন বললে, "ভারি মুস্কিলে পড়লুম দেখছি। কোথাও কিছু নেই, নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছে, তবু কচি খুকির মত কান্না। আচ্ছা বাপু, একটু সবুর কর, আমি লালবাজারের থানায় টেলিফোন ক'রে খবর এনে দিচ্ছি। কেমন, তাহ'লে ঠাণ্ডা হবি তো?"

মালবিকা সজল চোখে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, "না দাদা, তুমি যেও না—তোমার পায়ে পড়ি। আমি একলা থাকতে পারব না।"

—"যত বাজে ভয়! চুপ ক'রে শুয়ে থাক্, ফোন্ ক'রে আমি এখনি আস্‌ছি"—বলতে বলতে শোভন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লালবাজারের সঙ্গে ফোনের যোগ ক'রে শোভন বললে, "হ্যাঁ, আমি হচ্ছি শোভন সেন। হ্যাঁ, আমারই ভগ্নীকে কঙ্ ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল। আমার ভগ্নী বড় ভয় পেয়েছেন, পাছে কঙ্ আবার তাঁকে ধরে···কঙ্ আবার বন্দী হয়েছে তো? কি বললেন? বন্দী হয়নি? তবে সে এখন কোথায়? পাগলের মত চৌরঙ্গীর বাড়িতে বাড়িতে ঘরে ঘরে উঁকি দিয়ে দেখছে? কারুকে আক্রমণ করেছে কি? করেনি? তার পায়ের চাপে অনেক লোক মারা পড়েছে? সে থিয়েটার রোডের ভেতরে ঢুকেছে?···আচ্ছা, ধন্যবাদ!"

রিসিভারটা যখন রেখে দিলে, শোভনের হাত তখন ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। কঙ্ থিয়েটার রোডে ঢুকেছে। তাদের বাড়িও যে থিয়েটার রোডেই।

মালবিকাকে সাবধান ক'রে দেবার জন্যে শোভন তাড়াতাড়ি তার

ঘরে ছুটে এল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকেই দেখলে, মালবিকার বিছানা খালি, জানলার গরাদে ভাঙা এবং থামের মতন মোটা মোটা দুখানা কালো রোমশ পা, জানলার সাম্‌নে দিয়ে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে।

বেগে ছাদের উপরে গিয়ে সে দেখলে, তার বাড়ির ছাদ থেকে কঙ্ খুব সহজেই লাফ মেরে থিয়েটার রোড পার হয়ে ওপাশের এক বাড়ির উপরে গিয়ে পড়ল এবং তার হাতের চেটোয় রয়েছে মালবিকার অচেতন দেহ। পর মুহূর্তে আর এক লাফে কঙ্ একেবারে অদৃশ্য।

পাগলের মতন ছুটে রাস্তায় এসে শোভন দেখলে, সেখানে জনতার সীমা নেই। লরির পরে লরি ছুটে আসছে, তাদের উপরে দলে দলে পাহারাওয়ালা,...সার্জেন্ট্ ও মিলিটারী পুলিশের লোক।

পুলিশের একজন বড় কর্তা উত্তেজিত স্বরে বল্‌ছে, "ও জানোয়ারটা অমন শক্ত চেন ছিঁড়লে কেমন ক'রে? অমন ইস্পাতের চেন দিয়ে যুদ্ধের 'ট্যাঙ্ক' পর্যন্ত আটকে রাখা যায়।......ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন্ কর। শীগ্‌গির লম্বা মই নিয়ে তাদের লোকজনকে আসতে বল। বদমাইসটা ছাদে ছাদে লাফিয়ে যাচ্ছে; আমাদেরও দেখছি ছাদে ছাদে তার সঙ্গে যেতে হবে।"

আরো অনেক পুলিশের লোকের সঙ্গে মোটরে ক'রে কাপ্তেনসাহেব ও ডেন্‌হাম্ এসে হাজির।

শোভন বললে, "মিঃ ঈঙ্গ্‌লহর্ন। কঙ্ আমার বোনকে নিয়ে পালিয়েছে!"

দূরের একটা বাড়ির ছাদে কঙ্‌য়ের বিশাল দেহ একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

—"পশুটা আবার চৌরঙ্গীর দিকে যাচ্ছে! ওদিকে চল, পথ সাফ্ কর!"

মিলিটারী-পুলিশের অনেকগুলো বন্দুক একসঙ্গে গর্জন ক'রে উঠল!

ডেন্‌হাম্ তাড়াতাড়ি তাদের কাছে গিয়ে বললে, "সাবধানে বন্দুক

ছোঁড়ো। কঙ্-য়ের হাতে এক মহিলা আছেন।"

কিন্তু কোথায় কঙ্? পুলিশের লরিগুলো বেগে পশ্চিম দিকে ছুটেছে!

একজন ট্যাক্সি-চালক পশ্চিম দিক থেকে গাড়ী ছুটিয়ে আস্‌ছিল বা পালাচ্ছিল। একজন সার্জেন্ট তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কঙ্-কে দেখেছ?"

সে বিস্ময়ে প্রায়-রুদ্ধ স্বরে বললে, "কে কঙ্, তা আমি জানি না। কিন্তু আমি একটা তালগাছের মত উঁচু ভূতকে পার্ক স্ট্রীটের এপাশের ছাদ থেকে ওপাশের ছাদে লাফিয়ে যেতে দেখেছি।" ব'লেই সে আবার গাড়ী চালিয়ে পলায়ন করলে।

—"সবাই পার্ক স্ট্রীটের দিকে চল—পার্ক স্ট্রীটের দিকে।"

পুলিশ-কমিশনার কাপ্তেনকে ডেকে সুধোলেন, "মেসিন-গানের বুলেট কি তোমার এই পোষা দৈত্যকে বধ করতে পারবে?"

কাপ্তেন বললেন, "অনেকগুলো মেসিন-গান ছুঁড়লে ফল হ'লেও হ'তে পারে।"

—"আচ্ছা, আগে তাকে কোণ-ঠাসা করা যাক্।"

একজন সার্জেন্ট্ বললে, "কিন্তু আমরা যে তার নাগালই ধরতে পারছি না।"

দূর থেকে আবার অনেকগুলো বন্দুকের শব্দ শোনা গেল।

—"ওরা বোধহয় তাকে দেখেছে। ঐদিকে গাড়ী চালাও।"

গাড়ী পার্ক স্ট্রীট পার হ'তেই একজন পাহারাওয়ালা খবর দিলে, কঙ্ যাদুঘরের ছাদে গিয়ে চড়েছে।

যাদুঘরের কাছে গিয়ে দেখা গেল, কঙ্ সেখানেও নেই।

কমিশনার বললেন, "হতভাগাটা আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারবে দেখছি। ও যে কোথায় যেতে চায়, কিছুই যে বোঝা যাচ্ছে না।"

ডেন্‌হাম্ বললে, "আমার বোধহয় সে খুব-একটা উঁচু জায়গা খুঁজছে।

কঙ্ পাহাড়ের জীব। উঁচুতে উঠতে পারলেই সে বোধহয় মনে করে, শত্রুরা তার কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না।"

কমিশনার বললেন, "খুব সম্ভব তাই। কঙ্ বোধহয় উঁচু জায়গাই খুঁজছে। তাহ'লে অক্টারলনি মনুমেণ্টই হচ্ছে তার যোগ্য জায়গা!"

একজন ইন্‌স্পেক্টর বললে, "রাস্তার ভিড় কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের কাছে গিয়ে জমেছে। কঙ্ বোধহয় ঐখানেই আছে।"

মোটরগুলো আবার ছুটলো।

একটু গিয়েই এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল।

হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল-র উঁচু গম্বুজের উপর থেকে হাত-পা দিয়ে দেওয়াল জড়িয়ে বিরাট ও কৃষ্ণবর্ণ এক দৈত্য-মূর্তি নিচের দিকে নেমে আসছে।

ডেন্‌হাম্ বললে, "কি আশ্চর্য! কঙ্ যে টিকটিকির মত দেওয়াল বেয়ে নেমে আসছে।

কঙ্ খানিকটা নেমে এসেই পথের উপর লাফিয়ে পড়ল। একবার চারদিকে চেয়ে দেখে মেঘ-গর্জনের মত চিৎকার করলে। রাজপথের জনতা চোখের নিমিষে অদৃশ্য হয়ে গেল!

কঙ্ এক লাফে চৌরঙ্গী রোড পার হ'ল। পথের পাশে একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল, বিষম আক্রোশে কঙ্ সেখানা একহাতে তুলে নিয়ে ছোট্ট একটা দিয়াশলাইয়ের বাক্সের মতই ছুঁড়ে ফেলে দিলে— গাড়ীখানা শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে শোভাবাজারের খেলার মাঠের উপরে গিয়ে প'ড়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল!

ততক্ষণে মেসিন-গান এসে প'ড়েছিল। জনকয় লোক সেই কলের কামান চালাবার উপক্রম করাতে কমিশনার বাধা দিয়ে বললেন, "কামান ছুঁড়ো না। ওর হাতে একটি মহিলা রয়েছেন।"

কঙ্‌য়ের হাতের চেটোয় মালবিকাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বাড়ির দেওয়াল ব'য়ে নামবার সময়েও কঙ্ তার এ হাতখানা ব্যবহার করেনি।

আরো গোটাকয়েক লাফ—কঙ্ একেবারে মনুমেণ্টের কাছে গিয়ে

হাজির!

কমিশনার বললেন, "যা ভেবেছি তাই! দেখ, দেখ, জানোয়ারটা মনুমেণ্ট জড়িয়ে কত তাড়াতাড়ি ওপরে উঠছে!"

একজন ইন্‌স্পেক্টর বললে, "এখন উপায়? ওকে কেমন ক'রে আমরা ধরব? সব-চেয়ে মুস্কিল হচ্ছে, ওকে গুলি ক'রেও মারতে পারব না। তা'হলে গুলি ঐ মেয়েটির গায়ে লাগতে পারে!"

কাপ্তেন বললেন, "এরোপ্লেন আনলে কেমন হয়?"

কমিশনার বললেন, "ঠিক বলেছ। আমরা সেই ব্যবস্থাই করব। ওর কাছে যাবার আর কোন উপায় নেই!"

শোভন বললে, "মিঃ ডেন্‌হাম্, আমাকে আর একবার কঙ্‌য়ের কাছে যেতে হবে!"

—"কেমন ক'রে যাবেন?"

—"আমি মনুমেণ্টের ভিতর দিয়ে উপরে উঠব। তাহ'লে হয়তো মালবিকাকে আবার বাঁচালেও বাঁচাতে পারি।"

—"আচ্ছা, চলুন,—আমি আপনার সঙ্গে যাব।"

কঙ্ তখন মনুমেণ্টের আধা-আধি পার হয়ে গেছে। সে এক-একবার নিচের দিকে তাকায়, গর্জন করে, আবার উপরে উঠে। তার চেহারা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে,—উচ্চতার জন্যে!

শোভন ও ডেন্‌হাম্ মনুমেণ্টের নোংরা ও অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে লাগল। তাদের খালি ভয় হ'তে লাগল যে, কঙ্‌য়ের প্রকাণ্ড দেহের ভার সইতে না পেরে মনুমেণ্টের এই পুরানো ইটের গাঁথুনি যদি হুড়্‌মুড়্ ক'রে ভেঙ্গে প'ড়ে! তাহ'লেই তো সব শেষ। কঙ্ মরবে,—মরুক্‌গে। কিন্তু সেই সঙ্গে মালবিকাও মরবে, তারাও বাঁচবে না! কঙ্‌য়ের দেহের দাপট সইতে না পেরে মনুমেণ্ট যেন ভয়ে থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে, এটা তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই অনুভব করতে পারছিল।

মনুমেণ্টের নিচেকার বারান্দায় এসেই তারা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে

পড়ল। কঙ্‌য়ের বিপুল উদর তাদের দৃষ্টি-সীমা একেবারে রোধ ক'রে দিয়েছে! কঙ্‌য়ের এত কাছে তারা আর কখনো আসেনি।
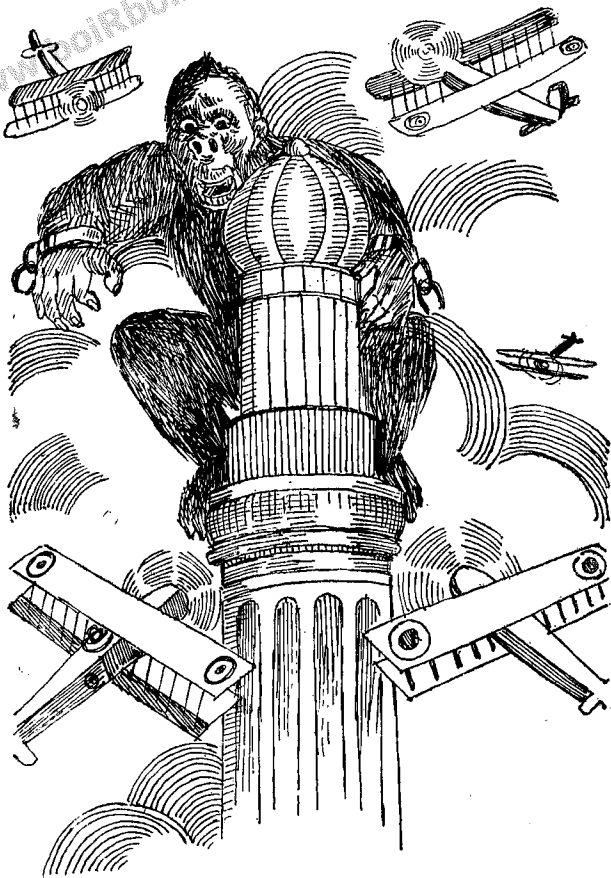
কঙ্ তার মস্ত-বড় দুই উরু ও পা দিয়ে মনুমেণ্টের উপর দিকটা জড়িয়ে ব'সে আছে—তার দেহের উপর-অংশ তারাও দেখতে পেলে

না, এবং তার কোলের কাছে যে দুটো মানুষ-পোকা এসে দাঁড়িয়ে আছে, কঙ্‌ও সেটা মোটেই টের পেলে না!

বাইরে তিন-চারখানা এরোপ্লেনের গর্জন শোনা গেল। এবং এটাও বোঝা গেল যে, উড়ো-জাহাজগুলো কঙ্‌য়ের খুব কাছে এসেই উড়ছে।

বোধহয় এই নূতন শত্রুর আবির্ভাবে কঙ্‌ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে! আচম্বিতে তার একখানা মস্ত হাত নিচে নেমে এল, তার মুঠোয় দেখা গেল মালবিকাকে! শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময়ে কঙ্‌ বরাবরই মালবিকাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রাখে! এবারেও বোধহয় সেই কারণেই সে মনুমেন্টের নিচেকার বারান্দায় মালবিকার অচেতন দেহকে শুইয়ে রেখে দিলে!

কিন্তু কঙ্‌ জানতেও পারলে না যে, দুটো মানুষ-পোকা বারান্দা থেকে আবার তার পুতুল-মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেল! শোভন আবার কঙ্‌য়ের চোখে ধুলো দিয়ে মালবিকাকে উদ্ধার করলে!

চৌরঙ্গীর মোড়ে তখন সারা কলকাতা শহর ভেঙ্গে পড়েছে।

পা দিয়ে মনুমেন্ট জড়িয়ে ব'সে আছে রাজা কঙ্‌, সগর্বে তার মাথাটা শূন্যে তুলে! তার চারিপাশ দিয়ে চারখানা উড়ো-জাহাজ ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করছে—আসছে আর চ'লে যাচ্ছে, আসছে আর চলে যাচ্ছে! কঙ্‌ ভাবলে, নিশ্চয় এগুলো কোন অজানা উড়ো জন্তু,—গর্জন ক'রে তাকে লড়াই করতে ডাকছে! বেশ তো, লড়াই করতে সে কোন দিনই পিছপাও হয়নি! এতক্ষণ হাতের সেই পুতুল-মেয়েটার জন্যেই তার যা-কিছু ভাবনা ছিল, এখন সে তাকে সরিয়ে রেখে হাত খালি করেছে! এইবার সে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত! উড়ো-জাহাজের গর্জনের উত্তরে কঙ্‌ও দুই হাতে বুক চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে হুঙ্কার দিয়ে উঠল!

কঙ্‌ দেখলে একটা উড়ো জন্তু তার খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছে! বিদ্যুতের মত তার একখানা হাত তার দিকে এগিয়ে গেল এবং পর-মুহূর্তে উড়ো-জাহাজখানা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পৃথিবীর দিকে গোঁৎ খেয়ে পড়ে গেল।

কঙ্‌য়ের শক্তি ও বাহাদুরি দেখে সারা কলকাতা থ!

মাটিতে পড়বার আগে উড়ো-জাহাজের ভিতর থেকে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠল। মানুষের চোখ যেমন কঙ্-য়ের মতন দানব দেখেনি, কঙ্-য়ের চোখও তেমনি এমন কোন উড়ো জন্তু দেখেনি, যার মুখ দিয়ে এ-রকম হু হু ক'রে আগুন বেরোয়। সে কিছু ভড়্কে গেল। বোধহয় ভাবলে, ভাগ্যিস্—ও আগুন তার হাত কাম্ড়ে দেয়নি! আগুন যে কি ভয়ানক কাম্ড়ে দেয়, কঙ্ তা জানে!

আরে মোলো! একটা সঙ্গীর দুর্দশা দেখেও ও-তিনটে উড়ো জন্তু ভয় পেলে না! আবার তাকে জ্বালিয়ে মারতে আসছে। কঙ্ চ'টে-ম'টে তাদের ধরবার জন্যে একবার এদিকে, আর-একবার ওদিকে লম্বা লম্বা হাত বাড়াতে লাগল।

উড়ো-জাহাজগুলো এবারে সাবধান হয়েছে—তারা আর কঙ্-য়ের নাগালের ভিতর এল না।

কিন্তু নাগালের বাইরে থেকেই এবারে তারা অব্যর্থ মৃত্যুবাণ ছাড়তে লাগল! একখানা ক'রে উড়ো-জাহাজ কঙ্-য়ের কাছে আসে, এক সেকেণ্ডের জন্যে থামে, সাংঘাতিক কলের কামান ছোঁড়ে, আর চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই সাঁৎ ক'রে স'রে যায়!

কঙ্ চেয়ে দেখলে, তার সারা দেহ বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে এবং তার দেহের রক্ত-স্রোত মনুমেণ্টের মাথা রাঙা ক'রে গড়িয়ে পড়ছে।

মেসিন-গান, কঙ্ ও উড়ো-জাহাজের গর্জনে আকাশের বুক যেন ফেটে যাবার মত হ'ল।

কঙ্-য়ের দৈত্য-দেহ মনুমেণ্টের উপর টল্‌তে লাগল—রক্তধারার সঙ্গে তার সমস্ত শক্তি যেন শরীর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু উড়ো জন্তুগুলোর দয়া নেই—তাদের মৃত্যু-ভরা তপ্ত দংশন অদৃশ্য ভাবে কঙ্-য়ের দেহের উপরে এসে পড়ছে।

ক্রোধোন্মত্ত কঙ্ শেষটা আর সহ্য করতে পারলে না—হঠাৎ একখানা উড়ো-জাহাজকে ধরবার জন্যে সে শূন্যে এক মস্ত লম্ফ ত্যাগ করলে—উড়ো-জাহাজ আবার সাঁৎ ক'রে তার হাতের সীমানার বাইরে বেরিয়ে

গেল এবং মূর্তিমান একটা ধূমকেতুর মতন কঙ্‌য়ের বিপুল দেহটা এসে ভীষণ শব্দে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল !

রাজা কঙ্‌ আর তার পুতুল-মেয়েকে দেখবার জন্যে চোখ মেলে তাকায়নি !

আলো দিয়ে গেল যাঁরা

সাতহাজারের আত্মদান

আজ তোমাদের কাছে অতীত ভারতের এক বিচিত্র গৌরব-কাহিনী বলব। প্রায় দুই হাজার সাড়ে তিন শো বৎসর আগেকার কথা। কিন্তু রূপকথা নয়, সত্য কথা।

তোমরা সবাই জানো, প্রাচীন হিন্দু ভারতবর্ষে কেউ ইতিহাস লিখত না, তাই আমাদের অধিকাংশ কীর্তিকলাপ চিরকালের জন্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। আজকের ঐতিহাসিকরা মাটি খুঁড়ে সেকালের নানা জিনিস ও ভাঙা স্তূপ আবিষ্কার ক'রে এবং পাথরের লিখন ও পুরাতন মুদ্রা প্রভৃতি দেখে প্রাচীন ভারতের কিছু কিছু ইতিহাস জানতে পেরেছেন বটে, কিন্তু সে আর কতটুকু? শতাংশের একাংশও নয়। রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা হিন্দু ভারতবর্ষকে দেখতে পাই; কিন্তু তাদের মধ্যে আছে কতখানি ইতিহাস আর কতখানি কবিকল্পনা, সে-সত্য আর কিছুতেই বোঝবার উপায় নেই।

আজ যে সত্য গল্পটি বলব, সেটিও আমরা বলতে পারতুম না—গ্রীক ঐতিহাসিকরা যদি তা লিখে না রাখতেন। প্রাচীন ভারতের সত্যিকার ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে গ্রীক ঐতিহাসিকদেরই দৌলতে। তাঁরা না থাকলে পুরুর বীরত্ব, চন্দ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়, অশোকের মাহাত্ম্য এবং বিপুল মৌর্য সাম্রাজ্যের অসাধারণতার কথা আজ আমরা এত ভালো ক'রে জানতে পারতুম না। এজন্যে গ্রীক ঐতিহাসিকদের কাছে আমাদের চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে হবে।

যখনকার কথা বলছি, তখন গ্রীক দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার এসেছেন ভারত জয় করতে। তখন তিনি ভারতের যে-প্রান্তে অবস্থান করছিলেন, আজ সে-স্থানকে আমরা আফগানিস্থান ব'লে ডাকি। কিন্তু সে-সময়ে

ওখানে বাস করত কেবল হিন্দুরাই। পৃথিবীতে তখন একজনও মুসলমান ছিল না, কারণ মুসলমান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদই জন্মেছিলেন আরো নয় শতাব্দী পরে।

ভারত-সীমান্তে তখন মাসাগা নামে একটি প্রকাণ্ড নগর ও সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। মাসাগা নামটি হচ্ছে গ্রীক। তার এদেশী নাম কি ছিল, জানা যায় না। মাসাগার রাজা ছিলেন বীর ও স্বদেশভক্ত। আলেকজাণ্ডারের বিপুল সৈন্যবল দেখেও তিনি ভয় পেলেন না, অসম্ভবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে জেনেও, ভারতের প্রবেশ-পথে বিদেশী ও বিধর্মী শত্রুকে বাধা দিলেন প্রচণ্ড বিক্রমে।

আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে ছিল লক্ষাধিক সৈন্য। কেউ বলেন, দেড় লক্ষ; কেউ বলেন, আরো বেশী। তারা মাসাগা দুর্গকে চারিধার থেকে ঘিরে ফেললো।

দুর্গ বেষ্টন ক'রে ছিল ইঁট, পাথর ও কাঠে গড়া উঁচু এক প্রাচীর।

তারই আড়ালে ব'সে মাসাগার সৈন্যরা দুর্গ রক্ষা করতে লাগল, দিনের পর দিন।

গ্রীকরা দিকে দিকে দুর্গের প্রাচীরের চেয়ে উঁচু সব মঞ্চ তৈরি ক'রে কেল্লার ভিতরে রাশি রাশি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগল।

মাসাগার এক ধনুকধারী একদিন দুর্গ-প্রাচীরে ব'সে আলেকজাণ্ডারকে দেখতে পেলে। তখনি ধনুক তুলে লক্ষ্য স্থির ক'রে সে তীর ছুঁড়লে। তীর সোজা গিয়ে আঘাত করলে আলেকজাণ্ডারকে। গ্রীক সৈন্যরা সভয়ে হাহাকার ক'রে উঠল। তারপর দেখা গেল, আলেকজাণ্ডার আহত হয়েছেন বটে, কিন্তু মারাত্মক ভাবে নয়। তীর যথাস্থানে গিয়ে বিঁধলে গ্রীকদের দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন ফুরিয়ে যেত সেই দিনেই।

কিন্তু ভাগ্যদেবী ভারতবর্ষের প্রতি এমন সুপ্রসন্ন হ'লেন না। হঠাৎ একদিন মাসাগার রাজা শত্রুদের মঞ্চের উপর থেকে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে আহত হয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়লেন এবং সেই বীর-শয্যা ছেড়ে আর উঠলেন না। রাজার মৃত্যুতে মাসাগার সৈন্যরা হতাশ হয়ে খুলে দিলে

দুর্গদ্বার।

মাসাগার পতন হ'ল—গ্রীকদের সামনে খুলে গেল ভারতের সিংহদ্বার।

মাসাগার বিধবা রাণী রাজকুমারের হাত ধ'রে আলেকজাণ্ডারের সামনে এসে মার্জনা প্রার্থনা করলেন।

আলেকজাণ্ডার তাঁকে কেবল মার্জনাই করলেন না, রাণীর রূপ দেখে তাঁকে বিয়েও ক'রে ফেললেন।

রাণীর দেশী নাম জানি না, কিন্তু গ্রীক ইতিহাসে তাঁকে ক্লিওফিস ব'লে ডাকা হয়। যদিও তখনকার ভারতে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, তবু খুব সম্ভব আলেকজাণ্ডার তাঁকে জোর ক'রেই বিবাহ করেছিলেন। অবশ্য সেকালে দুই জাতির মধ্যে এ-রকম বিবাহের সম্পর্কও খুব-একটা নতুন ব্যাপার ছিল ব'লে মনে হয় না। কারণ, এরই কয়েক বৎসর পরে ভারত-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তও বিবাহ করেছিলেন আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলিউকাসের মেয়েকে।

ক্লিওফিসের গর্ভে আলেকজাণ্ডারের যে ছেলে হয়, তারও নাম আলেকজাণ্ডার। কিন্তু এ-সব কথা এখন থাক্।

গ্রীকদের বাধা দেবার জন্যে মাসাগার রাজা পঞ্চনদের দেশ বা পাঞ্জাব থেকে কয়েক হাজার হিন্দু সৈন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। এরা ছিল যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, অর্থাৎ মাহিনা পেলে এরা যে-কোন রাজার হয়ে লড়াই করত। সেকালে এমন পেশাদার সৈন্য পৃথিবীর সব দেশেই ছিল। পারস্য-সম্রাট্ দরায়ুসের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের যখন যুদ্ধ হয়, তখন পার্সীদের হয়ে অস্ত্রধারণ করেছিল প্রায় ত্রিশ হাজার হিন্দু সৈন্য।

কিন্তু ভারতের পঞ্চনদের তীর থেকে যে-সব পেশাদার সৈন্য মাসাগার দুর্গ রক্ষা করতে গিয়েছিল, পেটের দায়কেই তারা যে বড় ক'রে দেখেনি, গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখনী সে-কথা স্পষ্ট ভাষায় লিখে রেখেছে।

মাসাগার পতনের পরে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ভারতীয় সৈন্যরা মাসাগা থেকে

বেরিয়ে নয় মাইল দূরে গিয়ে একটি ছোট পাহাড়ের উপরে তাঁবু ফেললে। সংখ্যায় তারা সাত হাজার। সেকালের প্রথামত তাদের সঙ্গে ছিল স্ত্রী পুত্র-কন্যা প্রভৃতি। পরিবারবর্গ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার প্রথা ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। যুদ্ধে পরাজিত পক্ষের নারীদের অবস্থা যে কি শোচনীয় হ'ত, ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাসাগার ভারতীয় সৈন্যদের দলপতির নাম কি ছিল, গ্রীক ইতিহাস তা বলেনি। আমরা তাঁকে উপগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রীকে ধীরা ব'লে ডাকব।

আলেকজাণ্ডারের কাছ থেকে দূত এসে জানালে, "উপগুপ্ত, আমাদের সম্রাট্ তোমাদের কোন অনিষ্ট করবেন না। কিন্তু তোমাদের সাহায্য তিনি চান।"

উপগুপ্ত বিস্মিত স্বরে বললেন, "গ্রীক সম্রাট্ চান আমাদের সাহায্য! তার মানে?"

—"সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার উপযুক্ত বেতন দিয়ে তোমাদের গ্রহণ করতে চান।"

—"অর্থাৎ তোমাদের সম্রাটের ইচ্ছা, আমরা ভারতবাসী হয়েও ভারতবাসীর সঙ্গে লড়াই করব?"

—"হ্যাঁ।"

—"অসম্ভব!"

—"কেন? তোমরা তো পেশাদার।"

—"হ'তে পারে যুদ্ধ আমাদের পেশা। সেটা হচ্ছে পেটের দায়ে। কিন্তু পেটের দায়ে হিন্দু হয়েও আমরা হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারব না।"

—"পেশাদার সৈনিকদের স্বদেশ নেই। বহু গ্রীক পার্সীদের মাহিনা খেয়ে গ্রীসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে।"

—"গ্রীকরা যা পারে, হিন্দুরা তা পারে না।"

—"বেশ। তাহ'লে সম্রাটের কাছে গিয়ে তোমার কথা জানাইগে।"

পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে উপগুপ্ত দেখলেন, দূরের এক শৈল-শিখরের পিছনে সূর্য ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। নিচে নদী, বন, উপত্যকার উপরে দুলছে কুয়াশার স্বচ্ছ পর্দা। এখনি চারিদিকে বিছিয়ে যাবে সন্ধ্যার কালো অঞ্চল।

কয়েকজন সৈনিক কাছে এসে দাঁড়াল। একজন জিজ্ঞসা করলে, "সর্দার, গ্রীক দূত কি বলতে এসেছিল?"

উপগুপ্ত বললেন, "গ্রীক সম্রাট্ আমাদের চাকরি দিতে চান।"

সৈনিকরা একসঙ্গে চিৎকার ক'রে উঠল, "আমরা যবনের চাকরি করব না।"

সেই চিৎকার শুনে শিবিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ধীরা।

উপগুপ্ত তাঁর দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললেন, "শুনছ ধীরা! অত বড় যে গ্রীক সম্রাট্, সৈনিকরা তাঁরও অধীনে চাকরি করতে চায় না!"

ধীরা জ্বলন্ত চক্ষে বললেন, "গ্রীক সম্রাটের চাকরি করার মানেই হচ্ছে হিন্দুস্থানের শত্রু হওয়া। স্বামী, আমিও সৈনিকদের পক্ষে।"

উপগুপ্ত তেমনি হাস্যমুখেই বললেন, "দেখছি তোমরা সকলেই একমত! খুব ভালো! আমিও তাই বলি। বেশ, আপাতত তোমরা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নাও। আজ শেষ-রাতেই আমরা তাঁবু তুলে দেশে ফিরে যাব।"

ধীরা বললেন, "তারপর নূতন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গ্রীক সম্রাট্কে অভ্যর্থনা করব!"

সৈনিকরা উচ্চকণ্ঠে বললে, "জয়, হিন্দুস্থানের জয়!"

নিজের শিবিরে ব'সে আলেকজাণ্ডার হয়তো সেই জয়ধ্বনি শুনতে পেলেন।

মধ্য রাত্রি। আকাশের চাঁদ যেন কি এক আসন্ন অশুভের আশঙ্কায় পাণ্ডু মুখে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে! পৃথিবীও যেন ভয়ে বোবা! কেবল বনের গাছে গাছে, পাতায় পাতায় শোনা যাচ্ছে বাতাসের অস্ফুট

আর্তনাদ।

আচম্বিতে নিশীথিনীর স্তব্ধ বুক কেঁপে উঠল অসংখ্য কণ্ঠের বিকট হুঙ্কারে ও কাতর চিৎকারে। চারিদিকে পদশব্দ, অস্ত্রাঘাতের ধ্বনি।

ধীরা ধড়মড় ক'রে বিছানার উপরে উঠে বসলেন। কান পেতে বাইরের সেই ভয়াবহ গোলমাল শুনলেন। তারপর তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে গেলেন।

মিনিট-খানেক পরেই বেগে আবার তাঁবুর ভিতরে ফিরে এসে ধীরা দেখলেন, উপগুপ্ত জেগে হতভম্বের মত ব'সে আছেন।

ধীরা ব্যস্ত স্বরে বললেন, "স্বামী, স্বামী! গ্রীকরা আমাদের গোপনে আক্রমণ করেছে! ঘুমন্ত হিন্দুদের হত্যা করছে!"

তাঁবুর বাহির থেকে হিন্দু সৈনিকদের চিৎকার শোনা গেল— "বিশ্বাসঘাতকতা, বিশ্বাসঘাতকতা!"

—"অস্ত্র ধর, অস্ত্র ধর!"

ততক্ষণে উপগুপ্ত তরবারি ও বর্শা নিয়ে তাঁবুর দরজার কাছে গিয়ে

দাঁড়িয়েছেন। সেইখান থেকে তিনি ফিরে বললেন, "কিন্তু ধীরা, তুমি যে একলা থাকবে?"

ধীরা হেঁট হয়ে মেঝে থেকে একখানা তরবারি তুলে নিয়ে বললেন, "যাও প্রভু, যুদ্ধ কর। আমি একলা নই—এই তরবারিই আমার সঙ্গী, আমার রক্ষাকর্তা।"

উপগুপ্ত বাহিরে গিয়ে দাঁড়াতেই দু'জন গ্রীক তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হ্যাঁ, ঝাঁপিয়ে পড়ল; কিন্তু তাঁর উপরে, না মৃত্যুমুখে? কারণ পরমুহূর্তেই দেখা গেল, উপগুপ্তের বর্শা ও তরবারির রক্তাক্ত চিহ্ন বক্ষে ধারণ ক'রে দু'জন গ্রীকই মাটিতে প'ড়ে ছট্‌ফট্ করছে!

উপগুপ্ত তাকিয়ে দেখলেন, কেবল পাহাড়ের উপরে নয়—নিচে, সমতল ক্ষেত্রে যতদূর চোখ যায় ততদূর পরিপূর্ণ ক'রে ছুটে আসছে হাজার হাজার গ্রীক সৈন্য—সে যে কত হাজার, তার সংখ্যাই হয় না। চাঁদের ও শত শত মশালের আলোতে অগণ্য বিদ্যুৎ-রেখার মত জ্ব'লে উঠছে তাদের অস্ত্র-ফলকগুলো।

একদল গ্রীক সৈন্য উপগুপ্তের দিকে এগিয়ে এল। হিন্দুরাও তখন সজাগ ও প্রস্তুত হয়ে তাদের সর্দারের দুই পাশে এসে দাঁড়াল।

সেনানীর পোশাকপরা এক গ্রীক বললে, উপগুপ্ত, এখনো আমাদের কথা শুনলে তোমাদের ক্ষমা করা হবে।"

উপগুপ্ত অবহেলার হাসি হেসে বললেন, "বিশ্বাসঘাতক দস্যুর দল! তোদের কথা শুনব? স্বদেশের শত্রু হব? কখনো নয়—কখনো নয়!"

দলে দলে হিন্দু প্রতিধ্বনি ক'রে আকাশ কাঁপিয়ে বললে, "কখনো নয়—কখনো নয়!"

তারপরেই পিছন থেকে তীব্র নারী-কণ্ঠে শোনা গেল—"ছুটে এস হিন্দুনারী, ছুটে এস! মান রাখো, প্রাণ দাও, যবন মারো!"

সকলে ফিরে বিস্ময়মুগ্ধ চোখে দেখলে,—দলে দলে হিন্দুস্থানের বীর-মেয়ে কেউ তরবারি, কেউ বর্শা, কেউ অন্য অস্ত্র নিয়ে দ্রুতপদে গ্রীকদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—তাদের পুরোভাগে ধীরার মহিমময়ী মূর্তি!

পর-মুহূর্তে যেখানে যত হিন্দু সৈনিক ছিল, জাগ্রত সিংহের মতন গর্জন ক'রে গ্রীকদের উপরে লাফিয়ে পড়ল।

উপগুপ্ত দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, "আমরা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, যুদ্ধ করতে করতেই মরব—প্রাণ থাকতে দেশের শত্রু হব না। জয়, হিন্দুস্থানের জয়।"

তারপর যে দৃশ্যের অবতারণা হ'ল ভাষায় তা বর্ণনা করা অসম্ভব!

এক-একজন হিন্দুর বিরুদ্ধে দশ-দশজন গ্রীক। তবু আর্তনাদ উঠল কেবল গ্রীকদেরই দলে; হিন্দুরা প্রাণ নিতে ও প্রাণ দিতে লাগল হিন্দুস্থানের জয় গাইতে গাইতে।

দেখতে দেখতে গ্রীক সৈন্য-সাগরের মধ্যে ছোট নদীর ধারার মত ভারতের বীরপুরুষ ও বীরবালার দল কোথায় হারিয়ে গেল—কিন্তু তখনো শোনা যেতে লাগল অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার, হিন্দু নর-নারীদের অনাহত চিৎকার, "আমরা প্রাণ দেব, মান দেব না।"

পেটের দায়ে তারা মান বিক্রয় করলে না, হিন্দুস্থানের জন্যে প্রাণই দান করলে। এও আমাদের কথা নয়, গ্রীক ঐতিহাসিক Arrian-এর কথা।

পরদিন প্রভাতের সূর্য উঠে অবাক্ হয়ে দেখেছিল, ভারতবর্ষের সাতহাজার বীরপুরুষের মৃতদেহ; এবং তাদের আশেপাশে চিরনিদ্রার কোলে আশ্রয় নিয়েছিল শত শত বীরনারী। তাদের একজনও আত্মসমর্পণ করেনি।

কোন্ দেশের ইতিহাসে স্বদেশানুরাগের এর চেয়ে গৌরবময় কাহিনী আছে? অথচ হিন্দু-বীরত্বের এই অপূর্ব কাহিনী আজকের হিন্দু ছেলে-মেয়েদের কাছে কেউ বলে না। এ গল্প শুনিয়েছেন গ্রীকরাই—

আমাদের লজ্জার কথা!

আলেকজাণ্ডারের পলায়ন

ভারতের শাসনদণ্ড হস্তগত ক'রে ইংরেজ আমাদের কি শিক্ষা দিতে চেয়েছিল ?

'শৌর্যে-বীর্যে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে—সব দিক দিয়েই শ্বেতাঙ্গরা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ এবং কৃষ্ণাঙ্গরা হচ্ছে নিকৃষ্ট।'

কালি-কলমে ভারতের আধুনিক ইতিহাস আরম্ভ হয় গ্রীক দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই।

এবং তখন থেকেই ইংরেজী ইতিহাস আমাদের সগর্বে জানিয়ে দিতে চেয়েছে—আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ জয় ক'রে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন সগৌরবে।

কিন্তু নিরপেক্ষ ইতিহাস কি বলে ?

আলেকজাণ্ডার ভারতে প্রবেশ করলেন এক লক্ষ বিশ হাজার পদাতিক ও পনেরো হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে (গ্রীক লেখক প্লুটার্কের মতে)। তারপর একে একে কয়েকজন ছোট ছোট নগণ্য রাজাকে হারাতে হারাতে এগিয়ে চললেন। প্রায় প্রত্যেক পরাজিত রাজাই তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে বাধ্য হলেন—ফলে গ্রীক সৈন্যেরা দলে রীতিমত ভারি হয়ে উঠল। তারপর এই বিপুল বাহিনী নিয়ে আলেকজাণ্ডার আক্রমণ করলেন রাজা পুরুকে। তিনিও একজন স্থানীয় রাজা মাত্র—তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল মোট পঞ্চাশ হাজার। কাজেই পুরুও গ্রীক শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলেন না।

এই যুদ্ধ "ঝিলামের যুদ্ধ" নামে বিখ্যাত এবং এইটিই হচ্ছে ভারতের ভিতরে আলেকজাণ্ডারের সব চেয়ে বড় যুদ্ধ। বিদেশী ঐতিহাসিকদের অত্যুক্তির ফলে ঝিলামের যুদ্ধ ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনায় পরিণত

হয়েছে।

কিন্তু ঝিলামের যুদ্ধ যে বিশেষভাবে স্মরণীয় নয়, আজ এই সত্য উপলব্ধি করবার সময় এসেছে। দুর্বল পুরু এবং প্রবল আলেকজাণ্ডার! এ তো কাঁসার বাসনের সঙ্গে মাটির বাসনের ঠোকাঠুকি। পুরু তো আলেকজাণ্ডারের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। ঝিলামের যুদ্ধও ওয়াটার্লু, অষ্টারলিট্‌জ, পাণিপথ বা পলাশীর যুদ্ধের মত চরম যুদ্ধ নয়। তার ফলে আসল ও বৃহত্তর ভারতবর্ষের পতন হয়নি। ঝিলামের যুদ্ধের ফলে আলেকজাণ্ডারের হস্তগত হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক অংশ মাত্র।

আলেকজাণ্ডারের জীবনীলেখক প্লুটার্ক বলেছেন, প্রথম যৌবনে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবিরে গিয়ে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত তখন সহায়সম্পদহীন, মগধ থেকে নির্বাসিত। পিতৃরাজ্য মগধ পুনরুদ্ধার করবার জন্যেই তিনি অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন গ্রীক দিগ্বিজয়ীকে।

তিনি বলেছিলেন, "মগধ-সাম্রাজ্যই হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আর শক্তিশালী। ভারতবর্ষ জয় করতে হ'লে আগে আপনাকে পরাজিত করতে হবে নন্দ রাজাকে।"

আলেকজাণ্ডার তখন মুখে কিছু না বললেও মনে মনে যে সেই প্রস্তাবই কার্যে পরিণত করবেন ব'লে স্থির করেছিলেন, এমন অনুমানের কারণ আছে।

"শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্!" আলেকজাণ্ডারের মত রণকৌশলী সেনাপতির কাছে এটা অজ্ঞাত ছিল না যে, একেবারে মগধ-সাম্রাজ্যের উপরে গিয়ে হানা দিলে পিছনে থেকে যাবে অনেক অপরাজিত শত্রু। একসঙ্গে সামনে ও পিছনে শত্রু রাখার মত নির্বুদ্ধিতা আর নেই। তাই গন্তব্য পথের আশপাশে পড়ল যে সব ছোট ছোট রাজার রাজ্য, আলেকজাণ্ডার আগে তাদের দমন করতে লাগলেন।

তারপর যখন পুরুর পতন হ'ল, আলেকজাণ্ডার তখন বুঝলেন যে, ঝিলামের যুদ্ধ বিশেষ বড় যুদ্ধ না হ'লেও এর ফলে তাঁর পিছনে আর

কোন শত্রুর মত শত্রু রইল না। এইবার নির্বিঘ্ন হ'ল তাঁর মগধ যাত্রার বা ভারত-বিজয়ের পথ।

বর্তমান গুরুদাসপুর ও কাংগ্রা জেলার মাঝখানে যেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে 'বিয়াস' বা বিপাশা নদী, আলেকজাণ্ডার অগ্রসর হয়ে তারই তীরে শিবির স্থাপন করলেন।

গ্রীক দিগ্বিজয়ীর চোখের সামনে নাচতে লাগল পারস্য-সাম্রাজ্যের পর ভারত-সাম্রাজ্যের সম্রাট্ উপাধি।

নূতন ক'রে যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হ'ল। ভারতীয় রাজারা আরো সৈন্য সাহায্য পাঠাতে লাগলেন, এমন কি পরাজিত রাজা পুরুও এলেন পাঁচ হাজার সৈন্য ও রণহস্তী প্রভৃতি নিয়ে স্বয়ং। দু'দিন আগেই যিনি স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে প্রাণপণে অস্ত্রধারণ করেছিলেন, যবনের পক্ষ নিয়ে আজ তিনি হলেন ভারতবর্ষের শত্রু!

পুরুকে আমরা স্বদেশপ্রেমিক বীর ব'লে অতুলনীয় সম্মান দিয়েছি, কিন্তু তাঁর চরিত্রের এই দুর্বলতার দিকে আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়নি।

আসলে সে যুগের স্বদেশপ্রেমই ছিল এমনি সংকীর্ণ। তখনকার রাজারা স্বদেশ বলতে বুঝতেন কেবল নিজের রাজ্যটুকুই। ভারতবর্ষকে বৃহত্তর জন্মভূমি ব'লে তাঁরা ধারণায় আনতে পারতেন না।

অনতিবিলম্বেই এই সত্য প্রথম বুঝিয়েছিলেন সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত, একচ্ছত্রের ছায়ায় এনে সমগ্র ভারতবর্ষকে। তিনিও পুরুর যুগের লোক, কিন্তু বিপুল প্রতিভার অধিকারী, তাই তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রশস্ত।

চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্ধন প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখেও ভারতবাসীরা কিছুই শিক্ষালাভ করেনি। আবার বার বার তারা একতার বন্ধনকে অস্বীকার করেছে এবং সেই সুযোগেই ভারতবর্ষে ইস্‌লাম এবং ব্রিটিশ-সিংহের প্রবেশ।

যবনের কাছে নতি স্বীকার ক'রে পুরু যথেষ্ট লাভবানও হয়েছিলেন। পুরু ছিলেন ছোট রাজা, কিন্তু আলেকজাণ্ডার তাঁর হাতে সমর্পণ ক'রে

যান সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশ। তবে তাঁর এ সৌভাগ্য স্থায়ী হয়নি। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর কিছু পরেই ইউডেমস্ নামে এক দুরাত্মা গ্রীক সেনানী পুরুকে হত্যা ক'রে ভারত ছেড়ে পালিয়ে যায়।

প্লুটার্ক বলেছেন: "মগধ অধিকার করার পর চন্দ্রগুপ্ত নাকি বলতেন, আলেকজাণ্ডার ইচ্ছা করলে খুব সহজেই গোটা দেশটাকে দখল করতে পারতেন, কারণ দেশের সমস্ত লোকই নীচবংশজাত ও নিষ্ঠুরচরিত্র ব'লে রাজাকে (নন্দকে) ঘৃণা করত।"

কিন্তু এ-সব জেনে-শুনেও এবং মগধ আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েও আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর তীর থেকে আর অগ্রসর হলেন না কেন?

ভাগেলা নামে এক স্থানীয় রাজা সংবাদ দিলেন, "মগধের অধীশ্বরের অধীনে আছে বিশ হাজার অশ্বারোহী, দুই হাজার রথারোহী, তিন-চার হাজার গজারোহী ও দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য।" (ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ হিসাব ক'রে দেখিয়েছেন আসলে মগধপতির সৈন্যবল ছিল এই-রকম: ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, ছত্রিশ হাজার গজারোহী ও চব্বিশ হাজার রথারোহী, অর্থাৎ মোট ছয় লক্ষ নব্বই হাজার সৈন্য।)

রাজা পুরুও মগধপতির বিপুল সৈন্যবলের কথা স্বীকার করলেন।

আলেকজাণ্ডার মনে মনে নিশ্চয় চমকিত ও বিস্মিত হয়েছিলেন, তবে মুখে প্রকাশ করলেন না মনের ভাব। বাইরে তিনি করতে লাগলেন যুদ্ধের আয়োজন।

কিন্তু টনক নড়ল অন্যান্য গ্রীক সেনানী ও সৈন্যগণের। পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের অধিকারী রাজা পুরুকে বশ করতেই তাদের দস্তুর মত হিম্‌শিম্ খেতে হয়েছিল। তার আগে ও পরে নানা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের লোকক্ষয়ও হয়েছে যথেষ্ট। এখন এই রণক্লান্ত স্বল্পসংখ্যক লোক নিয়ে এই সুদূর বিদেশে প্রায় সাত লক্ষ তাজা ও শিক্ষিত সৈন্যের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা করতে হবে? না, অসম্ভব। দারুণ আতঙ্কে তাদের মন বিদ্রোহী

হয়ে উঠল। না, না, তারা আর অগ্রসর হতে পারবে না!

আলেকজাণ্ডারও ব্যাপারটা বুঝলেন। তিনি উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে সৈন্যদের সঙ্কুচিত বীরত্বকে আবার উৎসাহিত ক'রে তুলতে চাইলেন। বললেন, "এগিয়ে চল আমার সঙ্গে, সারা এশিয়ার ঐশ্বর্য আমি তোমাদের পায়ের তলায় বিছিয়ে দেব।"

কিন্তু কে বা শোনে কার কথা! সৈন্যেরা পাথরের মত নীরব ও নিশ্চল।

অনেকক্ষণ স্তব্ধতার পর এগিয়ে এলেন সেনাপতি কয়নস, ঝিলামের যুদ্ধে ইনিই পুরুর বিরুদ্ধে অশ্বারোহীদের চালনা করেছিলেন। তিনি বললেন, "মহারাজ, অতি জিনিসটা ভালো নয়, সমস্তরই সীমা আছে। ভেবে দেখুন মহারাজ, আমাদের কত সৈন্য রোগে বা যুদ্ধে মৃত আর কত লোক আহত হয়ে অকর্মণ্য। যারা এখনো সঙ্গে আছে তাদেরও স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে, তাদের পোশাক ছিন্নভিন্ন, অস্ত্রশস্ত্রও উন্নত নয়। এদের নিয়ে আবার অগ্রসর হ'লে নিয়তি আমাদের উপরে কখনোই প্রসন্ন হবে না।"

কয়নসের উক্তি শুনে সেনাদলের প্রত্যেকেই উচ্চকণ্ঠে তাঁকে অভিনন্দিত করলে।

সৈন্যদের এমন বিরুদ্ধতা কল্পনাতীত। আলেকজাণ্ডার একেবারে স্তম্ভিত। বুঝলেন এর পরেও গোঁ না ছাড়লে নিশ্চয়ই ওরা বিদ্রোহ প্রকাশ করবে! আর কয়নস্‌ও তো যুক্তিহীন কথা বলছেন না, তার যুক্তি উড়িয়ে দেওয়াও চলে না।

ভারতবর্ষ জয় করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল। তিনি আর একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ না ক'রে ধীরে ধীরে নিজের তাঁবুর ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। সেদিন গেল, তার পরের দিনও গেল, তাঁবুর ভিতর থেকে আলেকজাণ্ডারের কোন সাড়া নেই। বোধহয় তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন।

তৃতীয় দিনে তিনি আবার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

সুযোগ বুঝে সুবিধাবাদী গণৎকারের দল এসে জানালেন, "মহারাজ, গুণে দেখলুম আর অগ্রসর হ'লে অমঙ্গলের আশঙ্কা।"

আলেকজাণ্ডার নীরস কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ, আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। তাঁবু তোলো, ফিরে চল।"

কিন্তু প্রত্যাবর্তনের আগে আলেকজাণ্ডার আর একটি কাজ ক'রে গেলেন। ভারতের ভিতরে তিনি কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন তার নিশানা রাখবার জন্যে বিপাশা নদীর তীরে বারোজন দেবতার নামে প্রতিষ্ঠিত করলেন বারোটি বেদী। প্রত্যেক বেদীর উচ্চতা ছিল পঞ্চাশ ফুট। ঐ দ্বাদশ দেবতার মধ্যে ছিলেন আমাদের সূর্যদেবও। বেদী প্রতিষ্ঠার পর দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজা ও অর্ঘ্য নিবেদন করা হ'ল এবং সেই উপলক্ষে গ্রীকদের জাতীয় ক্রীড়াকৌতুকও বাদ গেল না।

তারপর আলেকজাণ্ডার করলেন স্বদেশের দিকে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু আমরা যদি এই প্রত্যাবর্তনের নাম দিই—পলায়ন, তাহ'লে অন্যায় হবে কি? আরব্ধ কার্য শেষ না ক'রে প্রত্যাবর্তনের নামান্তরই হচ্ছে পলায়ন। নেপোলিয়নের মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তনও কি পলায়ন নয়?

একজন নিরপেক্ষ গ্রীক ঐতিহাসিক স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: "মগধাধিপতির ভয়ে আলেকজাণ্ডার ভারত জয় না ক'রেই পলায়ন করেছিলেন।"

এইটেই হচ্ছে সত্যকথা। আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাব-বিজেতা মাত্র। এবং তাঁর পক্ষে তাও সম্ভবপর হ'ত কিনা সন্দেহ, একতাবদ্ধ পঞ্চনদে তখন যদি চন্দ্রগুপ্তের মত কোন বড় রাজা থাকতেন।

ওষ্ঠাধরে রাজদণ্ড

তোমরা অনেকেই হাসান-হুসেনের নাম শুনেছ, কিন্তু তাঁদের করুণ কাহিনী তোমাদের সকলেই জানে না বোধ হয়।

হাসান আর হুসেন হচ্ছেন দুই সহোদর, হজরত মহম্মদের দুই দৌহিত্র। চতুর্থ খলিফা আলি তাঁদের পিতা। আলির পরলোকগমনের পর হাসান অধিষ্ঠিত হন তাঁর আসনে। মুসলমানদের মধ্যে খলিফাই হচ্ছেন সর্বপ্রধান ব্যক্তি।

হজরত মহম্মদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন হাসান। এবং তাঁর চেহারাও ছিল অনেকটা হজরত মহম্মদের মতন দেখতে। প্রকৃতিতেও তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ, দয়ালু ও ধার্মিক। যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত পছন্দ করতেন না।

এমন লোকের খলিফার উচ্চাসন ভালো লাগতেই পারে না। কিছু-দিন পরেই তিনি স্বেচ্ছায় সে আসন ত্যাগ করলেন। নতুন খলিফা হলেন মোয়াউইয়া।

নতুন খলিফার পুত্রের নাম এজিদ। তিনি হাসানকে প্রীতির চোখে দেখতেন না। এজিদের ভয় ছিল, তাঁর পিতার মৃত্যুর পর হাসান আবার খলিফার আসন দাবি করতে পারেন। তাঁর ষড়যন্ত্রে

অবশেষে হাসানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হ'ল (৬৬৯ খৃষ্টাব্দ)।

খলিফা মোয়াউইয়ার মৃত্যুকাল আসন্ন।

পুত্র এজিদকে ডেকে তিনি বললেন, "বাছা, হুসেন হচ্ছে তোমার প্রধান প্রতিযোগী। কিন্তু সে সরল আর ন্যায়পরায়ণ—বিশেষ, সম্পর্কে তোমার ভাই হয়। অতএব যদি কখনো তাকে হাতের মুঠোর ভিতরে পাও, তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার কোরো।"

৬৮০ খৃষ্টাব্দে এজিদ লাভ করলেন খলিফার উচ্চাসন। তিনি কবিতা রচনা করতে পারতেন বটে, কিন্তু মানুষ হিসাবে খাঁটি মানুষ ছিলেন না। তাঁর বিলাসিতা ছিল যথেষ্ট।

প্রথমেই তাঁর জানবার আগ্রহ হ'ল, হুসেন বিশ্বস্তভাবে তাঁর অধীনতা স্বীকার করবেন কিনা?

হুসেন তখন মদিনা নগরে বাস করছেন। সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন ওয়ালেদ। তিনি এজিদের হুকুম পেয়ে স্থির করলেন, হুসেন যদি নতুন খলিফার অধীনতা স্বীকার না করেন, তাহ'লে তাঁর মুণ্ডপাত করা হবে।

সৌভাগ্যক্রমে সময় থাকতেই হুসেন জানতে পারলেন এই চক্রান্তের কথা। সপরিবারে তিনি মক্কা শহরে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন এবং প্রকাশ্যে প্রচার ক'রে দিলেন যে, খলিফার আসনের উপরে তাঁরই দাবি সব চেয়ে বেশি, সুতরাং কোনমতেই তিনি এজিদের অধীনতা স্বীকার করতে পারেন না।

একদিক দিয়ে বড় ভাই হাসানের সঙ্গে তাঁর কোনই মিল ছিল না। হাসান যুদ্ধবিরোধী, হুসেন বিখ্যাত যোদ্ধা। রণক্ষেত্রে বহুবার পরীক্ষিত হয়েছে তাঁর দুর্দমনীয় বীরত্ব।

কিউফা শহর থেকে এল অত্যন্ত সুখবর। সেখানকার বাসিন্দারা হুসেনকে সাদরে আহ্বান করতে চায়। তারা ব'লে পাঠালে, খলিফার আসনের ন্যায্য অধিকারী হচ্ছেন হুসেন, সুতরাং তিনি যদি সেখানে

গমন করেন, তাহ'লে বাবিলনের সমস্ত লোক তাঁর জন্যে করবে অস্ত্র-ধারণ।

খবরটা কতখানি সত্য তা জানবার জন্যে হুসেন তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্কীয় মুসলিমকে কিউফায় পাঠিয়ে দিলেন। ইরাকের দুর্গম মরুভূমি পার হয়ে মুসলিম প্রায় একাকী বহুকষ্টে হাজির হ'লেন গিয়ে কিউফা শহরে। তারপর ক্রমে ক্রমে তাঁর কাছ থেকে যে-সব খবর আসতে লাগল তা হচ্ছে এই ঃ

কিউফায় হুসেনের পক্ষপাতীরাই দলে ভারি। প্রথমে, সেখানে তাঁর জন্যে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে এমন সশস্ত্র লোকের সংখ্যা ছিল আঠারো হাজার। তারপর, দিনে দিনে হাজার হাজার লোক এসে যোগ দিচ্ছে তাদের সঙ্গে। অবশ্য সংখ্যায় তারা হয়ে উঠল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার। এমন সঙ্গোপনে সমস্ত কাজ করা হচ্ছে যে, শহরের উপর-ওয়ালারা ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পায় নি,—সুতরাং হুসেন অনায়াসেই কিউফায় এসে সগৌরবে উত্তোলন করতে পারেন তাঁর পতাকা।

কিন্তু দামাস্কাস নগরে ব'সে গুপ্তচরের মুখে সব খবর রাখছিলেন খলিফা এজিদ।

বসোরার শাসনকর্তা আমীর ওবিদাল্লা। খলিফার হুকুমে তিনি গেলেন কিউফা শহরে। সমস্ত চক্রান্ত ধরা পড়তে বিলম্ব হ'ল না। ভালো ক'রে তৈরী হবার আগেই বিদ্রোহীদের নিয়ে মুসলিম অস্ত্রধারণ করলেন বটে, কিন্তু ব্যর্থ হ'ল তাঁর চেষ্টা। পরাজিত হয়ে বিদ্রোহীরা পলায়ন করলে, খলিফার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল মুসলিমের ছিন্নমুণ্ড।

ওদিকে মুসলিমের পত্র পেয়ে হুসেন নিজের কর্তব্য স্থির ক'রে ফেলেছেন। নিঃসন্দিগ্ধ মনে তিনি কিউফায় যাবার আয়োজন করতে লাগলেন, কারণ মক্কা নগরে তখনও সেখানকার শেষ-খবর পৌঁছয় নি।

বন্ধুরা বললেন, "সাবধান হুসেন, সাবধান। কিউফার বাসিন্দাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রবাদের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের উপরে

তুমি খুব বেশি নির্ভর কোরো না।"

হুসেন বললেন, "না, আমি বিশ্বাস করি তারা আমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে না।"

নিকট-আত্মীয় আবদাল্লা ইব্‌ন্ আব্বাস বললেন, "নিতান্তই যদি যেতে চাও, পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যেও না, ওরা মক্কাতেই থাক্।"

হুসেন বললেন, "ভবিষ্যৎ আছে ভগবানের হাতে। মেয়েরাও আমার সঙ্গে যাবে।"

কয়েকজন পত্নী, পুত্র-কন্যা, ভগ্নী ও ছোট একদল সৈন্য নিয়ে হুসেন কিউফার দিকে যাত্রা করলেন।

মক্কা থেকে বাবিলন, মাঝখানে তার কয়েকশত মাইলব্যাপী রৌদ্রদগ্ধ নির্জন মরুভূমির উপর দিয়ে হা-হা ক'রে বয়ে যাচ্ছে তৃষ্ণার্ত ও উত্তপ্ত বাতাস। দৈহিক কষ্ট আমলে না এনে সেই ভয়াবহ সুদীর্ঘ পথ পার হয়ে হুসেন অবশেষে সদলবলে বাবিলনের প্রান্তে এসে উপস্থিত হ'লেন।

এক হাজার অশ্বারোহী নিয়ে দেখা দিলে একজন সেনানী।

হুসেন সুধোলেন, "কে তুমি?"

সেনানী বললে, "আমি হারেো, আমীর ওবিদাল্লা আমার প্রভু। তাঁর আদেশে আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে কিউফা নগরে।"

হুসেন সগর্বে বললেন, "আমি ওবিদাল্লার হুকুম মানতে বাধ্য নই। আমি হচ্ছি আসল খলিফা, এখানে এসেছি কিউফার বাসিন্দাদের আমন্ত্রণে।"

দুই পক্ষে কথা কাটাকাটি হচ্ছে, এমন সময়ে হ'ল আরো চারিজন নতুন অশ্বারোহীর আবির্ভাব। তাদের মধ্যে একজন ছিল হুসেনের পরিচিত, নাম তার থির্‌মা।

থির্‌মার মুখে পাওয়া গেল কিউফার সমস্ত দুঃসংবাদ। সেখানে এখন হুসেনের বন্ধু বলতে কেউ নেই।

থির্‌মা পরামর্শ দিলে, "আমার সঙ্গে আপনি নাজা-প্রদেশের আজা-

পাহাড়ে চলুন। সেখানে দশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে আপনি আত্মরক্ষা করতে পারবেন।"

হুসেন বললেন, "না।"

সদলবলে তিনি আবার এগিয়ে চললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চলল হারেয়োর যোদ্ধারা। তারা বাধাও দিলে না, সঙ্গও ছাড়লে না।

হুসেনের ভাবভঙ্গি এখনও স্বপ্নাচ্ছন্নের মত। তাঁর মনের মধ্যে রয়েছে ভাবী অমঙ্গলের সূচনা। একদিন দেখলেন, তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এক অশ্বারূঢ় মূর্তি। সে বললে, "মানুষরা পথে চলে রাত্রে। নিয়তিও নিশাচরী। সে আসে মানুষদের সঙ্গে দেখা করতে।" মূর্তি আবার অদৃশ্য।

হুসেন বললেন, "আজ মৃত্যুদূতের দেখা পেলুম।"

ইউফ্রেটিস্ নদীতীর। আমীর ওবিদাল্লার প্রেরিত চার হাজার সৈন্য নিয়ে আমার ইব্‌ন্ সাদ্ এসে হুসেনের পথরোধ করলেন।

হুসেন বললেন, "কিউফার বাসিন্দাদের কথায় ভুলে আজ আমার এই বিপদ্। এখন আমি আবার মক্কায় ফিরে যেতে চাই।"

আমার এই খবর আমীর ওবিদাল্লার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমীরের হুকুম এল ঃ "সমস্ত সৈন্য নিয়ে ইউফ্রেটিস্ নদীকে আড়াল ক'রে হুসেনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকো—যেন সে একফোঁটা জল না পায়। আগে সে খলিফা এজিদের বশ্যতা স্বীকার করুক, তারপর অন্য কথা।"

দিনের পর দিন যায়, জলাভাবে জীবন বিষময়—তৃষ্ণায় সকলের ছাতি ফেটে যাবার মত হয়। তবু হুসেন অটল। কিছুতেই তিনি খলিফা এজিদের কাছে নতিস্বীকার করবেন না।

ওদিকে বিলম্ব দেখে আমীর ওবিদাল্লা অধীর হয়ে উঠলেন। আমারের কাছে প্রেরণ করলেন আবার এক নূতন আদেশপত্র ঃ "হুসেন যদি বশ না মানে, তবে তাদের সকলের উপর ঘোড়া চালিয়ে দাও। ঘোড়ার পায়ের তলায় তারা পিষে মরুক।"

পত্রবাহক হ'ল সামার নামে এক যোদ্ধা—প্রকৃতি তার উগ্র, নিষ্ঠুর,

ভীষণ। তার উপরেও গুপ্ত আদেশ রইল: "আমার ইব্‌ন্ সাদ্ যদি হুকুম না মানে, তরবারির আঘাতে তার মুণ্ড উড়িয়ে দিয়ে সৈন্যদের ভারগ্রহণ কোরো তুমিই।"

হজরত মহম্মদের নাতি কোন বিপদে পড়েন, আমারের এমন ইচ্ছা ছিল না। আমীরের আদেশপত্র দেখিয়ে তিনি মিষ্ট কথায় হুসেনকে বোঝাবার জন্যে চেষ্টা করলেন যথেষ্ট।

কিন্তু হুসেন অটল।

আমার ব'লে গেলেন, "কাল সকাল পর্যন্ত ভাববার সময় রইল।"

হুসেন তাঁবুর দরজার কাছে তরবারির উপরে ভর দিয়ে ব'সে রইলেন স্তব্ধ মূর্তির মত। তাঁর চক্ষের উপরে আবার ঘনিয়ে এল জাগ্রত স্বপ্নের ছায়া।

খানিকক্ষণ পরে আত্মস্থ হয়ে তিনি বললেন, "স্বপ্নে কাকে দেখলুম জানো? মাতামহকে। তিনি আমাকে বললেন—"শীঘ্রই তুই আমার সঙ্গে স্বর্গবাসী হবি'!"

তাঁর ভগ্নী কেঁদে উঠে বললেন, "আমাদের মা, বাবা, দাদা হাসান মারা গিয়েছেন, এইবারে আমাদের পালা।" বলতে বলতে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

নিজের বন্ধু ও অনুচরদের ডেকে হুসেন বললেন, "শত্রুরা খালি আমার জীবন চায়। আমাকে এখানে রেখে তোমরা চ'লে যাও, আমার জন্যে তোমরা মরবে কেন?"

তারা একবাক্যে বললে, "ভগবান্ যেন আমাদের এমন দুর্মতি না দেন। তোমার মৃত্যুর পর আমরা বেঁচে থাকব? অসম্ভব।"

হুসেন বললেন, "তবে এস, সকলে মিলে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হই।"

প্রার্থনার ভিতর দিয়ে কেটে গেল তাঁদের জীবনের শেষ-রাত্রি।

কারবালার মাঠে হ'ল প্রভাতসূর্যোদয়।

বিশেষ কৌশলে তাঁবুগুলোকে সাজিয়ে, তাঁবুর দড়িগুলো এখানে-ওখানে বেঁধে বাধা সৃষ্টি ক'রে, খাত খুঁড়ে হুসেন এমন ভাবে ব্যূহরচনা

করেছেন যে, সামনের দিক ছাড়া আর কোন দিক দিয়ে কেউ তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

হুসেনের সঙ্গে ছিল মাত্র চল্লিশজন পদাতিক ও বত্রিশজন অশ্বারোহী সৈনিক। শত্রুদের তুলনায় সংখ্যায় তারা তুচ্ছ বটে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই ধর্মের জন্যে আত্মদান করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্নান সেরে পোশাক পরে আতর মেখে যোদ্ধারা হাসিমুখে বলাবলি করতে লাগল, আর একটু পরেই আমরা মেলামেশা করব স্বর্গের হুরীদের সঙ্গে!"

ত্রিশজন অশ্বারোহী নিয়ে হারেো এসে হুসেনকে বললে, "প্রথমে আমিই আপনাকে বাধা দিতে বাধ্য হয়েছিলুম ব'লে এখন আমার অনুতাপ হচ্ছে। ব্যাপারটা এমন হবে আমি জানতুম না। আপনি পয়গম্বরের বংশধর, আপনার জন্যে আমরাও প্রাণ দিতে প্রস্তুত।"

আমারও হুসেনকে আক্রমণ করতে ইতস্তত করছেন দেখে বিভীষণ সামার ধনুক-বাণ তুলে প্রথম অস্ত্র নিক্ষেপ করলে হুসেনের ব্যূহের মধ্যে।

আরম্ভ হ'ল শেষ-দৃশ্য।

আমীরের সেনাদল ব্যূহের ভিতরে প্রবেশ করতে না পেরে দূর থেকেই তীর ছুঁড়তে লাগল। মাঝে মাঝে আরব দেশের চিরাচরিত রীতি অনুসারে দুই পক্ষের দুইজন ক'রে লোক এগিয়ে হাতাহাতি দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিযুক্ত হয়, কিন্তু সেরকম যুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরাজিত হ'তে লাগল আমীরের সৈনিকরাই।

সামার শেষটা হুসেনের তাঁবুর ভিতরে বর্শা চালিয়ে দিয়ে চিৎকার ক'রে বললে, "আগুন আনো! আগুন আনো! তাঁবু পুড়িয়ে দাও!"

তাঁবুর ভিতর থেকে উচ্চ-স্বরে কাঁদতে কাঁদতে নারীরা সভয়ে বাইরে পালিয়ে এল।

হুসেন চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, "জাহান্নমে যাও! তোমরা কি আমার পরিবারবর্গকেও ধ্বংস করতে চাও?"

সামার আবার পিছিয়ে গেল।

অসংখ্য শত্রুর ধনুক থেকে ছুটে আসছে রাশি রাশি বাণ, এবং দলে

দলে ধরাশায়ী হচ্ছে হুসেনের সঙ্গীরা। এ যুদ্ধ নয়, এ হচ্ছে নির্দয় হত্যাকাণ্ড। অবশেষে হুসেন দাঁড়িয়ে রইলেন প্রায় একাকীই। কিন্তু তবু কেউ ভরসা ক'রে তাঁর কাছে গেল না—এমনি তাঁর তরবারির মহিমা।

তাঁর কচি ছেলে আবদাল্লা, বাণবিদ্ধ হয়ে সেও মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল। সেই কুসুমসুকুমার আহত দেহের রক্তধারা অঞ্জলি ভ'রে নিয়ে আকাশের দিকে নিক্ষেপ ক'রে হুসেন বললেন, "হে আল্লা। তোমার সাহায্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছ বটে, কিন্তু যারা এই নির্দোষ রক্তপাত করলে তাদের তুমি ক্ষমা কোরো না।"

তারপর সামার সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সঙ্গীহীন হুসেনের উপরে। হুসেন মরিয়া হয়ে লড়তে লড়তে অনেক শত্রু বধ করলেন বটে, কিন্তু শেষটা রক্তহীন অবশ দেহে মাটির উপরে প'ড়ে গেলেন, আর উঠলেন না। তাঁর দেহের উপরে ত্রিশ জায়গায় ছিল অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন এবং দেহের চৌত্রিশ জায়গায় ছিল থেঁৎলে-যাওয়ার দাগ। সামার তাঁর মুণ্ড কেটে নিয়ে অশ্বারোহীদের হুকুম দিলে, "এই দেহের উপর দিয়ে বার বার ঘোড়া চালিয়ে দাও—যেন এর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট না থাকে।"

এই হত্যাকাণ্ডে মারা পড়েন হুসেনের বাহাত্তরজন সঙ্গী। শত্রুপক্ষে নিহত হয়েছিল অষ্টাশীজন এবং আহত হয়েছিল আরো বেশি লোক।

হুসেনের ছিন্নমুণ্ড বহন ক'রে সামার উপস্থিত হ'ল রাজসভায়। ওবিদাল্লা হাতের দণ্ড দিয়ে আঘাত করলেন মুণ্ডের ওষ্ঠাধারের উপরে।

একজন বৃদ্ধ সভাসদ ব'লে উঠলেন, "হা আল্লা! আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি, পয়গম্বর তাঁর পবিত্র ওষ্ঠাধার দিয়ে চুম্বন করেছেন ঐ ওষ্ঠাধর।"

মরা মাণিক আর জ্যান্ত মাণিক

বাবর তখন কাবুলের সিংহাসনে। তিনি দিল্লীর সিংহাসন আক্রমণ করবার জন্যে তোড়জোড় করছিলেন।

হাজারা হচ্ছে আফগানিস্থানের একটি ছোট রাজ্য। হাজারার সর্দারের ছোট ভাইয়ের নাম মুকারাব খাঁ।

বসন্তকালের একটি দিন। মুকারাব খাঁ দূরদেশ থেকে ফিরে আসছেন —সঙ্গে তাঁর ছয়জন অনুচর।

হাজারার কেল্লা-প্রাসাদের সামনে এসে মুকারাব সবিস্ময়ে অনুভব করলেন, চারিদিকে বিরাজ করছে এক অস্বাভাবিক, থম্‌থমে মৃত্যু-স্তব্ধতা।

আরো দুই-চার পা এগিয়ে তাঁর বিস্ময় পরিণত হ'ল আতঙ্কে। যেদিকে তাকানো যায়, চোখে পড়ে খালি ভীষণ দৃশ্য! শত্রুর দেখা নেই, কিন্তু কোথাও প'ড়ে আছে ভাঙা বাক্স-প্যাঁটরা, কোথাও বইছে রক্তের ঢেউ, কোথাও নর-নারীর ভূতলশায়ী নিশ্চেষ্ট মৃতদেহ।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে প'ড়ে মুকারাব নগ্ন তরবারি হাতে ক'রে প্রহরীহীন প্রাসাদ-দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

উপরে উঠে একটি ঘরে ঢুকে তিনি স্তম্ভিত চোখে দেখলেন, মেঝের

উপরে মৃত প্রহরীদের মাঝখানে প'ড়ে আছে তাঁর দাদার স্ত্রী ও শিশু-পুত্রের দেহ।

মুকারাব হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, "এ বীভৎস দুঃস্বপ্নের অর্থ কি ?"

ঘরের কোণে মৃতদেহের স্তূপের ভিতর থেকে টলতে টলতে কাঁপতে কাঁপতে এক বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। মুকারাব চিনলেন, তিনি হচ্ছেন তাঁদের পরিবারের বিশেষ বন্ধু—বিশ্বস্ত এক মোল্লা বা পুরোহিত। তাঁরও সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, ডান হাতের তিনটি আঙুল উড়ে গেছে, দেহের এক পাশেও গভীর ক্ষত—দেখলেই বোঝা যায়, তাঁরও মৃত্যু আসন্ন।

বৃদ্ধ ক্ষীণ স্বরে বললেন, "বাছা, তোমার দাদা কেল্লার সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে বেরিয়ে সদলবলে মারা পড়েছেন। সেই অবকাশে বিখ্যাত দস্যু-দলপতি মনসুর এসে কেল্লায় ঢুকে আমাদের এই সর্বনাশ ক'রে গেছে। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, যে-লোভে দুরাত্মা এখানে এসেছিল তার সে-লোভ ব্যর্থ হয়েছে! হাজারার পদ্মরাগ-মণি সে নিয়ে যেতে পারেনি—এই নাও, তোমার হাতে আমি তা সমর্পণ করছি!" কোমর-বন্ধের ভিতর থেকে মণি বার ক'রে দিয়েই বৃদ্ধ আবার মাটির উপরে লুটিয়ে পড়লেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল।

হাজারার মহামূল্যবান্ পদ্মরাগ-মণি—এর নাম ফেরে লোকের মুখে মুখে। সাত-রাজার-ধন মাণিক বলতে যা বুঝায়, এ হচ্ছে তাই। সকলেরই লোভী দৃষ্টি পাগল হয়ে ওঠে তাকে লাভ করবার জন্যে।

মণিখানি হাতে নিয়ে মুকারাব মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, তাঁর ছয় সঙ্গীর মধ্যে একজন হয়েছে অদৃশ্য।

জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় গেল সে ?"

একজন বললে, "সে হঠাৎ নিচে নেমে ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ের দিকে চ'লে গেল!"

সচকিত কণ্ঠে মুকারাব বললেন, "পাহাড়ের দিকে চ'লে গেল! এটা তো ভাল কথা নয়! সবাই হুঁশিয়ার থাকো—নিশ্চয় সে বিশ্বাসঘাতক!"

ডাকাতদের নায়ক মন্‌সুর—বিরাট তার দেহ, বিকট তার চেহারা। সে যখন চলা-ফেরা করে, মনে হয় মস্ত এক বনমানুষ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

যেমন তার আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি। দয়া-মায়ার স্বপ্নও সে দেখেনি কোন দিন। মানুষের প্রাণ তার কাছে মাটির খেলনার মতন তুচ্ছ। প্রকাণ্ড দল নিয়ে সে যখন মানুষ-শিকারে বেরোয়, দেশ জুড়ে ওঠে তখন হাহাকার।

পাহাড়ের বুকের ভিতরে মন্‌সুরের সুরক্ষিত আস্তানা। সেখানে গিয়ে কেউ তাকে আক্রমণ করতে পারে না।

হাজারার কেল্লা লুঠে ফিরে এসে মন্‌সুর বিশ্রাম করছিল।

হঠাৎ দেখা গেল, কে একটা অচেনা লোক দ্রুতপদে আসছে তাদের আস্তানার দিকে।

সিংহ-বিবরের মুখে কে এই নির্বোধ হতভাগ্য? মন্‌সুরের বিস্মিত সাঙ্গোপাঙ্গদের হাতে হাতে বিদ্যুৎ দুলিয়ে নেচে উঠল তরবারির পর তরবারি!

আগন্তুক ত্রস্তভাবে দু-হাত তুলে বললে, "আমি শত্রু নই, আমি বন্ধু।"

ডাকাতরা বললে, "তোমাকে আমরা চিনি না। কে তুমি?"

—"আমি হাজারার এক সৈনিক, তোমাদের সর্দারের কাছে এসেছি।"

মন্‌সুর চলন্ত মাংস-হাড়ের পাহাড়ের মত এগিয়ে এসে বাজখাঁই গলায় বললে, "আমার কাছে কী চাও তুমি?"

—"হাজারার পদ্মরাগ-মণির সন্ধান আমি জানি। আপনি যদি সেখানা আমাকে পাইয়ে দিতে পারেন, আমি তাহ'লে অনেক টাকা পুরস্কার দিতে রাজি আছি।"

মন্‌সুর ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "পুরস্কার-টুরস্কার নয়—আমি সেই মণিখানাই চাই। তার সন্ধান, তুমি পাবে হাজার মোহর বখ্‌শিস্‌।"…

সৈনিক বুঝলে সে যমের মুখে এসে পড়েছে, এখন ছাড়ান্‌ পাওয়া যায়! হাতে যা আসে, তাই নিয়েই প্রাণে প্রাণে স'রে পড়াই হ'চ্ছে

বুদ্ধিমানের কাজ।

সে বললে, "মণিখানা আছে আমার প্রভু মুকারাব খাঁয়ের কাছে। তিনি এখন আত্মীয়দের গোর দিতে ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গে পাঁচজনের বেশি সৈনিক নেই।

মন্‌সুর বললে, "সুখবর বটে। এই নাও তোমার বখশিস্।"

সৈনিক সাগ্রহে মোহরগুলো গুণতে ব'সে গেল।

মন্‌সুর রহস্যময় হাসি হেসে বললে, "সুখবর এনেছ ব'লে প্রাপ্য পুরস্কার তুমি পেলে। এইবারে তোমার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার নাও" —মন্‌সুরের তরবারি শূন্যে উঠল ও নিচে নামল ; পর-মুহূর্তে দেখা গেল, বিশ্বাসঘাতক সৈনিকের ছিন্ন মুণ্ড ধূলার উপরে গড়িয়ে যাচ্ছে!

উচ্চ পর্বতের উপরে সমুজ্জ্বল আকাশ-পটে আচম্বিতে কে যেন এঁকে দিলে সারি সারি অশ্বারোহীর জীবন্ত ছবি!

শোকে কাতর হ'লেও মুকারাব খাঁয়ের চোখের তীক্ষ্ণতা ভোঁতা হয়ে যায়নি। ক্ষণে ক্ষণে তিনি এদেরই দেখা পাবার আশা করছিলেন। গুণে দেখা গেল, সংখ্যায় তারা ত্রিশজন।

এক লাফে তিনি ঘোড়ার উপরে উঠে প'ড়ে সঙ্গের পাঁচজন সৈনিককে ডেকে বললেন, "ত্রিশজনের বিরুদ্ধে আমরা ছ'জনে অস্ত্র ধ'রে কিছুই করতে পারব না। দক্ষিণ দিকে—কাবুলের দিকে ঘোড়া ছোটাও।"

কাবুলের পথে পড়ে যে গিরিসঙ্কট, মুকারাব খাঁ সঙ্গীদের সঙ্গে তার ভিতরে এসে পড়লেন—পিছনে নিয়ে ত্রিশজন শত্রু।

ডাকাত সর্দার মন্‌সুরের বাহন ছিল তারই মতন বিপুলবপু, ভারি ও বলবান্ এক তুর্কী ঘোড়া।

মুকারাবের আরবী ঘোড়া—আকারে ছিপ্‌ছিপে, তার পায়ে পায়ে বিদ্যুৎগতির ইঙ্গিত।

অন্যান্য ডাকাত ও মুকারাবের পাঁচ সঙ্গীর ঘোড়াগুলো ছিল সাধারণ।

খানিক পথ পেরিয়েই মুকারাব বুঝলেন, সঙ্গীদের সঙ্গে থাকলে

তাঁকেও ধরা পড়তে হবে। তাঁর আরবী ঘোড়া সতেজে সবেগে এগিয়ে যেতে চায়, কিন্তু সঙ্গীরা তাঁর নাগাল পাবে না ব'লে তাঁকে রাশ টেনে ধ'রে থাকতে হচ্ছে। ফলে, পিছনের ডাকাতেরা খুব কাছে এসে পড়েছে।

একটা তেমাথার কাছে গিয়ে মুকারাব সৈনিকদের ডেকে বললেন, "তোমরা আর আমার সঙ্গে এস না। তোমরা যাও বাঁদিকে, আমি যাব ডানদিকে।"

তিনি ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিলেন—উড়ে চলল সে পক্ষিরাজের মত!

এতক্ষণ পরে মনের সাধে ছুটতে পেরে তার খুশি আর ধরে না! দেখতে দেখতে সে শত্রুদের চোখের আড়ালে চ'লে যায় আর কি!

ওদিকে অন্যান্য ডাকাতদের ছোট ছোট ঘোড়াগুলো পাল্লা দিতে না পেরে ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু মন্‌সুরের বলবান্ ঘোড়া সামনে এগিয়ে চলল সমানে।

পাহাড়ের পথ কখনো উপরে ওঠে, কখনো নিচে নামে—তারপর পাহাড় প'ড়ে থাকে পিছনে। তারপর পায়ের তলায় এসে পড়ে রৌদ্র-দগ্ধ প্রান্তর, দু'পাশ দিয়ে ছুটে চ'লে যায় চলচ্চিত্রের মতন ঝোপ, গাছ, বন, এবং হু-হু ক'রে বন্য গীতি গেয়ে যায় উচ্ছ্বসিত বাতাস।

এখন দেখা যাচ্ছে কেবল দুই অশ্বারোহীকে। অন্যান্য ঘোড়সওয়াররা কোথায় কতদূরে হারিয়ে গেছে, তার কোন ঠিকানাই নেই!

মন্‌সুরের ঘোড়া বলবান্, মুকারাবের ঘোড়া বেগবান্। কেউ কারুর কাছে হারতে রাজি নয়—শক্তি আর গতি।

সূর্য যখন ডুবু ডুবু—তখন গতি বুঝি শক্তিকে ফাঁকি দেয় দেয়!

মন্‌সুরের ঘোড়ার দেহ ভারি, মন্‌সুরের দেহ ভারি, উপরন্তু তাকে আরো ভারি ক'রে তুলেছে তার নিজের দেহের লোহার বর্ম। মুকারাব-এর হাল্‌কা দেহ নিয়ে তাঁর ছিপ্‌ছিপে ঘোড়া ক্রমেই বেশি তফাতে চ'লে যাচ্ছে।

মন্‌সুর খুলে ফেলে দিলে শিরস্ত্রাণ আর বর্ম, খানিক হাল্‌কা হবার জন্যে।

মুকারাব হঠাৎ পিছন ফিরে দেখেন, কাছে আছে মাত্র একজন শত্রু। এতক্ষণ বাধ্য হয়ে তাঁকে পালাতে হচ্ছিল, এইবার জেগে উঠল তাঁর আহত বীর্য ও পৌরুষ! ঘোড়া থামিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে চোখের নিমেষে তিনি ধনুকে জুড়লেন তীক্ষ্ণ তীর!

মন্‌সুর মনে মনে গুণ্‌লে মহাপ্রমাদ! বর্ম আর শিরস্ত্রাণ হেলায় হারিয়ে অনুতাপ করতে করতে ঘোড়ার পিঠে গা মিলিয়ে সে উপুড় হয়ে পড়ল, বাণ এড়াবার জন্যে।

সে বাণ এড়ালে বটে, কিন্তু তার ঘোড়া এড়াতে পারলে না। আহত ঘোড়া হ'ল 'পপাত ধরণীতলে'! মন্‌সুরের বিপুল দেহও মাটির উপরে প'ড়ে একেবারে নিশ্চেষ্ট।

মুকারাব টপ্‌ ক'রে ঘোড়া থেকে নেমে শত্রুকে মৃত ভেবে পরীক্ষা করবার জন্যে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কিন্তু মন্‌সুর হচ্ছে মস্ত ধড়ীবাজ, শত্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্যেই মড়ার মতন স্থির হয়ে প'ড়েছিল। মুকারাবকে কাছে পেয়ে সে খপ্‌ ক'রে হাত বাড়িয়ে তাঁর কোমরবন্ধ চেপে ধরলে এবং তারপর বিষম ঝাঁকানি দিতে আরম্ভ করলে।

অতিকায় মন্‌সুরের হাতে প'ড়ে মুকারাবের হাল হ'ল বিড়াল-কবলগত ইঁদুরের মতন। গায়ের জোরে তাকে বাধা দেবার সাধ্য তাঁর নেই। তিনি চট্‌পট্‌ ছোরা বার ক'রে তাকে আঘাত করলেন এবং মন্‌সুরও আত্মরক্ষার জন্যে তাড়াতাড়ি তাঁকে ছেড়ে খাপ থেকে খুলে ফেললে তরবারি।

তখন সূর্যহারা আকাশের তলায়, শেষ-বেলার আল্‌তা-আলো গায়ে মেখে দুই বীরের নগ্ন তরবারি ধরলে মৃত্যু-সঙ্গীতের উদ্দাম ছন্দ!

এ-যুদ্ধে মন্‌সুরের চেয়ে মুকারাবেরই সুবিধা বেশি। গুরুভার মন্‌সুর প্রতিপক্ষের আক্রমণের ক্ষিপ্রতা এড়াতে এড়াতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে ডানদিকে ফেরবার উপক্রম করতে-না-করতেই মুকারাব সাঁৎ ক'রে

তার বাঁদিকে স'রে গিয়ে মেরে দেন তরোয়ালের খোঁচা।

এইভাবে খানিকক্ষণ লড়তে পারলেই মুকারাবের শত্রু রক্তপাতের ও পরিশ্রমের জন্যে দুর্বল হয়ে হার মানতে বাধ্য হ'ত। কিন্তু তাঁর অপেক্ষা করবার সময় নেই, কারণ যে কোন মুহূর্তেই পিছিয়ে-পড়া ডাকাতদের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা।

বার বার তরবারির খোঁচা খেয়ে মন্‌সুর রাগে অজ্ঞান হয়ে হঠাৎ সামনের দিকে বাঘের মতন লাফিয়ে প'ড়ে নিজের তরবারি তুলে প্রচণ্ড এক কোপ্ বসিয়ে দিলে,—মুকারাবের তরবারি সে আঘাত সদর্পে গ্রহণ করলে এবং পর-মুহূর্তে দস্যুর অসি ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙে দুখানা হয়ে গেল।

মুকারাব সেই প্রবল আক্রমণ ভালো ক'রে সাম্‌লাবার আগেই মন্‌সুর ভগ্ন অসি ফেলে প্রকাণ্ড এক যুদ্ধ-কুঠার নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে আবার তেড়ে এল—তার দুই তীব্র চক্ষু তখন জ্ব'লে উঠেছে হিংস্র পশুর মত।

মুকারাব পাঁয়তারা ক'ষে একপাশে স'রে গেলেন—শত্রুর কুঠার শূন্যে খুঁজে পেলে কেবল শূন্যতাকেই! তারপর চোখের পলক পড়বার আগেই মুকারাবের তরবারি আমূল প্রবেশ করলে মন্‌সুরের দেহের মধ্যে।

মন্‌সুর মাটিতে আছড়ে পড়ল, আর উঠল না। তার লোভী মন পদ্মরাগ-মণি লাভ করলে না বটে, কিন্তু তার ক্ষত-বিক্ষত দেহের উপরে ফুটে উঠল পদ্মরাগের রক্তরাগ!

কিন্তু মুকারাব তবু আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলেন না—দিক্‌চক্রবাল রেখায় দেখা যাচ্ছে যেন কতকগুলি ঘোড়-সওয়ারের মূর্তি!

প্রভুভক্ত আরবী ঘোড়া অদূরে অপেক্ষা করছিল, প্রভুর ডাক শুনে কাছে ছুটে এল! মুকারাব তার লাগাম ধ'রে পাশের জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

অন্ধকারের অন্তঃপুরে ঢুকে আলোর দৃষ্টিও তখন অন্ধ হয়ে আসছে।

পরদিনের ভোরবেলা। গাছের পাতায় পাতায় সূর্যকরে সোনালী

রূপ, গাছের ডালে ডালে পাখিদের খুশির সুর।

আফগানিস্থানের ঘাল্‌মান উপত্যকা—যেন সৌন্দর্যের নাচঘর। নদীর মুখে ফোটে আনন্দের বন্দনা, বুকে দোলে হীরার লহর। দিকে দিকে ছায়ার আশ্রয় রচনা ক'রে পুলক-রোমাঞ্চে মর্মর-ছন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে খুবানী, আখ্‌রোট, ঝাউ, পীচ, তুঁত ও চেরী প্রভৃতি গাছের দল।

অদূরে দেখা যাচ্ছে সর্দার দোস্ত্‌ মহম্মদের দুর্গ-প্রাসাদ।

সর্দারের মেয়ে জুলেখা। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাঁর সখ হ'ল, একবার বনের ভিতরটা দেখে আসবার জন্যে।

সহচরীরা সভয়ে জানালে, তিনি পর্দানসীন, সর্দারের কানে এ-কথা উঠলে তিনি ভারি রাগ করবেন।

জুলেখা বললেন, "বনে এত ভোরে কেউ থাকে না। কেউ আমাকে দেখতে পাবে না।"

সহচরীরা খিড়কীর ফটক খুলে দিলে। জুলেখা বাইরে পা বাড়িয়েই দেখলেন এক অভাবিত অপূর্ব দৃশ্য!

গাছের তলায় ঘাস-বিছানায় দুই চোখ মুদে শুয়ে আছেন এক সুকুমার দেবকুমার।

জুলেখার দেবকুমার হচ্ছেন আমাদের মুকারাব। হঠাৎ চোখ খুলে তিনিও হ'লেন চমৎকৃত। একি পরীস্থানের স্বপ্ন? এমন অপরূপ জীবন্ত রূপের ডালি কবে কে দেখেছে দুনিয়ায়?

মুকারাব ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন। মুখে গুণ্ঠন টেনে জুলেখা অদৃশ্য হয়ে গেলেন শরীরিণী বিদ্যুল্লতার মত।

মুকারাব চুপ ক'রে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলেন। তারপর মনে মনে হেসে জামার ভিতর থেকে বার করলেন হাজারার বিশ্ববিখ্যাত পদ্মরাগ-মণি। সূর্যকরে সে জ্বলে উঠল আরক্ত অগ্নিশিখার মত।

মুকারাব বললেন, "তুচ্ছ এই সাত-রাজার-ধন মরা মাণিক! এর বিনিময়ে আমি এক জ্যান্তো মাণিক আনতে চল্‌লুম!"

এর পর আর বলবার কথা বেশি নেই।

সর্দার দোস্ত্‌ মহম্মদ যখন মুকারাবের পরিচয় পেলেন ও তাঁর সকল কথা শুনলেন, তখন তাঁকে আদর-যত্ন করতে কোনই ত্রুটি করলেন না। বললেন, বৎস এত বিপদ এড়িয়ে তুমি যে হাজারার আশ্চর্য পদ্মরাগ-মণি উদ্ধার করতে পেরেছো, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর হতে পারে না।"

—"কিন্তু সে মণি আপনার হাতেই সমর্পণ করতে এসেছি।"

দোস্ত্‌ মহম্মদ যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। বিপুল বিস্ময়ে বললেন, "আমার হাতে সমর্পণ করতে এসেছ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, বিনিময়ে এর চেয়েও মূল্যবান্‌ রত্ন পাব ব'লে।"

—"এর চেয়ে মূল্যবান্‌ রত্ন পৃথিবীতে নেই।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বৈকি! আপনার কন্যা জুলেখাকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।"

তখন দোস্ত্‌ মহম্মদ সব বুঝলেন।

মুকারাবের মতন সম্ভ্রান্ত, সুদর্শন ও বীর্যবান্‌ জামাই পাওয়াই

সৌভাগ্যের কথা, তার উপরে প্রাপ্য হবে হাজারার অতুলনীয় পদ্মরাগ-মণি!

সুতরাং বিয়ের বাজনা বাজতে দেরি লাগল না এবং জুলেখাকে আবার মুকারাবের সুমুখে এসে মুখের ঘোমটা খুলে দাঁড়াতে হ'ল!

কিছুদিন পরে বাবরের সঙ্গে মুকারাব যাত্রা করলেন পাণিপথ-যুদ্ধক্ষেত্রে।

মুসলমানের জহর-ব্রত

হিন্দুর রক্তে মুসলমানের এবং মুসলমানের রক্তে হিন্দুর হাত আজ রাঙা হয়ে উঠেছে। এ দৃশ্য নূতন নয়। এমনি সব রক্তাক্ত ঘটনার দ্বারা আজ হাজার বৎসর ধ'রে ভারতের ইতিহাস আরক্ত হয়ে আছে। রক্ত-স্রোত কখনো বেড়েছে কখনো কমেছে, কিন্তু একেবারে থামেনি কখনো।

তবু ওরই মাঝে মাঝে এক-একটি সমুজ্জ্বল ছবি জেগে ওঠে অত্যন্ত অভাবিত ভাবে, কাজল-কালো মেঘের কোলে রূপালী বিদ্যুৎলতার মত! আজ তোমাদের হাতে উপহার দেব এমনি একখানি ছবি। বড় করুণ, কিন্তু বড় মিষ্টি ছবি।

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী তখন দিল্লীর সিংহাসনে। তাঁর সাম্রাজ্য দিনে দিনে বিস্তৃততর হয়ে উঠেছে, হিন্দু রাজাদের মাথা থেকে খ'সে পড়ছে মুকুটের পর মুকুট।

রণসম্বর দুর্গের রাজপুত রাণা হামীর দেব কিন্তু আলাউদ্দীনের সামনে মাথা নত করতে রাজি নন। আপন স্বাধীনতার জন্যে অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত তিনি সর্বদাই। এখানে বলে রাখা ভালো, চিতোরের উদ্ধারকর্তা হামীর ও রণসম্বরের হামীর একই ব্যক্তি নন।

সেনাপতি মীর মহম্মদ সা একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে তিনি করেছিলেন বিদ্রোহ ঘোষণা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিফল হয়ে তাঁকে দেশত্যাগী হ'তে হ'ল। পলাতক মহম্মদ রাণা হামীরের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। রাণা সম্মতি দিলেন।

দিল্লী থেকে এল সুলতানের কড়া হুকুম—"ফিরিয়ে দাও বিদ্রোহী মহম্মদকে!"

হামীর দেব জবাব দিলেন, "অসম্ভব! আশ্রিতকে জাতিধর্মনির্বিশেষে রক্ষা করাই হচ্ছে হিন্দুর কর্তব্য। মহম্মদ সাকে ফিরিয়ে দেব না।"

ক্রুদ্ধ দিল্লীশ্বর বললেন, "বটে? তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"

হামীর দেব নির্ভয়ে বললেন, "আমি অপ্রস্তুত নই।"

পঙ্গপালের মত মুসলমান সৈন্য নিয়ে বিখ্যাত সেনাপতি নস্রৎ খাঁ ধেয়ে এলেন রাজপুতনার দিকে। রাজপুতদের একটা দুর্গের পতন হল। ১২৯৯ খৃষ্টাব্দের কথা।

হামীর দেব আশ্রয় গ্রহণ করলেন রণসম্বর দুর্গের মধ্যে। এই প্রসিদ্ধ ও দুর্ভেদ্য দুর্গ বহু শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করেছে বারংবার। দিল্লীর সৈন্যরা দুর্গ অবরোধ করলে বটে, কিন্তু অধিকার করতে পারলে না।

রণসম্বরের মধ্যে অস্ত্র নিক্ষেপ করবার জন্যে দিল্লীর সৈন্যরা একটা মোরচ বা উপদুর্গ নির্মাণ করছিল। তা পরিদর্শন করতে এলেন সেনাপতি নস্রৎ খাঁ।

আচম্বিতে দুর্গের ভিতর থেকে নিক্ষিপ্ত হ'ল প্রকাণ্ড একখণ্ড প্রস্তর। প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়লেন নস্রৎ খাঁ। দুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হ'ল। দিল্লীর সেনাদলের মধ্যে জাগল হাহাকার।

এ সুযোগ ত্যাগ করলেন না রাণা হামীর দেব। সদলবলে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি মুসলমান সৈন্যদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন হিংস্র শার্দূলের মত দুর্দান্ত বিক্রমে। রাজপুত যোদ্ধাদের কণ্ঠে কণ্ঠে জাগ্রত হ'ল আকাশভেদী জয়ধ্বনি—"হর হর মহাদেও! হর হর মহাদেও!"

আরম্ভ হ'ল রক্তরাঙা তরবারির তাণ্ডব নৃত্য, দিকে দিকে ছুটতে লাগল বল্লমগুলো উল্কাবেগে, শূন্যে যেন বিপুল জাল বিস্তার ক'রে অধোমুখে নেমে আসতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে শাণিত তীর।

"হর হর মহাদেও! হর হর মহাদেও!" নীরব হয়ে পড়ল "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি! রক্তপিচ্ছল রণক্ষেত্রের উপরে অগণ্য শবদেহের স্তূপের পর স্তূপ রচনা করতে করতে দিল্লীর পলাতক সৈন্যবাহিনীর পিছনে পিছনে ধাবমান হ'ল রাজপুত বীরের দল।

শত্রুহীন যুদ্ধক্ষেত্রের উপর দাঁড়িয়ে পরিতৃপ্ত মুখে তরবারি কোষবদ্ধ করলেন স্বদেশভক্ত মহাবীর হামীর দেব। আজ দিল্লী হতগর্ব, রাজস্থানের রাজলক্ষ্মী রাহুমুক্ত। পৃথ্বিরাজের পর এক শতাব্দীর মধ্যে আর কোন হিন্দু বীরই মুসলমানদের এমনভাবে পরাজিত করতে পারেন নি। এবং হামীরও হচ্ছেন পৃথ্বীরাজেরই যোগ্য বংশধর।

ট'লে উঠল দিল্লীর সিংহাসন! আলাউদ্দীন তাড়াতাড়ি আরো অনেক সৈন্য সংগ্রহ ক'রে নিজের পলাতক বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে ছুটে এলেন। রণসম্বর আবার হ'ল অবরুদ্ধ। মুসলমান সৈন্যের সংখ্যাধিক্য দেখে হামীর দেব বুদ্ধিমানের মত প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে শত্রুর শক্তিপরীক্ষা করতে অগ্রসর হলেন না।

হামীর দেব জানতেন রণসম্বরের পতন অসম্ভব। দাসবংশীয় সুলতান বল্বন এই দুর্গ অধিকার করতে পারেন নি। খিল্‌জিবংশীয় প্রথম সুলতান ফিরুজও সসৈন্যে দুর্গ অধিকার করতে এসে দুর্ভেদ্যতা দেখে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। আলাউদ্দীনকেও কিছুকাল পরে পাত্তাড়ি গুটিয়ে স'রে পড়তে হবে, এ-সম্বন্ধে হামীর ছিলেন একরকম নিশ্চিন্ত।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়, কিন্তু আলাউদ্দীন নিজের গোঁ ছাড়তে নারাজ। যেমন অটল রণসম্বর কেল্লা, তেমনি অটল দিল্লীর সৈন্যরা। তারা কেল্লা দখল করতে পারলে না বটে, কিন্তু এমন-ভাবে চারিদিকের পথঘাট আগলে রইল যে অবরুদ্ধ রাজপুতেরা ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়তে লাগল।

হিন্দুস্থানে কোনদিনই দেশভক্তের অভাব হয়নি। আবার এখানে দেশদ্রোহীর সংখ্যাও গুণে ওঠা যায় না। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম যে দেশদ্রোহী যবন গ্রীকদের সাহায্য করেছিল, তার নাম হচ্ছে শশীগুপ্ত। তারপর স্বদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে কত যে বিশ্বাসঘাতক, এখানে সকলকার নাম করবার জায়গা হবে না।

রণসম্বর-অবরোধেও বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অভিনয় করবার মত লোকের অভাব হ'ল না। হামীর দেবের মন্ত্রী রণমল আরও কয়েকজন বিশ্বাসহন্তা হিন্দুর সঙ্গে দুর্গ থেকে বেরিয়ে অবলম্বন করলে শত্রুপক্ষ। দুর্গের কোথায় কি রকম দুর্বলতা আছে তা জানবার জন্যে আলাউদ্দীন তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন।

দুর্গের মধ্যে হামীর দেবের আশ্রিত মুসলমানও ছিল অনেক। তারা কিন্তু খাঁটি মানুষ, নিমকের মর্যাদা নষ্ট করেনি একজনও। রাজপুতদের সঙ্গে সমানভাবে দাঁড়িয়ে তারাও প্রাণপণে বাধা দিয়েছিল আলাউদ্দীনের সৈন্যদের এবং তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মোগল সেনাপতি মীর মহম্মদ সা। তা'হলেই দেখা যাচ্ছে, এই ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী পূর্বেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সত্যিকারের মিলন কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

কেটে গেল পুরো একটি বৎসর। অবশেষে আলাউদ্দীন কেল্লা দখলের এক নূতন উপায় আবিষ্কার করলেন। বালি-ভরা থলের উপরে থলে সাজিয়ে দুর্গ-প্রাকারের সমান উঁচু করা হ'ল। তারপরে সেই থলেগুলোর উপর দিয়ে উঠে প্রাকারের শীর্ষদেশে গিয়ে দাঁড়াল কাতারে কাতারে মুসলমান সৈন্যগণ।

দুর্গের মধ্যে দুই পক্ষের হাতাহাতি যুদ্ধ বাধল বটে, কিন্তু আর দুর্গ রক্ষা করা সম্ভব নয়, রণসম্বর আর নিজের অজেয় নাম রক্ষা করতে পারবে না।

হতাশ হয়ে হামীর দেব বললেন, "ঐ পাহাড়ের উপরে জ্বালাও এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড! বীরের মৃত্যুকে যারা ভয় করে না, এগিয়ে আসুক

তারা ! আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় যে-সব মাতা-ভগ্নী-জায়া আর শিশু-সন্তানগণ, বিধর্মীদের অপবিত্র কবল থেকে রক্ষা করবার জন্যে নিক্ষেপ কর তাদের জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় ! আজ আমাদের উদ্‌যাপন করতে হবে জহর-ব্রত। তারপর শুরু হবে আমাদের বিচিত্র মরণ-খেলা—আমরা মারব আর মরব, মারব আর মরব, মারব আর মরব ! শত্রু-রক্তে সর্বাঙ্গ রঞ্জিত ক'রে মরণবিজয়ীর দল আমরা মরতে মরতে হাসব, মরতে মরতে হাসব, মরতে মরতে হাসব! হা হা হা হা হা হা! আলাউদ্দীন রণসম্বর জয় করতে পারে, আমাদের জয় করতে পারবে না ! হর হর মহাদেও।"

মোগল সেনাপতি মীর মহম্মদ সা এগিয়ে এসে বললেন, "রাজা, আমিও জহর-ব্রত পালন করতে চাই।"

হামীর দেব সবিস্ময়ে বললেন, "সে কি, আপনি যে মুসলমান।"

মহম্মদ হাসিমুখে বললেন, "হাঁ রাজা, আমি মুসলমান হ'লেও আপনার সঙ্গে আমার অদৃষ্ট যে একসূত্রে গাঁথা। আর আমার জন্যেই আজ তো আপনার এই বিপদ।"

হামীর দেব বললেন, "ইচ্ছা করলে আপনি এখনো পলায়ন করতে পারেন। জহর-ব্রত পালন করার অর্থই হচ্ছে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। আপনি পারবেন?"

মিষ্টি হাসি হেসে মহম্মদ বললেন, "হিন্দু পারে মুসলমান কি পারে না? ভারতের হিন্দু-মুসলমান হচ্ছে এক বোঁটায় দুটি ফুল। ওদের একটি শুকোলে শুকিয়ে যাবে অন্যটিও।"

হামীর দেব বললেন "উত্তম। এর উপরে আর কথা নেই।"

পাহাড়ের শিখরে দাউ দাউ দাউ জ্ব'লে উঠল বিশাল অগ্নিশয্যা। হামীর দেবের সহধর্মিণী রাণী রঙ্গদেবীর সঙ্গে দলে দলে রাজপুতকন্যা দৃঢ়-পদে অগ্রসর হয়ে জ্বলন্ত শয্যায় শয়ন করলেন এমন প্রশান্ত মুখে যে, দর্শকদের মনে হ'ল তা অগ্নিকুণ্ড নয়, চন্দনকুণ্ড।

সব শেষ।

হামীর দেব অসি কোষমুক্ত ক'রে বললেন, "এইবারে আমাদের পালা। হর হর মহাদেও !"

মহম্মদ সা অসি কোষমুক্ত ক'রে বললেন, "চলুন রাজা ! আল্লা হো আকবর !"

হাজার হাজার রাজপুত বীর অস্ত্রচালনা করতে করতে ঝাঁপ দিলে শত্রু-সৈন্য-সাগরের মধ্যে। উচ্ছ্বসিত, আন্দোলিত হয়ে উঠল সৈন্য-সাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ, তার তলায় ডুবে গেল কে জানে কোথায় আত্মত্যাগী হিন্দু বীরদের রক্তলাঞ্ছিত ক্ষত-বিক্ষত পবিত্র-দেহ।

হামীর দেবও ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যু তখনো নিকটস্থ নয়। অনেক কষ্টে উঠে বসলেন তিনি ধীরে ধীরে। পরাধীনতা যে মৃত্যুরও চেয়ে ভয়াবহ ! প্রাণপণে দেহের সমস্ত শেষশক্তি সঞ্চয় ক'রে নিজে তরবারি তুলে স্বহস্তে করলেন তিনি নিজের কণ্ঠদেশে প্রচণ্ড আঘাত। পৃথিবীর কোলে লুটিয়ে পড়ল মহাবীরের দেহহীন মুণ্ড এবং মুণ্ডহীন দেহ।

মীর মহম্মদেরও সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু মৃত্যু তখনো তাঁর কাছে আসে নি।

স্বয়ং আলাউদ্দীন তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "মীর মহম্মদ সা! এখন আমি যদি চিকিৎসা করিয়ে আবার তোমাকে বাঁচিয়ে তুলি, তাহ'লে তুমি কি করবে?"

মহম্মদ সগর্বে বললেন, "আমি যদি বাঁচি, তাহ'লে আগে তোমাকে হত্যা ক'রে পরে রাজা হামীর দেবের পুত্রকে বসাবো তাঁর প্রাপ্য সিংহাসনে!"

বলা বাহুল্য মীর মহম্মদকে বাঁচাবার চেষ্টা হ'ল না।

তারপর হ'ল আর একটি ছোট্ট দৃশ্যাভিনয়, সে কথাও বলা উচিত বোধ হয়।

বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহী রণমল্ল সদলবলে এসে সুলতান আলাউদ্দীনকে সম্বোধন ক'রে বললে, "আপনাকে সাহায্য করেছি, এইবারে আমাদের পুরস্কার দিন।"

আলাউদ্দীন বললেন, "নিশ্চয়! বিশ্বাসহন্তাদের যোগ্য পুরস্কারই দেব। জল্লাদ! এদের মুণ্ডচ্ছেদ কর!"

যা বললুম বানানো কথা নয়, ইতিহাসের সম্পূর্ণ সত্যকথা।

●